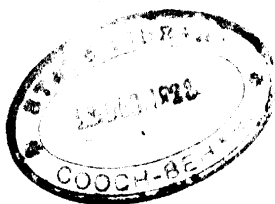


পল্লীচিত্র



শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

প্রকাশক—

শ্রীমলিনীবোহন রায়চৌধুরী ।

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় ।

রায় এণ্ড রায় চৌধুরী,

২৪ নং (দোতাল) কলেজ ষ্ট্রীট, মার্কেট,

কলিকাতা ।

প্রিন্টার—শ্রীগোষ্ঠবিহারী শাস্ত্রী ।

মিত্র প্রেস,

৪৫ প্রেসিডেন্ট কলিকাতা ।

তৃতীয় সংস্করণ ।

মূল্য আড়াই টাকা মাত্র ।

উৎসর্গ

পরম প্রজ্ঞাভাজন কবিবর

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়

শ্রীকরকমলেন্দু ।



গ্রাম্য শব্দ



অ

অলপ্পেয়ে—অল্লায়ু, (গালি) ।

অঘুরী তামাক—সুগন্ধ উৎকৃষ্ট তামাক । প্রথমে অঘর দেশ হইতে
এই তামাক আসিত ।

অলকা-তিলকা—চন্দন-চর্চা ।

আ

আটচালা—আটখানি চালবিশিষ্ট কাঁচা ঘর । কখন কখন বৈঠকখানা
অর্থেও ব্যবহৃত হয় ।

আড়া—খড়ো-বরের কড়িকাঠ । অস্ত্র নাম আড়কাঠ ।

আইল বা আ'ল—কুবিন্দ্রের প্রাপ্ত হিত অন্নোক্ত মাটির বাঁধ ।
সংস্কৃত আলি ।

আখট—অখণ্ড । আস্ত ।

আড়ত—গদী, এখানে বিদেশীর বাবসারীরা পণ্যদ্রব্য মজুত রাখিয়া
বাবসার করে ।

আঁখড়া—কুস্তির আঁড়া ।

আড়—ভারা ।

[২৩৬]

আছাড়ি পাছাড়ি—হাত পা ছুঁড়িয়া অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন ।

ই

ইন্তফা—ছাড়িয়া দেওয়া ।

উ

উত্তোর—উত্তর ; কবির গানে একপক্ষ গালি দিলে অন্তপক্ষ যে পাল্টা গালি দেয় তাহার নাম ।

এ

এস্তমাল—ভাল করিয়া অভ্যস্ত ।

এড়ো—এক হাত বা দেড় হাত দীর্ঘ গাছের ডাল ; ইহা গাছে ছুঁড়িয়া ফল পাড়া হয় ।

একপাক ঘুরে এস—এক চক্র দিয়ে এস ।

এরান—ধম্মনিষ্ঠা ।

এলনি—আলিপনা ।

ঐ

ঐরাবত—ঐরাবত ; এখানে ঐরাবতের জ্ঞান বৃহৎ ।

ওস্তাদ—শিক্ষক ।

ক

কোট—প্রত্যেক দলের নির্দিষ্ট জীড়াভূমি ।

কাকের ছাঁ বকের ছাঁ—প্রথমশিক্ষার্থী বালকদের অপরিচ্ছন্ন হস্তাকরের ব্যঙ্গাত্মক নাম ।

কৌচড়—পরিধেয় বস্ত্রেঃ দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য মুড়ায় যে আধার করা হয় ।

কানাত—গৃহের পার্শ্বস্থ বা পশ্চাদ্ভর্তী সঙ্কীর্ণ স্থান ।

কড়াকড়ি—কঠোরতা ।

কচা—এরূপ জাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ, সাধারণতঃ বাগানের বেড়ায় ব্যবহৃত হয় ।

কোঁচার খুঁট—কোঁচার প্রান্তভাগের কোণ ।

কুচি—ভাজিবার কালে নাড়িবার জন্ত ব্যবহৃত কতকগুলি নারিকেল পত্রের খিল বা সরু সরু কাটির সমষ্টি ।

কাঁচিয়া গোড়া পত্তন—কিয়দূর অগ্রসর হইয়া পরে আবার প্রথম হইতে শুরু করা ।

কষ—নির্যাস ।

কাঠখোলা—উত্তপ্ত হাঁড়ির উত্তাপে চাল ও হুতি ভাজা ; কাঠখোলার বালি দিতে হয় না ।

কাঁচা রাস্তা—ষেটে রাস্তা ।

কর্তা-না—পিতামহী ।

কাশি—কাংস্তানিস্থিত কাঁধাওয়ারা রেকাবীর দ্বার বাস্তবস্ত্র । ঢাক ও ঢোলের সঙ্গে বাজে ।

কোরা—নূতন বাহা ধোলাই করা নহে ।

কেরামত—কৌশল ।

কও—কহ, বল ।

কড়া—কটা, কয়টি ।

কাছি—হুল্লরজ্জু ।

কাঁচকেঁচের পাটী—পল্লী অঞ্চলে ব্যবহৃত ষোটা মাদুর ।

কাগুটি—কানবগা ।

কেঠো—কাঠনির্মিত গাবলা ।

কৌড়া—নবোদগত বংশাঙ্কুর ।

কাঁদি—গুচ্ছ ।

কাম হাসিল—কার্যোদ্ধার ।

করচ—ট্যাক ।

কলুঙ্গী—গৃহপ্রাচীরের ইষ্টকাদিনির্মিত তাক, কুলুঙ্গী ।

থ

থসড়া—দৈনিক জমাখরচের ‘কাঁচা’ খাতা ।

থুঙ্গী—বংশনির্মিত পেটিকা ।

থাক—থাগড়ার কাণ্ডে রচিত কলম ।

থোলা—ভাজিবার পাত্রবিশেষ ।

থঞ্জে—টিকা তামাক প্রভৃতি রাখিবার জন্য কয়েক খণ্ডে বিভক্ত গৃথায় পাত্র । চক্ষুরিকর আধার ।

খাতাসাইত—নূতন খাতার নিম্নস্থে ক্রেতা দোকানদারের খাতায় যে টাকা জমা দেন ।

খন্দকুটো—নানাপ্রকার রবিশস্ত ।

খোঁটা—উপকারের কথা তুলিয়া গঞ্জন ।

খিলিওয়ালা—খিলি = তৈয়ারী পান ; ওয়ালা = বিক্রেতা ।

খসানি—গুড়বর্জিত দেশী তামাক ।

খেপলা জাল—উভয় হস্তে ঘুরাইয়া যে জাল জলে ফেলে ।

খোঁড়ে—অনিষ্ট চিন্তা করে ।

খয়েনখান—যে আমন খান হইতে খৈ হয় ।

খোয়া—পাথরের বড় বাটী ।

গ

গাঁড়ার—জাতিবিশেষ; চিড়ে কুটিয়া ও বিক্রয় করিয়া জীবিকা-
নির্বাহ করে। ইহাদের অনেকে কাঠ চেলাইয়াও জীবিকার্জন করে।

গজল—হিন্দী প্রেমসঙ্গীত।

গাবগুবাগুব—গোপীয়স্থ।

গণকরমণী—গাঁড়ার স্ত্রী।

গণসাঁকড়ি ‘ক’—গণেশ-সাঁকড়ি। ‘ক’রের সাঁকড়িটা গণেশের
শ্রুতের মত।

গাছুড়ে—বুঝারোহণে স্নানপুণ।

গেদাবালিশ—ফুল গোল বালিশ।

গুণ—নৌকা টানিয়া লইয়া ঘাইবার দড়ি।

গেজে—আশ্রাদি রাধিবার জন্ত রজ্জুনির্মিত সজ্জিত বৃহৎ থলিয়া;
অন্য প্রকার, টাকা পয়সা রাধিবার জন্ত সূতায় বোনা সরু লম্বা থলি, ইহা
কোমরে জড়াইয়া বাধিয়া রাখে।

গুরো—ফুল ও লোহিতাভ।

গোলুই—নৌকার অগ্রভাগ।

গোছা—গুচ্ছ।

ঘ

ঘসি—ঘুটে।

ঘের—বেষ্টিত স্থান।

চ

চাড়া দিয়া—উর্দ্ধে ঠেলিয়া তুলিয়া।

চকু পাকাইয়া—চক্ষুর ভাবে রাগ প্রকাশ করিয়া।

চৌচির—বহুধা বিদীর্ণ। মূল অর্থ—চৌ = চারি; চির = বিদীর্ণ। চারি ভাগে বিদীর্ণ।

চোঙ্গা—বংশ-নির্মিত আধারবিশেষ।

চাদোয়া—চন্দ্রাতপ।

চারখানা—চেক কাপড়।

চিকুর হানিতেছে—বিচ্যৎ চমকাইতেছে।

চুমকড়ি ছাড়িয়া—সশব্দ-চুম্বনব্যং শব্দ করিয়া।

চেঙ্গারী—বৃহৎ বুড়ি।

চালের বাতা—ঘরের চালে ব্যবহৃত চাপটা বংশদণ্ড।

চৌচালি—বাঁশের পাতলা ছিলকা বাহা চাঁচিয়া ফেলা হয়।

চলাচল—সামাজিক মেশামিশি; সমাজভ্রষ্ট না থাকা।

চাঁই—সমাজের দলপতি, মোড়ল।

চাল—বাবস্থা, পদ্ধতি। পুৰাতন আদব-কায়দা।

চিত্তিকরা—রঙ্গ মাথানো।

চাচাতো ভাই—খুড়তুতো জেঠাতুতো ভাই। মুসলমানদের মধ্যে ব্যবহৃত হয়।

চিত্তে—দীর্ঘ-কাণ্ডবিশিষ্ট গুল্ম।

চম্পট—পলারন।

চাতাল—কোঠাঘরের ছাদ। চাঁদনী।

চোখা—ভীক্ষু।

চারিচালা—যে গৃহের চারিখানি চাল।

চাকী—লুচি বেলিবার চাকী।

চিভেন—কবি গানের মূখ্য অংশ।

চিলেকোঠা—চিলের ঘর ; ছাদের সিঁড়ির ঘর ।

চাটাই—বংশ বা খজুরপত্রাদিনির্মিত মাত্র ।

চারদেঁড়ে—যে নোকায় চারখানা দাঁড় ।

• চিনু—চিতা ।

চোকপুটপুটে—যাহার চোক পুটপুট করে, যে কোটরগত ক্ষুদ্র চক্ষুতে পিটপিট করিয়া চায় ।

ছ

ছেলেকাঁকালে ‘ঝ’—‘ঝ’য়ের কোলের কাছের টানটি কোলের ছেলের সঙ্গে তুলিত হইয়াছে ।

ছাঁক—অবকাশ ।

ছড়া ঝাঁট—গোময় মিশ্রিত জল ছড়াইয়া সম্মাজ্জনী প্রয়োগ ।

ছোবা—হাঁড়ির আকারের মাটির পট ।

ছাউনি—আচ্ছাদন ।

জ

জম্কাইয়া—উদ্বীণ করিয়া ।

জল ও বিছুটির সমাবেশ ; জল সংযোগে বিছুটির উগ্রতা বন্ধিত হয় ।

• জলছত্রতলা—পণিপ্রাস্তব্দ যে বৃক্ষতলে বৈশাখমাসে বৌদ্ধের মনস পণিকদিগকে জলদান করা হয় ।

জাওয় কাটা—রোমন্থন ।

জোয়ান—বলিষ্ঠ ব্যক্তি ।

জোট—দল ।

জামালকোট—এরওজাতীয় বৃক্ষবিশেষ ।

জলপিপি—ক্ষুদ্র জলচর পক্ষী বিশেষ ।

জলপান—মুড়িমুড়কী ও চালভাজা ।

ঝ

ঝাঁপের বেড়া—দরমা ও বাঁশে নির্মিত বেড়া ।

ঝিউনী—পোড়া চাউল ভিজান জল ।

ঝরা—তুলসী গাছে বা শিবের মাথায় জল দিবার মাটির সচ্ছিদ্র সরি বা
মালসা—যাহা টাঙ্গান থাকে ।

ঝুল—দোলা ।

ঝাঁঝুরি—তলায় বহুছিন্নবিশিষ্ট হাঁড়ি ।

ঝুরি—পচা মাছ রাখিতে গেলে গুঁড়া হইয়া যায় ; তাহাই ঝুরি ।

ঝাঁজরা—লুচি ভাজিবার সচ্ছিদ্র হাতা ।

ঝি—কথা ।

ঝিঁকে—সবেগে নৌকা বাহিবীর জন্ত জলের ভিতর সবলে ‘হাল’ প্রয়োগ

ট

টোঙ—শস্ত্র বা ফল ব্রক্ষার্থ শস্ত্রক্ষেত্রে বা বাগানে নির্মিত ক্ষুদ্র পর্ণ কুটার

টোপাশানা—ভাসমান পানা বিশেষ ।

টোকা—অক্লীয় ঘা ।

টাল—বাঁশের মাচা ।

টুকনি—ঘটা ।

টোকরা—ঝুড়ি ।

টিমি—কেরোসিন জালিবার টিনের ডিবে ।

টহাবাজার—মাছ তরকারী বিক্রয়ের বাজার ।

টাপোর—চ্যাটাই-নির্মিত চম্ভাতপ ।

টহলদার—প্রহুযে যে গায়কগণ নাম গান করিয়া বেড়ায় ।



ঠাকুর—পিতা ।

ঠিকরে—কলিকার ছিদ্র বন্ধ করিবার জন্য ব্যবহার্য ছোট টিল ।

ঠুকুণী—পাথরে ঠুকিয়া আগুন বাহির করিবার জন্য মনুষ্য কর্ণের আকৃতি বিশিষ্ট ইপ্পাত খণ্ড ।

ঠাই—কাছে ; মূল অর্থ স্থান ।



ডেগ্‌ড়ো—বৃন্তসহ তাল বা কদলী পত্র ।

ডেল্‌কো—মাটির দীপ ।

ডুবসাতার—জলের মধ্যে ডুবিয়া সাতার দেওয়া ।

ডেঁকা—সাপের বাচ্চা ।

ডাগর—বড় ।

ডাকের গহনা—প্রতিমা সাজাইবার রাস্তার গহনা ।

ডাবা হঁকা—খেলো হঁকা ।



ঢল—মতিবৃষ্টিজনিত জলপ্রবাহ ।

চন্‌কা—ঢিলে ।

ত

তো'করা—পাটকরা ।

তুলোট—হরিতালরঞ্জিত স্বদেশজ কাগজ ।

তাগাদগরি—নীলক্ষেত্রের প্রহরী বিশেষ ।

তোলা—হাট বাজার প্রভৃতি যে সকল স্থানে জিনিসপত্র বিক্রয় হয়, সেই সকল স্থানের জমীদার জমীর ভাড়াস্বরূপ বিক্রয় দ্রব্যের কিছু কিছু অংশ লইয়া থাকেন, তাহাই “তোলা” ।—জমীদারের লোকেরা স্বইচ্ছায় জিনিস তুলিয়া লয়, সেই জন্তই এই নাম ।

তলব—কড়া ।

তস্তারামা—চতুর্দোল ।

তাড়,—কাষ্ঠনির্মিত বৃহৎ খুন্তি বিশেষ ।

তুফান—ঝড়ে নদীতে যে বড় বড় তরঙ্গ উঠে ।

তাউই—ভগিনী বা ভ্রাতার শব্দ ।

থ

থাক—দ্রব্যাদি সাজাইবার সোপানাকারে সজ্জিত সুদীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ড ।
ঠাট । মঞ্চ ।

থোপ—গুচ্ছ ।

দ

দালান—অট্টালিকা, অনেক স্থলে ‘পাকা’ চণ্ডীমণ্ডপ অর্থেও ব্যবহৃত হয় ।

দাগাবুলান—লিখিতে শিখিবার জন্য অন্তের লিখিত অক্ষরের উপর খড়ি বা কলম বুলাইয়া যাওয়া ।

দলা—অল্পপরিমাণ পিণ্ড ।

দীপগাছা—কাঠের বা মাটির প্রদোপাধার ।

দানাপানি—দানা = শস্য ; পানি = জল ; আহাৰ্য্য ও পেয় ।

দাপাদাপি—জলের মধ্যে পদদ্বয়ের আফালন ।

দাম—শৈবালবিশেষ ।

দেওয়াড়—নদীতীরস্থ জমী ।

দশঠাকুর—কুটুম্ব সাধারণ ।

দড়িরা যায়—শক্ত হইয়া যায় ।

দোয়ার—মূল গায়নের সহযোগী গায়ক ।

দামাট—বাঁট ।

ঘ

ধুঁকিতেছে—হাঁপাইতেছে ।

ধোপদস্ত—ধোপাকাচা কাপড় ।

ধূপছান্না—ধূম্রবর্ণ বিশিষ্ট ।

ধানের আড়ি—ধাত্তাদির বেত্রনির্মিত মাণ-পাত্র ।

ন

নিড়ানী—গাছের গোড়া হইতে তৃণাদি পরিষ্কার করিবার অস্ত্র ।

নোট—ঢেঁকির ‘গড়’, ঢেঁকির মূষল যে গহবরে পড়ে ।

নাড়ুগোপাল—পাঠশালার প্রচলিত শাস্তি বিশেষ । বালক গোপাল এক হাঁটু পাতিয়া ও এক হাঁটু তুলিয়া বসিয়া, দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া ক্ষীরের লাড়ু খাইতেন । চিত্রে ও পুস্তলিকায় পাঠক তাহা দেখিয়া থাকিবেন । অপরাধী বালককে সেই ভাবে বসাইয়া তাহার দক্ষিণ করতলে একখানি প্রকাণ্ড ইষ্টক রক্ষিত হইত ।

নাটাই—বাহাতে ঘুড়ীর সূতা জড়ান থাকে ।

নবসত—দ্বিরাগমন ।

নক করে—অন্যর অনাক্ষিত ভাবে ।

নড়—ফি, প্রত্যেক ।

নাথোতা—গল্পনা ।

নাতিপুতি—পুত্রপৌত্র ।

নীলের চাদর—নীলরঙ্গের বড় মোটা চাদর ; ইহা নৌকার পাল ও বাড়ীর উৎসবাদিতে চন্দ্রাতপ এই উভয় রূপেই ব্যবহৃত হয় ।

প

পড়ুয়া—পড়ো, ছাত্র ।

পাঁজা—পোড়াইবার জন্য স্তূপাকারে সজ্জিত ইষ্টকরাশি ।

পাততাড়ি—ছেলেদের লিখিবার তালপাতার তাড়া, ছোট মাদুরে জড়ান

পারণ—উপবাসভঙ্গের পর প্রথম আহার ।

পাঁচন—গরু তাড়াইবার লাঠি, বংশশলাকায় নির্মিত ।

পাটনী—খেয়া নৌকার মাঝি ।

পাইক—পদাতিক ; জমিদারের ভূত্যাবিশেষ ।

পটপটিয়ে—স্পষ্ট ভাষায়, অসঙ্কোচে ।

পাতাসেজ—কণ্টকময় বৃক্ষবিশেষ, মনসা-পূজায় এই বৃক্ষ ব্যবহৃত হয় ।

পিড়ি—কাঠাসন ।

পোয়াল—ধানগাছের গুঁড় দস্ত ।

পেলাই—প্রকাণ্ড ।

পিক—পানের ছেপ ।

পেছে—ঝোড়া, বড় পেথে ।

পাখি—পেথে, বেতের ছোট ধারী ।

পুঁটে—গোলাপ ফুলের কুঁড়ির আকার বিশিষ্ট অলঙ্কার বিশেষ ।

পৈঠা—সোপান ।

পরাত—কানাওয়ালা বড় পিতলের থালা ।

পাঁচ দৈড়ে—যে নোকায় পাঁচখানি দাঁড় ।

পেটভাগরা—পেট মোটা, যাহার পেট ভাগর ।

ফ

ফলার—আগে চিঁড়াদই ফলার ছিল ; এখন চিঁড়ের ‘ফলার’ কাঁচা ফলার, ও লুচির ‘ফলার’ পাকা ফলার নামে প্রসিদ্ধ । মূলশব্দ—ফলাহার ।

ফাহুস—কাচের বেল লঠন হাঁড়ি ।

ব

বারকোশ—কাষ্ঠনির্মিত থালা ।

বেণেমসলা—যে সকল মসলা বেণের দোকানে বিক্রয় হয় ।

বাগনা—ক্রেয় বস্তুর সমগ্র মূল্যের কিয়দংশ, যাহা বিক্রেতাকে অগ্রিম দেওয়া হয় ।

বেটি—সাধারণ স্ত্রীলোক ।

বাঁশজাল—মাছ ধরিবার জন্ত নদীগর্ভে বাঁশ পুঁতিয়া যে জাল খাটানো হয় ।

বয়া—উপমূল । বট গাছের শাখাজ শিকড় ।

বাস্তসাপ—যে সাপ গৃহস্থ বাড়ির কোথাও স্থায়ীভাবে থাকে ।

বেলোয়ারী—কাচনির্মিত ।

বরকন্দাজ—জমীদারের উচ্চপদস্থ প্রহরী বিশেষ ।

বোনি—প্রথম বিক্রম ।

বিলাতী বিড়ি—সিগারেট ।

বাতাড়—বেড়া ।

বস্তি—মাছ ধরিবার জন্ত বাঁশের সরু খিল নির্মিত খাঁচার আকার বিশিষ্ট যন্ত্র বিশেষ ।

ব্যাগ্‌গাতা—ব্যগ্রতা—মিনতি ।

বাজনার—যাহারা বাজনা বাজায়, ঢুলী ইত্যাদি ।

বুলু—নীল রঙ্গ ।

বাঁক—ভারবহনের বংশদণ্ড ।

বুঁটি—বোটা ; শিউলী ফুলের বোটাই বুঝায় ।

বাইচ—নোচালনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ।

বোঠে—ডিজি বাহিবাব দাঁড়বিশেষ ; খোলা দাঁড় ।



ভূষা—হাড়ীর তলার কালী ।

ভিয়ান—মিষ্টান্ন দ্রব্যের পাক ।

ভেমো গোয়াল—ভেমো = ভ্রাস্ত, ভ্রমী, যাহার সর্বদা ভুল হয় ; নির্দোষ গোয়াল । গোয়ালাদের বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম, এই সংহারে সাধারণতঃ তাহারা এই নামে অভিহিত হয় ।

ভুজো—মুড়ীমুড়কী প্রভৃতি জলপান ।

ভাসান—প্রতিমার বিসর্জনের পূর্বে নৌদ্বিহার ।

ম

মরিয়া—মৃত হইয়া = খেলার অধিকারে বঞ্চিত হইয়া । এক পক্ষের কোন বালক যখন ‘হাড়ুডুডু’ শব্দ করিতে করিতে বিপক্ষের সীমায় খেলা দিতে যায়, সেই সময় যদি বিপক্ষদল তাহাকে ধরিয়া নিশ্বাস ছাড়াইতে পারে, তাহা হইলেই সে ‘মরে’, অর্থাৎ আর খেলিতে পায় না । যে বিপক্ষ দলে খেলা দিতে যায়, সে যদি ঐ দলের কাহাকেও স্পর্শ করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে, তাহা হইলে সেই বিপক্ষ বালকও ‘মরে’ ।

মকসো—লেখার উপর লেখা ।

মুসাবিদা—দলীলের খসড়া ; Draft

মশায়—গুরুমহাশয় ; মহাশয় শব্দের অপভ্রংশ ।

মাথায় পাকড়ী ‘ঙ’—‘ঙ’র মাথায় বৃত্তটি পাকড়ীর মত ।

মাজা—ঘুড়ির সূতার পাট বিশেষ । বোতলচূর্ণ ও খৈয়ের মাড় গাবের আঠা প্রভৃতি ‘মাজার’ উপকরণ ।

মনোহারী—Stationary Shop, যে দোকানে নানাবিধ মনোরঞ্জনকাৰী জব্বাদি বিক্রীত হয় ।

মুরি—ছাদের জল নির্গমের নল ।

মুড়ি—আবরণ ।

মোঙা—সন্দেশ ।

মুরোদ—সামর্থ্য ।

মুঘল—কাঁঠালের অভ্যন্তরস্থ বৃন্ত—বাহার চারি পার্শ্বে কোষ সজ্জিত থাকে

মালামো—কুস্তি ।

মালো—জেলে ।

মাল্‌তের—নিম্নশ্রেণীর মুসলমানের উপাধি ‘মাল্‌তে’, তাহার ‘পো’
অর্থাৎ পুত্র ।

মূল গেনে—মূলগায়ক ; দলের অধিনায়ক ।

মনসার ভাষান—মনসার আখ্যানিকা বা মহিমা কীর্তন ।

মাটি কোঠা—খড়ের চাল দ্বারা আচ্ছাদিত মেটে ঘরের ছাদ ।

মাড়—ভেলা ।

মাওড়া—মাতৃহীন ।

ল

রাশি সন্দেশ—কম দরের ‘বাজারে’ সন্দেশ ।

ল

লেজঝোলা—শিশুদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য কল্পিত জীব বিশেষ ইহার
লেজে একটি ঝুলি থাকে ।

লহমা—নিমেষ, মুহূর্ত্ত ।

লক্ষণ—গৃহস্থের মঙ্গলকামনায় অনুষ্ঠিত মঙ্গলাচার ।

শ

শাঁখনী—শঙ্খিনী, শাঁকচূর্ণী । প্রবাদ, ভ্রষ্টা স্ত্রী মরিয়া শাঁখনী হয় ।

শিয়াল-কাঁকি—বিশেষ চতুরতা পূর্ব্বক কাঁকি দেওয়া । শিয়াল পশুর
মধ্যে চতুর বলিয়া প্রসিদ্ধ ।

শনিধান—এক প্রকার আমন ধান ।

স

সুকাদই—কীরের দই ; শুক শব্দজ ।

সারি—শ্রেণী ।

সর্দারপড়ো—পাঠশালার বয়োজ্যেষ্ঠ ও কতকটা অগ্রণব পুরাতন ছাত্র।

সমস্ত—যুবতী, সমর্থ শব্দের অপভ্রংশ।

সামিয়ানা—বড় চন্দ্রাতপ।

সারিন্দে—গ্রাম্য সারঙ্গ।

সেঁউতি—নৌকার জল ছেঁচিয়া ফেলিবার কাঠনির্মিত পাত্র-বিশেষ।

সুঁড়িপথ—সঙ্কীর্ণ পথ।

সেরেস্তা—কাঠনির্মিত চরকা বিশেষ। এই চরকায় কাটমের ত্রায় সূতা জড়ান থাকে। এই সূতায় বড়সী বাঁধিয়া মাছ ধরে। চরকাটি জলের ধারে পুঁতিয়া টোপ ফেলা হয়।

সেজ—ফানুসওয়ালা বাতিদান।

সারিদল—নৌকার মাঝি, গ্রাম্য কৃষক ও শ্রমজীবীগণ একত্র গলা মিলাইয়া যে গান গায়—তাহার দল।

গ্রামচাঁদ—বিদ্রোহী প্রজা শাসনের জন্ত নীলকুশীর কর্মচারীদের ব্যবহৃত পাত্ৰাকৃতি চর্খনির্মিত আয়ুধ।

সরদাল—দরজা বা জানালার মাথায় স্থাপিত কাঠের তাক।

হ

হাজিরে—উপস্থিতি।

হেঁকে হেঁকে—টেঁচিয়ে টেঁচিয়ে ; উচ্চৈঃস্বরে।

হাতসাঁই—দুই হাত ও দুই পা ধরিয়া শূণ্ণে কুলাইয়া লইয়া যাওয়া।

হালখাতা—নূতন খাতা।

হাঁড়ি—‘হাঁড়ি’র আকারের লঠন।

হালসানা—জমীদারের যে পাইক খাজনা আদায় করে।

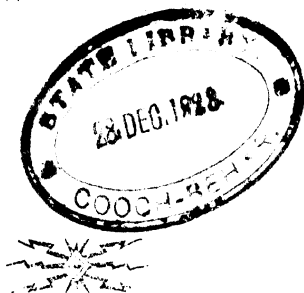
হিঁয়ো—কোন জিনিস টানিবার সময় শ্রমজীবীরা সমস্বরে একত্রে ‘হিঁয়ো’ এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া ‘দম’ লইয়া থাকে ;—অর্থহীন ধ্বনাত্মক শব্দ ।

হাপুস নয়নে—অশ্রুপ্রবাহযুক্ত চক্ষে ।

হেঁসো—তীক্ষ্ণধার বক্র অস্ত্র, দেখিতে কান্তের মত ।

হেঁতাল—হিস্তাল ; বৃক্ষবিশেষ, হিস্তালের লাঠিও বুঝায় ।

হেড়েনী—ছাড়ির মেয়ে ।



আমাদের প্রকাশিত পুস্তকাবলী ।

রাস্তা বাহাদুর ডাঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

১। সুবল সখার কাণ্ড (সচিত্র) ১৮০

২। ভয়ভাঙ্গা (সচিত্র) ৬০

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১। পুষ্পপাত্র (২য় সং) ১৮০

২। সওগাত ” ১৮০

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

১। খেয়ালের খেসারৎ ১০

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন গুপ্তোপাধ্যায়

১। আঁধি ২৮০

২। পিঙ্গলী ১৮০

৩। মৃণাল ১৮০

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

১। মালাচন্দন ১৮০

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়

২। পল্লী বৈচিত্র্য ২৮০

৩। পল্লী-চরিত্র ২৮০

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ রায়

১। তরী ১৮০

সবগুলি বইই সুন্দর বাঁধাই, সোণার জলে নাম লেখা । উপহার দানের

উপযোগী এমন পুস্তক কমই পাইবেন ।

ইহা ছাড়া আমরা সকল রকম ইংরাজী ও বাংলা পুস্তক বিক্রয় করি ।

মফঃস্বলের অর্ডার অতি যত্নের সহিত সহর পাঠাই ।

রাস্তা এণ্ড রাস্তা চৌধুরী

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক ।

২৪নং (দোতারা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

আমাদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

প্রভাতী

বার্ষিক ২৥০০ আনা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০ আনা ।

৩য় বর্ষ চলিতেছে । শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহামহোপাধ্যায় যাদবেন্দ্রর তর্করত্ন, অধ্যাপক যত্ননাথ সরকার, বিনয়কুমার সরকার, যোগীন্দ্রনাথ সমাদার, দীনেশচন্দ্র সেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, জলধর সেন, কাজী নজরুল ইসলাম, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, মাণিক এবং ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া প্রভৃতি প্রভাতীর নিয়মিত লেখক লেখিকা ।

গ্রাহকগ্রাহিকাদের রচনায় উৎসাহ দেওয়া হয় । বিজ্ঞাপনের হার সুলভ । প্রতি সংখ্যায় বহু সংখ্যক ছবি থাকে ।

রায় এণ্ড রায় চৌধুরী

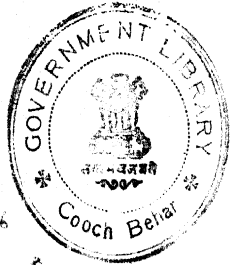
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক ।

২৪নং (দোতালা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ।



সূচী ।

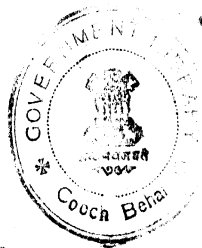
বিষয়	পৃষ্ঠা ।
সেকালের পাঠশালা	১
ভগবতী যাত্রা	৩৫
দশহরা গঙ্গাপূজা	৫৯
স্নানযাত্রার মেলা	৮৩
রথযাত্রা	১০৩
কুলনযাত্রা	১২৭
নন্দোৎসব	১৪৯
দুর্গোৎসব	১৬৭
কোজাগর লক্ষীপূজা	২০৭
গ্রাম্যশব্দ	২৩৫



State Library
Cooch Behar
Bata Library
1947

সেকালের পাঠশালা

পল্লীচিত্র



সেকালের পাঠশালা



সেকাল আর কত দিন! খুব বেশী হয় ত বিশ-পঁচিশ বৎসর হইবে; কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই দেখিতে পাই, আমাদের গোবিন্দপুর গ্রামের অতি অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে! নবনির্মিত প্রকাণ্ড ইংরাজী স্কুলে আর ছেলে ধরিতেছে না; দশটা বাজিতে না বাজিতে ছেলের দল গরম গরম ভাত খাইয়া, জুতা, জামাজোড়া ও ছাতায় সর্বদা ঢাকিয়া বটগুলি হাতে লইয়া স্কুলে ছুটিয়াছে; বছর বছর আট দশ জন ছেলে এই স্কুল হইতে 'এন্ট্রেন্স' পাশ করিয়া কলিকাতায় এল্-এ. পড়িতে বাইতেছে, এবং বছর চারি পাঁচের মধ্যে 'গ্রাজুয়েট'ও লাভ করিয়া বিদ্যার জাহাজ মাথায় ভরিয়া দাড়ি গোঁফ ও চশ্মার গুরুগাভীর্ষ্যে আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামখানির চাপলা দূর করিতেছে!—এ সকল দেখিয়া এই বিশ-পঁচিশ বৎসর আর আমার কাছে অল্প দিন বলিয়া মনে হয় না। এই যে পরিবর্তন, কালের গর্জে ইহার মাপ লইতে যাওয়া সম্ভব হইবে কি?

এই সকল পরিবর্তন দেখিয়াই বোধ হয় সেকালের পাঠশালার কথা এমন স্পষ্টরূপে আমার মনে পড়িতেছে। সেকাল নাই,

সেকালের পাঠশালাও আর নাই; কিন্তু তাহার সুখ দুঃখের অনেক স্মৃতি ভুক্তভোগিগণের জীবনের সহিত চিরবিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। একালের স্কুল-কলেজের ছেলেদের সুখ দুঃখ, আমোদ-প্রমোদ, সমস্তই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে; এ যেন আর এক জাতি! তাই একালের ছেলেদের কাছে সেকালের কথা বলিতে ভয় হয়। কিন্তু সে কালটা যতই অসভ্য হোক, সেটি আমাদের খাঁটি জিনিস ছিল;—তাহার মধ্যে এতটা কৃত্রিমতার চাকচিক্য প্রবেশ করে নাই। সেকালের ছেলেরা ক্লাসের ‘ফার্স্ট বয়’ হইয়া এক নিশ্বাসে প্রথম চার্লসের উন্নতন সাতপুরুষের নাম মুখস্থ বলিতে পারিত না বটে, কিন্তু তাহারা আপন পিতৃপিতামহাদির নাম দশপুরুষ পর্য্যন্ত বলিতে পারিত। তাহাদের দোষ ও গুণ উভয়ই অনেক ছিল; কিন্তু সেই দোষগুণবিজড়িত সেকালের ‘পড়ুয়া’দিগকে চঞ্চলা পল্লী-জননীর স্বহস্তে মানুষকরা ছেলে বলিয়া মনে হইত। আমাদের একালের ছেলেদের নত এক দিকে পাণ্ডিত্য ও অত্র দিকে সভ্যতার অত্যধিক উত্তাপে তাহারা অল্প বয়সেই পরিপক্বতা লাভ করিত না।

সেই জন্ত, একালেও সেকালের কথা আলোচনা করিয়া লাভ আছে, মনে হয়। ইহা আমাদের অবিকৃত জাতীয় জীবনের ইতিহাস।

আমি যখনকার কথা বলিতেছি, তখন আমাদের গোবিন্দপুরে ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয় নাই। আজ যেখানে স্কুলের প্রকাণ্ড ইमारত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তখন সেখানে জয়রাম ঘোষের হলুদের ক্ষেত ছিল; আর যেখানে ঐ স্কুলসংলগ্ন বাগানে পাঁচরঙ্গা পাতাবিশিষ্ট ক্রোটনের গাছ শোভা পাইতৈছে, এবং চামেলীকুঞ্জে অসংখ্য ছোট ছোট সাদা চামেলী ফুল ফুটিয়া সুধাগন্ধে চারিদিক পূর্ণ করিতেছে ও

শুভ্রবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাপতির দল কম্পিতপক্ষে উড়িয়া বেড়াইতেছে, ঠিক ঐ জায়গাটাতে একটা ইঁটের পাজার ভগ্নাবশেষ পড়িয়াছিল; তাহার উপর রাক্ষসের লালভেরেণা ও কালকাসিন্দার গাছ গজাইয়া উঠিয়াছিল।

তখন গ্রামের এক প্রান্তে একটা বাঙ্গালা স্কুল, আর গ্রামের মধ্যে একটি পাঠশালা ছিল। আমরা তখনও পাঠশালায় কি স্কুলে ভর্তি হই নাই; পাঁচ বৎসর বয়সে ‘হাতেখড়ি’ হইবার পর বছর-দুই ধরিয়া ঠাকুরদাদা মহাশয়ের কাছে বিদ্যাশিক্ষার উমেদারীতে নিযুক্ত ছিলাম। শিক্ষার ধরণটাও কিছু স্বতন্ত্র ছিল; কোন দিন শুভ্রবর্ণের ‘আর্য্যা’ মুখস্থ করিতাম, কোন দিন বা সাতপুরুষের নাম মুখস্থ করিতে হইত; আবার এক একদিন চাণক্যের শ্লোক লইয়া সুর করিয়া পড়িতাম, “শৃঙ্গিণো দশহস্তেন শতহস্তেন বাজিনা”—ইত্যাদি। ঠাকুরদাদা মহাশয় বোধ করি তাঁহার শিশু পৌত্রটাকে সর্ববিদ্যাবিশারদ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন; হায় স্নেহমুগ্ধ বৃদ্ধ!—কিস্তি সে কথা যাক।

ঠাকুরদাদা মহাশয়ের শাসনের কড়াকড়িতে এদিকে ওদিকে বেড়াইতে যাইবার পর্য্যন্ত যো ছিল না! তাঁহার ধারণা ছিল, ছুটু নী করিলেই আমরা অধঃপাতে যাইব; সুতরাং বেশ সুবুদ্ধি হইয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে হইত। সুবুদ্ধি হইতে গিয়া অনেকের ইহকাল নাট হইয়াছে, এবং পরকালেও তাঁহাদের বিশেষ আশা নাই। সুবুদ্ধিতে গ্রামে আমরাই অগ্রগণ্য ছিলাম।

বাড়ীতে বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া, শেষে কয়েক বছর উৎসাহ জন্মিল যে, আমরা পাঠশালা ডিঙ্গাইয়া একেবারে স্কুলে ভর্তি হইব! বাঙ্গালা স্কুলে ভর্তি হইবার উচ্চাভিলাষ কি জন্ত প্রবল হইল,

তাহার কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। বাঙ্গালা স্কুলের ছেলেরা প্রায়ই গল্প করিত যে, তাহারা আখ্যানমঞ্জরী, নীতিবোধ, চাকুপাঠ প্রভৃতি বড় বড় বই পড়ে, এবং বেঞ্চির উপর বসিতে পায়; বিশেষতঃ, বাঙ্গালা স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় ছেলেদের দিয়া তামাক সাজাইয়া লন না; পাঠশালার ‘পড়ো’দের মত তাহাদিগকে গুরুমহাশয়ের সিধাও বহিতে হয় না। তাহার উপর চন্দ্রকান্ত নামক গুরুমহাশয়টির ‘পড়ো’দের উপর যে বত্রিশ রকম দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা ছিল, স্কুলের ছেলেদের সেই ‘পিনালকোডে’র আমলে আসিতে হইত না। এত সুবিধা ছাড়িয়া কে ছেঁড়া মাতুরে বসিয়া তালপাতে লিখিতে যাইবে?—এমনি করিয়া গ্রামে আমরাই প্রথমে ‘রেভোলিউশনারী স্পিরীট’ আনি; আর একালের ছেলেরা এখন কি না আমাদের ‘ওল্ড ফুলে’র দলে ফেলিতে চায়। হায় রে একাল!

যাহা হউক, আমাদের এতটা ‘স্পিরীট’ মুকুলেই শুকাইয়া গেল! তাহার কারণ পরে বলিতেছি। আপাততঃ আমাদের গ্রাম্য পাঠশালার সেই অদ্বিতীয় গুরুমহাশয় ‘চন্দুরে খোঁড়া’ ওরফে চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী (‘তর্কালঙ্কার ঠাকুর’ না বলিলে তিনি রাগ করিতেন) মহাশয়ের রূপ-গুণের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাক্। অবশ্য, সকল গুণ উপযুক্তরূপে বর্ণনা করিবার যোগ্যতা বর্তমান লেখকের নাই, পাঠকগণ এই অপরিহার্য্য ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

চন্দ্রকান্ত শর্মা লোকটি পরিণতবয়স্ক, বেঁটে, কাল। পরিপুষ্ট গৌণ-জোড়াটা মোটা, এবং ঝাঁটার মত সোজা! পাঠশালার কোন ছেলের উপর রাগ করিয়া যখন তিনি এই গৌণে ‘চাড়া’ দিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া চাহিতেন, তখন তাঁহাকে যমের একটি ছোট-খাট সংস্করণ

বলিয়া ভ্রম হইত; ছেলেরা তাঁহাকে যমের অধিক ভয় করিত। তাঁহার দাড়ী কামানো, মাথার অনেকখানি স্থান কেশ-সম্পর্ক-শূন্য; মাথার মধ্যস্থলে মক্কা-মধ্যস্থ ‘ওয়েসিসে’র মত দুই চারি গাছি চুল ছিল মাত্র, টাকের সঙ্গে মানান করিবার জন্ত সেগুলি তিনি খাট করিয়া কাটিতেন, ও চিরুণীসাহায্যে সেগুলিকে একটু কায়দায় রাখিবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু চুলগুলি বড় স্থিতিস্থাপক ছিল, সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা না বাঁকিয়া কদম্ব-কেশরের জায় দণ্ডায়মান থাকিত! চক্রবর্তী মহাশয়ের বর্জুল উদরের পরিধিও বিপুল; বাঙ্গালা স্বুলের ছাত্র গ্রামাচরণ বলিত, “এই ভুঁড়িটি অস্ত্র চালাইয়া খণ্ড খণ্ড করিলে তদ্বারা দুই জোড়া পূর্ব ও পশ্চিম গোলাক প্রস্তুত হইতে পারে; শশিভূষণের মানচিত্রের গোলাক ইহা অপেক্ষা অনেক ছোট!”—গুরুমহাশয়ের বেতের চোটে গ্রামাচরণ পাঠশালা ছাড়িয়াছিল।

চন্দ্রকান্তের কত বয়স হইয়াছিল, তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিত না; তাঁহার মাথায় একগাছিও পাকা চুল থাকিবার ঘো ছিল না, স্মৃতাং তিনি বৃদ্ধ হন নাই; বিশেষতঃ, তাঁহার দুইপাটি দন্তই এমন দৃঢ় ছিল যে, যখন তিনি ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া দ্রষ্টাপংক্তির পরস্পর সংঘর্ষণে কড়মড় শব্দ উৎপাদন পূর্বক কোন প’ড়োকে বলিতেন, ‘তোমার মুণ্ডটা চিবিয়ে খাব’, তখন সে কথা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত বোধ হইত না। প্রায় সকল ছাত্রকেই তিনি বলিতেন, ‘তোমার বাবা আমার ছাত্র’; কিন্তু বয়সের কথা উত্থাপিত হইলে তিনি কখন চল্লিশের উর্দ্ধে উঠিতেন না! বস্তুতঃ, তিনি চিরযৌবন লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই অমুমান হয়, কিন্তু গৃহিণীর মুখরতাবশতঃ তিনি মধো মধো ধরা পড়িতেন; ব্রাহ্মণীর বয়স পঞ্চদশ বৎসরের কম

বোধ হইত না। এই অপরাধে ব্রাহ্মণীর সঙ্গে চক্রবর্তী মহাশয়ের মধ্যে মধ্যে প্রেমকোন্দল বাধিয়া যাইত; কিন্তু ব্রাহ্মণী ত আর তাঁহার ছাত্র নহেন, কাজেই তাঁহাকে কখন কখন উচিত জবান শুনিতে হইত। কত দিন আমরা রাস্তা হইতে শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণী গর্জন করিয়া বলিতেছেন, “আ মোলো যা অলপ্রেয়ে মিন্‌সে! আমি ম’লে তুই একটা নোলোকপরা বৌ ঘরে আন্‌বি না কি? চিরকালই ছেলের চামড়া গায়ে দিয়ে থাক্তে চান!”—ব্রাহ্মণীর প্রতি ক্রোধটা চক্রবর্তী মহাশয় পাঠশালার ছাত্রবৃন্দের পৃষ্ঠে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত নিক্ষেপ করিতেন।

শুনিতে পাওয়া যায়, চন্দ্রকান্ত মা বাপের আত্মরে ছেলে ছিলেন বলিয়া শৈশবে মা সরস্বতীর সহিত বিরোধ করিয়া পিতৃপিতামহের ব্যবসায় কবিরাজীশিক্ষায় মনঃসংযোগ করেন। সে বিত্তায় তিনি কত দূর পরিপক্বতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা বলা কঠিন; কিন্তু জনরব, একবার না কি কবিরাজী-সূত্রে তাঁহার প্রণয়-ব্যাদি ঘটয়াছিল! রোগ কঠিনই হইয়াছিল; কিন্তু লোকে তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি এমন গুরুতর মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিয়াছিল যে, তাহাতে তাঁহার রোগ ত সারিয়া গেলই, উপরন্তু তাঁহার ঐ পাখানি ভাঙ্গিয়া চিরকালের জন্ত ঝাঁকিয়া রহিল! ইহার পর হইতে তিনি এই বিপজ্জনক ব্যবসায় পরিত্যাগ পূর্বক গ্রামের ছোট ছোট ছেলেগুলিকে একাধারে এক একটি গুড্‌ব্বর ও চাণক্য করিবার জন্ত গ্রামের মধ্যে এক পাঠশালা খুলিলেন। ইহাতে তিনি মাসে টাকাটা শিকেটা দক্ষিণা পাইতেন; ছেলেরা প্রায়ই তামাক টিকে হইতে আরম্ভ করিয়া চাল ডাল লবণ তেল প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যপূর্ণ সিধা ঝোগাইত, এবং গ্রামের মধ্যে কোন

বাড়ীতে ব্রত, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ জুটিত। এই প্রকারে অনায়াসে তাঁহার দিনপাত হইত।

পাঠশালার ছেলেরা প্রকাশ্যে তাঁহাকে যতই ভয় করুক, তাঁহাকে খোঁড়াইতে দেখিলে তাহাদের বিজ্ঞপস্পৃহা অসম্বরণীয় হইয়া উঠিত; সুতরাং গুরুমহাশয় কিছু দূরে যাইবামাত্র, কেহ গাছের আড়ালে, কেহ ঘরের পাশে, কেহ বা নিকটস্থ কোন বাগানের মধ্যে লুকাইয়া তাঁহার প্রতিগম্যস্বরে সুর করিয়া বলিত,—

“খোঁড়া গ্যাং গ্যাং গ্যাং,

কার হাঁড়িতে ফ্যান্ থেয়েছিস্

কে ভেঙ্গেছে গ্যাং,—খোঁড়া, কে ভেঙ্গেছে গ্যাং?”

এই বলমুখোচ্চারিত ছড়াটির মধ্যে হয় ত কোন গুপ্ত কুৎসার অস্তিত্ব বর্তমান ছিল না, হয় ত ইহা তাহাদের সরল শিশুহৃদয়ের আনন্দ-লহরী; কিন্তু গুরুমহাশয় এই ছড়াটি তাঁহার প্রথম যৌবনের গুপ্ত-প্রেমের প্রতি অতি মর্মান্তিক ইঙ্গিত ভাবিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেন, এবং ইহা তাঁহার কর্ণরঞ্জে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি বিকট ক্রভঙ্গী করিয়া রোষকষায়িতলোচনে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিতেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া নিজের ক্রোধে নিজেই দগ্ধ হইতেন; তাহার পর পাঠশালার আসিয়া তাঁহার উদ্ভাবিত নানাপ্রকার শারীরিক দণ্ডবিধানে ছেলেদের তরিবৎ শিক্ষা দিতেন। তাঁহার ‘পিণালকোডে’ও রামের অপরাধে হরির পিঠে বেত পড়িত! বেতের ‘আপীল’ নাই, সুতরাং হরি বেচারী বিস্তর অশ্রু ও আন্তনাদ বর্ষণ পূর্বক বেত হজম করিয়া, ছুটির পর অদৃশ্য থাকিয়া গুরুমহাশয়কে তিনগুণ ক্ষেপাইয়া তুলিত।

একদিন আমাদের বাড়ীর বাহিরের আঙ্গিনায় সবুজ ঘাসের উপর আট দশ জনে মিলিয়া ‘হাড়ু-ডুডু’ খেলিতেছি ; আমাদের দলের দু’জন খেলোয়াড় ‘মরিয়া’ বসিয়া আছে, আমি সবেমাত্র দমটি বন্ধ করিয়া ‘ডুডু’ ধরিয়া বিপক্ষ দলের ‘কোটে’ পা দিয়াছি, এমন সময় যে দু’জন ‘মরিয়া’ এক ধারে চূপ করিয়া বসিয়াছিল, তাহারা অত্যন্ত চঞ্চলভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল ! দেখিয়া বিপক্ষ দলের এক জন চীৎকার করিয়া বলিল, “ওকি ভাই ! তোমরা মরেছ, তবে কেন খেলার মধ্যে দাঁড়াও ?” মৃত খেলোয়াড়দ্বয় মুখে কোন কথা না বলিয়া পথের দিকে অঙ্গুলিপ্রদর্শন পূর্বক এক লম্ফে আমাদের বাগানে প্রবেশ করিয়া মুহূর্তমধ্যে অদৃশ্য হইল, সঙ্গে সঙ্গে সকলেই এই মহৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। আমি ভীতিবিহ্বল-নেত্রে পথের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলাম, দেড়খানি মনুষ্যপদে ভর করিয়া একটি সচল ভূঁড়ি আমাদের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছে ! গুরুমহাশয় তাঁহার ধোয়া তো’করা চাদরখাদি কটিদেশে জড়াইয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আমাদের বাড়ীতেই আসিতেছেন। আমাদের খেলোয়াড়গণের মধ্যে আমি ভিন্ন সব কটিই গুরুমহাশয়ের ছাত্র, সুতরাং তাঁহার কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জগুই তাহারা পলায়ন করিয়াছে, ইহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলাম।

আমার একালের ছাত্র বন্ধুগণ সেকালের গুরুমহাশয়ের ছাত্রগণের এই ব্যবহারের অর্থ বুঝিতে পারিবেন না, তাহা বুঝিয়াছি ; কারণ, একালের মাষ্টার মহাশয়েরা ছেলেদের ‘জিম্‌থ্রাপ্টিক্’ শিক্ষার মুকুবি ; কিন্তু সেকালের গুরুমহাশয়েরা এইপ্রকার ব্যায়ামানুষ্ঠানকে অশিষ্টাচার মাত্র মনে করিতেন, এবং তাঁহাদের ‘পিনালকোড’ অনুসারে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া পড়াগণকে শারীরিক দণ্ডবিধান দ্বারা তরিবৎ

শিক্ষাদিতেন। এইরূপ ‘তরিবৎ’ শিক্ষার কল্যাণে আমরা দিব্য ভালমানুষ হইয়া পরম সুখে কেরাণী-গিরি করিতেছি !

গুরুমহাশয়কে আমাদের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আমার পলায়নের কোন কারণ ছিল না ; আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। চন্দ্রকান্ত আমার কাছে আসিয়া ঠাকুরদাদা মহাশয়ের খোঁজ করিলেন। ঠাকুরদাদা তখন একটি নিড়ানী লইয়া বাগানে বেগুনের চারাগুলির পরিচর্যা করিতে-ছিলেন। গুরুমহাশয় কতৃক আহৃত হইয়া তিনি চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া আসিলেন। আমি তখনও সেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম ; গুরুমহাশয় এক ছিলিম তামাক ভষ্ম করিয়া বক্রদৃষ্টিতে একবার আমার দিকে চাহিলেন, এবং গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নাম কি হে ছোকরা !” এমন স্নেহরস-লেশহীন ককশ কণ্ঠস্বর তাহার পূর্বে আর কখন শুনিয়াছি বলিয়া মনে হইল না ! আমি নতমস্তকে আমার নাম বলিলাম। নিজের নাম বলিবার সঙ্গে সঙ্গে সেকালে ‘ঠাকুরের’ নামটিও বলিতে হইত, নতুবা ‘তরিবতে’ দোষ পড়িত ; বিশেষতঃ, নীতিশিক্ষক ঠাকুরদাদা মহাশয় সেখানে উপস্থিত, পিতার নামও উল্লেখ করিলাম। আমার পড়াশুনার কোন ব্যবস্থা হয় নাই শুনিয়া গুরুমহাশয় অধিকতর গম্ভীর হইয়া উঠিলেন, এবং “লালয়েৎ দশ বর্ষাণি পঞ্চবর্ষাণি তাড়য়েৎ”—এই অপূৰ্ণ শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া ঠাকুরদাদা মহাশয়কে উপদেশ দিলেন, ছেলেদের আদর দেওয়া কিছু নয়, সর্বদা তাড়না করিতে হইবে ; উঠিতে বসিতে তাড়া, তবে ত ছেলে দ্রুত থাকিবে !

গুরুমহাশয়ের কথা শুনিয়া ঠাকুরদাদা একটু হাসিলেন, বলিলেন, “জানেন কি চক্রবর্তী মহাশয় ! বাড়ীর মধ্যে ঐ একটাই ছেলে”—আর যে যে কথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া পাঠকগণের সম্মুখে নষ্ট করিবার আবশ্যক

নাই,—তবে এখনও মনে পড়ে, বাৎসল্যের কথা বলিতে গিয়া স্নেহার্জ-
হৃদয় বৃদ্ধের বক্ষের অভ্যন্তর হইতে যে করুণার রুদ্ধ উচ্ছ্বাস উথলিয়া
উঠিত, পৃথিবীতে তাহার তুলনা নাই। যাহা হউক, ঠাকুরদাদার মুখে
শুনলাম, তিনি দুই চারি দিনের মধ্যেই আমাকে বাঙ্গালা স্কুলে ভর্তি
করিয়া দিবেন।

শুনিয়া আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল, কিন্তু গুরুমহাশয়
শিহরিয়া উঠিলেন; তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, “তাহা হইলে উহার
উৎসঙ্গে যাইবার পথ প্রশস্ত হইবে মাত্র, লেখা পড়া কিছুই শিখিতে পারিবে
না। আগে নামতা, কড়া গণ্ডা, বুড়ি পোণে ‘এস্তমাল’ হওয়া দরকার,
পরে তালপাতে, কলাপাতে ‘মকসো’ করিয়া হাতের লেখাটা ছরস্ত করিতে
হইবে; নতুবা লোকে মুহুরিগিরিই বা কেন দিবে, আর দরখাস্ত
লিখিতেই বা কি জ্ঞান ডাকিবে?”—ছেলেকে সর্বপ্রথমে পাঠশালার
পাঠাইবার পক্ষে গুরুমহাশয়ের প্রধান যুক্তি এই যে, বনিয়াদ কোন
ক্রমে কাঁচা রাখা কর্তব্য নহে; কাঁচা বনিয়াদের উপর দালান নিৰ্ম্মাণ
করিলে তাহা কখন ‘পোক্ত’ হয় না।—দাদামহাশয় সেকালের মানুষ ছিলেন,
গুরুমহাশয়ের যুক্তি শুনিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইল, স্কুলের পরিবর্তে পাঠশালায়
ভর্তি হওয়াই আমার কর্তব্য।—গুরুমহাশয়ের সৌভাগ্য! আমি তাঁহার
ছাত্র না হইলে তাঁহার চরিত্র অঙ্কিত করিয়া আর কে তাঁহাকে অমর
করিয়া রাখিত?

যাহা হউক, আমার বনিয়াদ পাকা করিয়া তুলিবার বন্দোবস্ত পাকা
করিয়া গুরুমহাশয় প্রকল্পচিত্তে গৃহে ফিরিলেন। পরদিনই আমার
পাঠশালার ভর্তি হওয়া স্থির হইয়া গেল। তদবধি গুরুমহাশয় আমার
বনিয়াদ সুদৃঢ় করিবার জ্ঞান যৎপরোনাস্তি আগ্রাস স্বীকার করিয়াছিলেন;

কতদূর কৃতকার্য হইয়াছিলেন, তিনিই বলিতে পারিতেন ; কিন্তু আমার সম্বন্ধে আমি এইটুকু বলিতে পারি যে, পাঠশালায় ভর্তি হইবার পর তাঁহার আবিষ্কৃত বত্রিশরকম দণ্ডের কোনটির কবল হইতে আমি আত্মরক্ষা করিতে পারি নাই। বনিয়াদ সুদৃঢ় করিবার জন্ত প্রথমে মাটির উপর সবলে ছরমুসের আঘাত করা প্রয়োজন ; এই কথা শ্রবণ করিয়াই বোধ হয় গুরুমহাশয় আমার দেহমৃত্তিকায় নিরন্তর মহা উৎসাহে মুঠাঘাত ও চপেটাঘাতের সুদৃঢ় ছরমুস প্রয়োগ করিতেন। অগত্যা আমি সেগুলি সহিষ্ণুতা-সহকারে সহ্য করিতাম।

প্রথম দিন সকাল বেলা উঠিয়া পর্য্যুষিত কুঠীতে উদর পূর্ণ করিয়া আমার কথামালাখানি, ছোট শেলেট ও দেশী হল্‌দে (তুলোট) কাগজের খাতাখানি হাতে লইয়া পাঠশালায় চলিলাম। সেকালে আমাদের পল্লী-অঞ্চলে বালির কিংবা শ্রীরামপুরের কাগজের বড়ই অভাব ছিল, এবং শ্রীহস্তের ‘কাকের ছাঁ বকের ছাঁ’ লেখাতে মূল্যবান কাগজ নষ্ট করাও গুরুজনের মতে যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হইত না। সে সময় একরকম হল্‌দে পুরু থস্‌থসে দেশী কাগজ মধ্যে ফেরিওয়ালারা সহরাঞ্চল হইতে বিক্রয় করিতে আনিত ;—পল্লী-গ্রামের দোকানদারেরা, দুই চারি বৎসর পূর্বেও দেখিয়াছি, এই কাগজের খাতা বাঁধিয়া ‘খস্‌ড়া’ হিসাব-পত্র লিখিত। পল্লী-অঞ্চল হইতে এখন এই অসভ্য ‘তুলোট’ নির্বাসিতপ্রায়, দুই চারিখানি কদাচিত্ দৈবজ্ঞ ঠাকুরের খুদীতে আশ্রয় লইয়া কোষ্ঠী-নির্মাণে অবজ্ঞাত জীবন উৎসর্গ করে !—আমরা প্রায়ই পরমা দিয়া এই কাগজ কিনিতাম না ; ফেরিওয়ালারা আসিলেই পুরাণো কাগজ, ছেঁড়া কাঁথা, জীর্ণ কাপড়-প্রভৃতির বিনিময়ে এই কাগজ লইতাম।

আমি খাতা লইয়া পাঠশালায় উপস্থিত হইয়াছি দেখিয়া পড়ুয়াদের মধ্যে ভারি বিস্ময়ের সঞ্চার হইল; কারণ, হাত না পাকিলে কাহারও কলাপাতেই লিখিবার অধিকার ছিল না, আমি তালপাতা কলাপাতা ডিঙ্গাইয়া একেবারে কাগজ ধরিয়াছি! এমন অসম্ভব ব্যাপার তাহার আর কখন দেখে নাই। গুরুমহাশয় আমাকে কাছে ডাকিয়া আমার বই ও শেলেটখানা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন; তাহার পর বলিলেন, “কথামালা পড়িলে চলবে না, এতে খালি শালিক, স্নায়োর, বাঘ, আর বকের কথা! ঠাকুর দেবতাদের কথা পড়তে হবে। বাঙ্গালা স্কুলের ছেলেগুলো এই সব ছাইভস্ম বাজে কেতাব পড়ছে, আর তাদের মধ্যে খৃষ্টানী মত গজিয়ে উঠছে! তুমি বাড়ী গিয়ে একখানি শিশুবোধক কিনবে।” শেষে আমার খাতা দেখিয়া বলিলেন, “আঃ সর্বনাশ! তুমি এখনি কাগজে লেখা ধরেছ?” কাজটা সাংঘাতিক গুরুতর বলিয়া মনে হইল না, আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। গুরুমহাশয় বলিতে লাগিলেন, “ও হচ্ছে না, প্রথমে রামখড়ি দিয়ে মাটিতে দাগা বুলাবার নিয়ম; তারপর তালপাতে লিখতে শুরু করতে হবে। তালপাতে হরফ দ্রুত হ’লে কলাপাতা ধরবার ব্যবস্থা; কাগজে লেখার এখনই কি?”— বাড়ী গিয়া তালপাতা সংগ্রহ করিবার জন্ত আদিষ্ট হইলাম।

সেই দিন আমায় উপর আরও একটা কঠিন হুকুম জারি হইল। গুরুমহাশয় বলিয়া দিলেন, অগ্রাত পড়োর মত বসিবার জন্ত একখানা আসন আমাকে বাড়ী হইতে আনিতে হইবে, এবং আমার নিজের দোয়াত কলমও প্রত্যহ পাঠশালায় আনা চাই।

বাহা হউক, সে দিন আমি আসন না আনিলেও গুরুমহাশয়ের আদেশক্রমে সর্দার-পড়ো শিবু ঘোষের আসনের একপাশে বসিতে

পাইলাম। চক্রবর্তীদের দক্ষিণদ্বারী ঠাকুর ঘরে এই পাঠশালা সংস্থাপিত ছিল। দোল, রাস বা ঝুলনের সময় চক্রবর্তীদের গৃহবিগ্রহ রাধাকান্তদেব সিংহাসনে চড়িয়া এই গৃহে উৎসব করিতে আসিতেন; উৎসবান্তে তিনি তাঁহার অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। উৎসবের কয়দিন পাঠশালা বন্ধ থাকিত, কিন্তু তাই বলিয়া পাঠশালা-প্রাঙ্গণে উৎসবমত্ত ছেলের দলের অভাব হইত না। গুরুমহাশয়ও এই কয়দিন ছেলেদের সঙ্গে বড় ভাল ব্যবহার করিতেন; কারণ, কোন একটা উৎসব বা পার্বণ উপস্থিত হইলেই পড়ুয়াদের কাছে গুরুমহাশয়ের পার্কণী আদায় হইত—এক বারকোশ সিধা ও চারিটা পয়সা। এ বিষয়ে কোন পড়োঁর বিন্দুমাত্রও ক্রটি হইবার ঘো ছিল না; ‘আমি গরীব,’ কি ‘মা বাপের হাতে পয়সা নাই,’ এরূপ কৈফিয়ৎ দিয়া কাহারও নিস্তার ছিল না; তিনি ঠহা ঘোর গুরুদ্রোহের লক্ষণ বলিয়া স্থির করিতেন, এবং উৎসবের পর পাঠশালা খুলিলেই, অপরাধী ছাত্রকে সম্মুখে ডাকিয়া, তাঁহার হস্তস্থিত খুল বেত্রদণ্ড পুনঃ পুনঃ আফাকান পূর্বক চক্ষু পাকাইয়া বলিতেন, “পয়সা নেই তা’ আমি কি জানি! পয়সা নেই ব’লে কি আমি আমার পার্কণী ছেড়ে দেব? পয়সা নেই ত’ পাঠশালায় মরতে এসেছিষ্ কেন? যা, গরু চরাগে। ভাল চাস্ ত’ যেখানে পাস্, সেখান থেকে সিধে আর পয়সা জুটয়ে আনিষ্; হাত পা আছে, চুরী করতে পারিষ্ নে? ফাঁকি দিয়ে বিগ্গে শিগ্‌বি, আমি তেমন গুরুমশায় নই!”—দেখিলাম, বড় কঠিন স্থান; পূজা মানত করিয়া কালীঠাকুরালীকেও ফাঁকি দেওয়া চলে, কিন্তু গুরুমহাশয়কে ফাঁকি দিলে হাতে হাতে ফল ভোগ করিতে হয়। সেকালের এ দেবতাগুলি এমনি জাগ্রত ছিল!

কিন্তু কি বলিতেছিলাম,—ঠাকুর ঘরের কথা। আমাদের পাঠশালা যে ঘরে বসিত, তাহা একখানি থ'ড়ো আটচালা ঘর; তিন দিকে মাটির দেওয়াল, সম্মুখে ঝাঁপের বেড়া। পাঠশালার পিছন দিয়া একটা মেটে রাস্তা নদীর দিকে চলিয়া গিয়াছে। রাস্তাটি অপ্রশস্ত, দুই ধারে নর্দমা; বর্ষাকালে এই নর্দমার মধ্যে বানের জল প্রবেশ করে, এবং ছোট ছোট ছেলেরা কক্ষির আগায় স্ত্রী জড়াইয়া ছিপ্ ফেলিয়া মাছ ধরাধরি খেলা করে।—পাঠশালার সম্মুখেই আঙ্গিনা; সেখানে পাড়ার বৃদ্ধারা আসিয়া গোময় 'ছড়াইয়া' ঘুঁটে শুকাইতে দেয়। এই আঙ্গিনার উপর দিয়া পল্লীবাসিনী বৌ-ঝিদের পাড়ায় ঘাইবার একটা সরু পথ; ডাহিনে বাগচীদের কলাবাগান, বেগেদের গোয়ালঘর, মণ্ডলদের তালগাছ,—পাঠশালার ছেলেদের 'পাততাড়ী'র উৎপাতে বৃক্ষটি প্রায় পত্রশূন্য। বাঁ ধারে একটা গর্ত; গর্তের ধারে কয়েক ঝাড় বাঁশ, কক্ষিবহুল বাঁশগুলি গর্তের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে; তাহার পাশেই ছোট আমবাগান। প্রবাদ, বাঁশঝাড়টি ভূতের আড্ডা। উক্ত আমবাগানে 'গলায়-দড়ে' নামক একটা আমগাছ আছে; কোন-কালে কে একজন লোক এই গাছের ডালে 'গলায় দড়ি' দিয়া মরিয়াছিল, এজন্ত গাছটি তদবধি উক্ত নামেই সুপরিচিত; সন্ধ্যার পর কেহ একাকী এই বাগানে প্রবেশ করিতে সাহসী হইত না; বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের রাত্রে ঝড়ের পর রাখালেরা দল বাঁধিয়া এই বাগানে আম কুড়াইতে আসিয়া কতদিন দেখিয়াছে,—দুই তিনটা ভূত 'গলায়-দড়ে' গাছটির বাঁকা ডালে পা ঝুলাইয়া বসিয়া গল্প করিতেছে! ঝটিকা ও বৃষ্টিপূর্ণ রাত্রে 'মান্দের মা' তাহার ঘরে শুইয়া কতদিন সন্ডয়ে শুনিয়াছে,—ভূত ও পেত্নীরা এই বাঁশবনে প্রবল কলহ

আরম্ভ করিয়াছে! সেই তীব্র, দীর্ণ, কর্কশ কণ্ঠস্বর ‘মান্কে’র মা’র চিরপরিচিত। বাঁশের উপর বাঁশ পড়িয়া ঝটকায় আলোড়িত হইলে কিরূপ শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা মান্কে’র মা জানিত না; সুতরাং তাহার রোমাঞ্চকর গল্প শুনিয়া আমাদেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, এবং যখনই এই বাঁশবনের কাছে আসিতাম, তখনই আমাদের আশঙ্কা হইত, হয় ত ভূত মহাশয় কোন-না-কোন কোণে বসিয়া কোটরগত চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন! কিন্তু আমাদের সহপাঠী দৈতোর কিছুমাত্র ভূতের ভয় ছিল না; দৈতোর মা আমাদের গ্রামের মধ্যে ভূত প্রেতের মন্ত্র, ডাইনী’র মন্ত্র, জলপড়া, তেলপড়া, ঝাড়া, স্বামী-বশীকরণ মন্ত্র প্রভৃতি মন্ত্রতন্ত্রের ‘অথরিটা’ ছিল; সে ভূত-প্রেতের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত দৈতাকে ‘মাজুলী’ দিয়াছিল। সেই সাহসে দৈতো যখন তখন বাঁশবনের নিকটে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিত,—

“ভূত আমার পুত, শাঁখ্‌নী আমার বি,—

মাছ-পোড়া দিবে ভাত খেয়েছি, কর্বি আমার কি?”

সুতরাং দৈতো আমাদের মধ্যে সাহস ও বীরত্বের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাহা হউক, আমাদের ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্যবর্তী বিবিধরূপ-পরিবেষ্টিত পাঠশালাখানি প্রভাতে ও সন্ধ্যাকালে বালকবৃন্দের কোলাহলে ছায়াচ্ছন্ন শিথিল বিহঙ্গ-নীড়ের স্তায় মুখরিত হইয়া উঠিত; কিন্তু শুষ্ক মধ্যাহ্নে চারিদিক যখন রৌদ্রে ঝাঁ-ঝাঁ করিত, কোন দিকে যখন জনমানবের সাড়াশব্দ পাওয়া যাইত না, এবং বাঁশবনের ভিতর হইতে একটা শ্রুতি থাতিয়া শিষ্য দিয়া কর্ণপ্রাপ্ত মধ্যাহ্নের নীরবতা ভঙ্গ করিত, তখন গুরুমহাশয় চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী আদি

গামছাখানি কাঁধে ফেলিয়া তাঁহার সিংহাসন জীর্ণ টুলের উপর বসিয়া দেওয়ালে হেলান দিয়া ও মুখগহ্বর ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া অর্দ্ধনিমিলিত-নেত্রে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেন,—নাসিকা বিকট গর্জ্জন করিত ; এবং তাঁহার ছাত্রগণ গুরুমহাশয়ের সুখ-নিদ্রাভঙ্গের আশঙ্কায় অতি অগুচস্বরে কথা কহিত ।—কিন্তু অপরাহ্নের পাঠশালার কাহিনী বলিবার পূর্বে, প্রভাতে পাঠশালায় অধ্যয়ন অধ্যাপন কি ভাবে চলিত, তাহা বলা আবশ্যক ।

বর্ষা ও শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালই পাঠশালার ছেলেদের অধিক প্রীতিকর ছিল। কারণ, এমন স্নিগ্ধ, সুন্দর, মধুর প্রভাত বৎসরের অল্প সময় একান্ত দুর্লভ। আমার এখনও মনে পড়ে, বৈশাখমাসের প্রভাতে তরুণ অরুণ পূর্বাকাশ উদ্ভাসিত করিয়া উদিত হইলে তাহার স্নলোহিত রশ্মিজাল বংশপত্রের অন্তরালপথে পাঠশালার দেওয়ালে, ঝাঁপের বেড়ায়, শিশিরসিক্ত খড়ের চালে, এবং অঙ্গন-গ্রস্ত ঘুঁটের উপর বিক্ষিপ্ত হইত। ছেলেরা কুশাসনে পাততাড়ী জড়াইয়া, কেহ মাটির, কেহ চিনামাটির দোয়াতের গলায় দড়ি বুলাইয়া, কৌচড়-ভরা মুড়ীমুড়কী চিবাইতে চিবাইতে পাঠশালার দিকে চলিত। সকলেই খুব সকালে পাঠশালায় আসিত বটে, কিন্তু গুরুমহাশয়ের আসিতে কিছু বিলম্ব হইত ; কারণ, তিনি স্নান ও শালগ্রাম পূজা শেষ না করিয়া দৈনন্দিন কার্য্যে বাহির হইতেন না। তিনি যতক্ষণ পাঠশালার আঙ্গিনায় পদার্পণ না করিতেন, ততক্ষণ পড়াশুনা আরম্ভ হইত না ;—আঙ্গিনায় ‘ডুডু’ বা ‘চাম্‌চু’ খেলা এবং ঘরের কানাচে কিংবা বাগচাদের কলাবাগানে লুকোচুরী খেলা চলিত। তাহার পর পথের অপর প্রান্তে যেমন গুরুমহাশয়ের লোহার দাঁড়িবিশিষ্ট, সাদা কাপড়

বিশিষ্ট, সাদাকাপড়-মোড়া চিরপরিচিত ছত্রের অগ্রভাগ দেখা যাইত, অমনি সকলে অতি শাস্ত সুবুদ্ধি ছেলের মত নিজ নিজ ঘায়গায় বসিয়া পাঠে মনঃসংযোগ করিত; কিন্তু তাহাদের মন তখন কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহারা ভিন্ন অপরে তাহা বলিতে পারিত না। তথাপি কর্তব্য উপেক্ষিত হইত না; সর্দার পড়োরা লম্বা লম্বা ‘রামখড়ি’ দিয়া মাটির উপরে মোটা মোটা হরফে ‘ক খ গ ঘ ঙ’ প্রভৃতি অক্ষর দাগিয়া দিত, আর যে সকল ছেলে সবোমাত্র ‘হাতে খড়ি’ দিয়া পাঠশালায় আসিয়াছে, তাহারা ‘মহাজনো যেন গতঃ স পদ্মা’র রাম মুষ্টিবদ্ধ খড়িঘারা সেই সকল হরফের উপর জোরে জোরে ‘দাগা’ বুলাইত। অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ ছেলেরা তালপাতার উপর ‘সেবকশ্রী’ ও ‘কড়াগঙা’ লিখিত; এবং আরও বড় বড় ছেলেরা কলার পাতে ‘শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ চক্রবর্তী, উদ্ধবচন্দ্র ভঞ্জ, গঙ্গাগোবিন্দ চতুধুরীন, ক্ষেমস্বর ব্রহ্ম’ প্রভৃতি উৎকট উৎকট বানান-বিশিষ্ট নাম লিখিয়া আপনাদিগের হস্তাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে ফলা-বানান ত্বরিত করিত। সর্দার পড়োরা প্রায় সকলেই কলাপাতা ছাড়িয়া কাগজের শ্রেণীতে ‘প্রমোশন’ পাইয়াছিল; তাহারা বড় বড় ‘আদর্শ লিপি’ সম্মুখে রাখিয়া মোটা মোটা কাল ‘খাঁকে’র কলমে কেহ ‘নহামহিম মহিমার্ণব শ্রীযুক্ত বাবু অমুক, কস্ত কৰ্জ্জখতপত্রমিদং কার্য্যদক্ষাগে’ প্রভৃতি ‘বাধিগদ’যুক্ত খতের মুসাবিদা দ্বারা উক্ত মহা-মহিমের নিকট হইতে যথেষ্টক্রমে বিশ পচিশ লাখ টাকা কর্জ লইত! কেহ ‘আজ্জাকারী প্রতিপাল্য সেবক শ্রীঅমুক ‘সবিনয় পূর্বক’ নমস্কার-নিবেদনধাগে মহাশয়ের রাজলক্ষ্মী শ্রীশ্রীবিঃজ করিতেছেন তাহাতে অত্যানন্দ পরং’ প্রভৃতি লিখিয়া পত্র-রচনার অনিন্দ্যসুন্দর সরল আদর্শের অনুকরণ করিত। জমীদারের গোমস্তা, মুহুরী বা পাটোয়ারী-

গিরি চাকরী মাত্রই ইহাদের জীবনের অতুল্যত লক্ষ্য ছিল।—চতুর্দিকে সহসা এই প্রকার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের আফালনে নিজের সম্বন্ধে আমি নিদারুণ হতাশ্বাস হইয়া পড়িতাম, এবং প্রথম প্রথম কি করা কর্তব্য, তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ‘হংসমধ্যে বকো যথা’ হইয়া বসিয়া থাকিতাম। আমার অবস্থা প্রথমটা এমনি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল !

গুরুমহাশয় পাঠশালায় পদার্পণ করিয়া একেবারে টুলের উপর চাপিয়া বসিলেন, এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, “এখনো গোবিন্দকে দেখেছি নে কেন ? নদের চাঁদ ! গোবিন্দের খবর কি রে ?” ভিন্ন গ্রাম হইতে আগত একটা পায়রার স্বত্বাধিকার লইয়া কয়েক দিন হইতে গোবিন্দের সহিত শ্রীমান নবদ্বীপচন্দ্রের কিঞ্চিৎ মনান্তর চলিতেছিল ; আজ নবদ্বীপচন্দ্র গোবিন্দকে প্রতিফল দানের উৎকৃষ্ট অবসর লাভ করিল, দাঁড়াইয়া বলিল, “আমি আসবার সময় তাদের দরজায় দাঁড়িয়ে অনেক ডাকাডাকি করলাম, তা কোন সাড়া পেলাম না ; বুঝি ঘুমুচ্ছিল, বেলা এক পহরের আগে আবার তাঁর ঘুম ভাঙ্গে না, কেউ ডেকে দিলে বাবুর ভারি রাগ হয় !” গুরুমহাশয়কে একটা কথা ধরাইয়া দিতে পারিলেই হইল ! নবদ্বীপের কথা শুনিয়া তাঁহার স্থির বিশ্বাস জন্মিল, গোবিন্দ নিতান্ত নিদ্রাতুর ; তাই তিনি গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, “একথা এতদিন বলিস্ নি কেন ? আজ বেতের চোটে তার এক পহর বেলা পর্য্যন্ত ঘুমোনো ভাল কর্চি ; লক্ষ্মীছাড়া আসুক আগে।”—ইতিমধ্যে গোবিন্দ আসিয়া উপস্থিত ! গুরুমহাশয় চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করিয়া বলিলেন, “হাঁরে গোবিন্দে, তুই যে দিন দিন ভারি নবাব হয়ে উঠ্ছিস্ দেখতে পাচ্ছি ; যাতে তোর

সকালে ঘুম ভাঙ্গে, তাই কচি ! এ তোর বাপের জমীদারী সেরেস্তা, নয় ? বখন খুসী হাজিরে দিলেই হলো !”—ঈনস্তর তিনি ছাত্রবর্গের প্রতি চাহিয়া আদেশ দিলেন, “নিরে আয় ত এক গাছ ‘কচার ডাল’ ভেঙ্গে, ওর পিঠে বা কত দিই ।”—পাঁচ ছয় জন ছাত্র ‘কচার ডাল’ নামক ভীষণ আয়ুধ সংগ্রহের জন্য ছুটিয়া গেল ।

ভয়ে গোবিন্দের পা ছ’খানি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কপাল ঘামিয়া উঠিল, মুখ শুকাইয়া গেল ; দেখিলাম, তাহার অবস্থা ফাঁসির আসামীর মত ! কিন্তু সে জবাব দাখিল করিতে ছাড়িল না ; তাহার নির্দোষিতার প্রমাণ যে অমোঘ ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । গোবিন্দ দোয়াত ও পাততাড়ী হাত হইতে না নামাইয়াই বলিল, “আমার দোষ কি, গুরুম’শায় ? আমি ত ইচ্ছে ক’রে দেৱী ক’রি নি ; আপনি কাল বাবার মশলাদেওয়া ভাল অম্বুরী তামাক চুরি করে আনতে বলেছিলেন, তা বাবা কাছারী না বেরুলে ত আনতে পারি নে । সেই জন্তে একটু দেৱী হয়ে গেল ; ঘুম তো আমার রোদ না উঠতেই ভাঙ্গে ।”

গুরুমহাশয়ের দংষ্ট্রাবিকশিত বিকট মুখচ্ছবি কিঞ্চৎ শান্তভাবে ধারণ করিল ; তিনি অপেক্ষাকৃত নরম স্বরে বলিলেন, “তামাক এনেছিস্ তো ?” “আজ্ঞে হাঁ, অনেকখানি এনেছি, এই দেখুন ! বাইরে বেশী তামাক থাকলে আরো আনতে পারতাম । আর একদিন আবার খানিক আনবো ।”—বলিয়া সে কলাপাতায় মোড়া একদলা তামাক কোঁচার ‘গুঁট’ হইতে খুলিয়া গুরুমহাশয়ের হস্তে প্রদান করিল । গুরুমহাশয় তামাকের দলাটা নাসারন্ধ্রের কাছে ধরিয়া বলিলেন, “হাঁ, অম্বুরী বলেই বোধ হচ্ছে । মধ্যে, এক ছিলিম তামাক ভাল ক’রে সেজে আনতো ; দেখিস্, যেন সে দিনের মত কন্কের মধ্যে ‘ঠিক্‌রে’ দিতে

ভুলিস্ নে ; ও ভেড়োর বাপ যে তামাক খায়, তা আমি জানি ; যদি সেই তামাক না হয়, ত ও বেটার পিঠ আস্ত রাখবো না ।”—মধুর হাতে এক ছিলিম তামাক প্রদত্ত হইল ।

মধুসূদন তামাক সাজিয়া সন্নিবৃত্ত গাঁড়ার-বাড়ী আগুন আনিতে চলিল । সোনা গাঁড়ারের স্ত্রী ‘পদী গাঁড়ালনি’ ওরফে পদ্মমণি তখন ছেলে কোলে লইয়া তাহাকে স্তম্ভপান করাইতে করাইতে দক্ষিণ হস্তে ঢেঁকির ‘নোটে’ চিঁড়া ও বাম হস্তে উন্নত-স্থিত খোলায় ‘কুচি’ দিয়া চিঁড়া কুটিবায় ধান নাড়িতেছিল । উননে আগুন, বিশেষতঃ তুমের জ্বাল ! গাঁড়ার-বৌ তিন কার্ঘ্যে ব্যস্ত, হাতের কিছুমাত্র অবসর নাই ; কিন্তু শ্রীমান্ মধুসূদনও ছাড়িবার পাত্র নহে । সে বলিল, “গাঁড়াল বৌ, তোমার পায়ে পড়ি, একথান ঘসি ধরিয়ে দাও ; না হ’লে মশায়ের তামাক খাওয়া হয় না ।” অনেক অনুনয় বিনয়ের পর গণ্ডকরমণী একখানি ঘুঁটে ধরাইয়া দিল । তখন মধু আড়াল হইতে কলিকাটিতে দুই চারিটা টান দিয়া ঘুঁটের আগুনটুকু জম্কাইয়া পাঠশালায় ফিরিয়া আসিল, এবং কলিকাটি গুরুমহাশয়ের হঁকার উপর বসাইয়া হঁকা তাঁহার হাতে দিল ।

গুরুমহাশয় হঁকাতে এক টান দিয়াই মধুর পিঠে এক ঘা বেত বসাইলেন । মধু এ জন্ত কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিল না, অপরাধ কি তাহা বুঝিতে না পারিয়া সে অবাক হইয়া গুরুমহাশয়ের দিকে চাহিল ; গুরুমহাশয় বলিলেন “হঁকোতে ক’ বছর ‘জল ফিরান’ হয় নি রে ! যা, এখনি জল ফিরিয়ে আন ।”

হঁকার জল-ফিরান হইলে গুরুমহাশয় পরিতোষপূর্বক তামাক ছিলিমটা পরিপাক করিয়া বলিলেন, “দেখ, আজ একাদশী, কাল দ্বাদশার পারণ, বুধেছিস্ কি না ! ‘সিধে’ যেন ভাল রকম হয় । গুরুমহাশয়কে

সিধে ফাঁকি দেওয়া আর কামারকে ইম্পাত ফাঁকি দেওয়া সমান কথা ।
কলাপাতা ছেড়ে কাগজ ধরেছে কে কে ?”

চতুর্দিক নিস্তব্ধ ; এমন সময় সর্দার পড়ো শিবু উঠিয়া করজোড়ে
বলিল, “নিতাই, ত্যাপ্লা, আর জগা কাগজ ধরেছে ।”

গুরুমহাশয় উক্ত তিনটি পড়ুয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক বলিলেন,
“তোরা কাগজ ধলি ত আমার সিধে ব্যকি রেখেছিস্ কেন ? কাগজ
ধরলে সিধে দিতে হয়, সেটা ভুলে গিয়েছিস্ বটে !”—গুরুমহাশয়
তাহার টুলের প্রান্তে নিপতিত বেত্রখানির প্রতি কটাক্ষপাত
করিলেন ।

নিতাই, নেপাল, জগা—পড়ুয়াত্রয় প্রমাদ গণিল ! তাহারা দাঁড়া-
ইয়া করঘোড়ে বলিল, “কাল আমরা আপনার বাড়ীতে সিধে দিয়ে আস্‌বো,
আজ আমাদের মাফ্ করুন, মশায় !”

জানি না কোন্ স্মৃতিকালে তাহারা সে যাত্রা পরিব্রাজ্য পাইল ।
অনন্তর গুরুমহাশয় অনুমতি দিলেন, “এখন তোরা সব লেখ, হেঁকে
হেঁকে লেখ ।”

তখন পাঠশালার লিখিবার ধূম পড়িয়া গেল ! কেহ পূর্ববৎ বাটীতে
রামধড়ি দিয়া মোটা মোটা ‘ক’ ‘খ’ লেখার উপর দাগা বুলাইতে
লাগিল ; কেহ সুর করিয়া তালপাতায় লিখিতে আরম্ভ করিল,—গণসাঁকড়ি
‘ক’ লেখ, মাথায় পাগ্‌ড়ী ‘ঙ’ লেখ, ছেলে-কাঁকালে ‘ব’ লেখ, পালান-পিঠে
‘ঞ’ লেখ, হেঁটভান্সা ‘দ’ লেখ, কান-মোচ্‌ড়ান ‘ধ’ লেখ, পেটকাটা ‘ব’
লেখ—ইত্যাদি ।

এক দিকে যেমন লেখা আরম্ভ হইল, অত্র দিকে সেইরূপ পাঠ চলিতে
লাগিল । কেহ ত্রিপদী ছন্দে ‘গঙ্গাবন্দনা’ পড়িতে লাগিল,—

“বন্দ মাতা সুরধুনী, পুরাণে মহিমা শুনি,
 পতিতপাবনী পুরাতনী ।
 বিষ্ণুপদে উপাদান দ্রবময়ী তব নাম,
 সুরাসুর নরের জননী ॥”

কেহ কেহ বা শিশুবোধকে ‘কলঙ্কভঞ্জন’ পৃষ্ঠা খুলিয়া সম্বন্ধে পয়ার-
 পাঠে মনোনিবেশ করিল,—

“মুনি বলে শুন অভিমুখ্য নন্দন ।
 কহিব শ্রীকৃষ্ণলীলা অপূর্ব কখন ॥
 ভক্তি করি ভজ রাজা মদনগোপাল ।
 ঐহার কৃপায় ঘুচে সকল জঞ্জাল ॥”

পাঠশালায় শুধু সাহিত্য নহে, ব্যাকরণেরও অনুশীলন হইয়া থাকে। ছাত্রদিগকে হস্তলিপি ও সাহিত্যের আলোচনায় নিযুক্ত করিয়া গুরুমহাশয় কয়েকটি অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক প’ড়োকে নিজের কাছে দাঁড় করাইয়া শিশুবোধ ব্যাকরণের পাঠ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভজহরি নামক একটি ছাত্রের বুদ্ধি দেহের অনুরূপ হুল ছিল; এই জন্ত সে পাঁচ সাত দিনের মধ্যেও বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের পার্থক্য বুঝিতে পারে নাই! গুরুমহাশয় সর্বপ্রথমে তাহাকেই ধরিয়া বসিলেন, বলিলেন, “ভজা, আজ একটা অতীত কালের দৃষ্টান্ত দে দেখি।” ভজহরি অবলীলাক্রমে বলিল, “আমি ভাত খাই-তেছি,”—শুনিয়া সকলের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল; কিন্তু গুরুমহাশয়ের ভয়ে কেহ শব্দ করিয়া হাসিতে পারিল না। গুরুমহাশয় বলিলেন, “হাঁ, চমৎকার হয়েছে, তোকে আমি ভাল করেই ভাত খাওয়াচ্ছি!—আচ্ছা, একটা বর্তমান কালের দৃষ্টান্ত বল।” ভজহরি বুঝিল, আগের

উত্তরটার মধ্যে হয় ত কিছু গোল রহিয়া গিয়াছে ; সুতরাং এবার ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিল, “হরি কাল আসিবে”—শুনিয়া গুরুমহাশয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; প্রমাদ গণিয়া ভজহরি দুই হাত পিছাইয়া গেল। গুরুমহাশয় তাহার দক্ষিণ কর্ণ ধরিয়া সবেগে নাড়া দিয়া বলিলেন, “এক শ’ দিন বুঝিছ, তবু যদি হতভাগা কিছু বুঝতে পারবে ! সাঁকরার ছেলের আর কত বুদ্ধি হবে ? এই দেখ্, এরই নাম বর্তমান।”—গুরুমহাশয়ের করকমলের সংস্পর্শে ভজহরি বেচারার কাণ ফুলিয়া উঠিল ; কিন্তু তখনও তাহার নিকৃতি নাই ! গুরুমহাশয় দক্ষিণ কর্ণ ত্যাগ করিয়া তাহার বাম কর্ণ নিপীড়িত করিয়া বলিলেন,—“এই অতীত ;” এবং তাহার মাথার চুল ধরিয়া সম্মুখের দিকে টানিয়া পিঠে একটি সুগুরু মুঠ্যাঘাত প্রদান পূর্বক বলিলেন, “ইহাকেই ভবিষ্যৎ কাল বলে ! কেমন, এখন মনে থাক্বে ?” বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের এই অভিনব দৃষ্টান্তে প্রচুর জ্ঞান লাভ করিয়া গুরুমহাশয়ের আদেশে ভজহারি হাঁটু পাতিয়া রৌদ্রে ‘নাড়ুগোপাল’ হইয়া বসিল ; কিন্তু নাড়ুর পরিবর্তে দুই হাত একত্র করিয়া তাহার উপর একখান এগার ইঞ্চি ইট স্থাপিত হইল ! দুই ঘণ্টা এইরূপে বসিয়া থাকিয়া বেলা দশটার সময় যখন ‘সট্কে’ ও ‘কড়াগণ্ডা’ পাঠ আরম্ভ হইল, তখন ‘নাড়ুগোপাল’ উঠিয়া দলে মিশিবার অনুমতি পাইল।

কড়াগণ্ডা পড়িবার সময় সকলে সারি দিয়া দাঁড়াইল। প্রথমেই সর্দার পোড়ো আরম্ভ করিল, “এক কড়া পোয়া গণ্ডা”—তিনি ডজন ছাত্র তাহার অনুবৃত্তি করিয়া সম্মুখে হাঁকিল, “এক কড়া পোয়া গণ্ডা।” এইরূপে কড়া গণ্ডা বুড়ি পণ সমস্ত আবৃত্তি করা শেষ হইলে সর্দার

পোড়ো তারস্বরে নামতা পড়াইতে আরম্ভ করিল,—“তুই একে তুই, তুই দুগুণে চার”;—“কুড়িং কুড়িং চারশো” পর্য্যন্ত আবৃত্তি শেষ হইলে পাঠশালার ছুটি হইল। ‘পাততাড়ি’ বগলে, দোয়াত হাতে ছেলের দল হড়াহড়ি করিয়া পাঠশালা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তখন বেলা প্রায় এগারটা। সকালের পাঠশালা সাধারণতঃ এগারটা পর্য্যন্তই খোলা থাকিত; তবে, আমাদের স্কুলটিবশে স্বগ্রামে কিংবা নিকটবর্তী কোন ভিন্ন গ্রামে গুরুমহাশয়ের মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ থাকিলে সে দিন “হাফ পাঠশালা” হইত, অর্থাৎ দশটার পূর্বেই আমরা অব্যাহতি পাইতাম। অপরাহ্নের কার্যভার তিনি সর্দার-পোড়োর উপর তুলিত করিয়া নিমন্ত্রণরক্ষার ঘাইতেন। পরের বাড়ী আহাৰ জুটিলে গুরুমহাশয় যেরূপ পরিপূর্ণ-মাত্রায় বোকাই লইতেন, তাহাতে অপরাহ্নে পাঠশালায় উপস্থিত হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইত না; সুতরাং সেদিনটাকে আমরা এক রকম ছুটি বলিয়াই গণ্য করিতাম। ব্রত পার্কণাদি উপলক্ষে এরূপ ছুটি বৈশাখ মাসেই আমরা অধিক পাইতাম।

গুরুমহাশয়ের অত্যাচারে কাগজে লেখা পরিত্যাগ করিতে হইল। আমার লেখা সম্পূর্ণরূপে নামঞ্জুর করিয়া তিনি কাঁচিয়া গোড়াপত্তনের ব্যবস্থা দিলেন; তালপাতে লেখা স্ক্রু করিবার জন্ত তুই বেলা তাড়া চলিতে লাগিল। আমি বিষম বিপদে পড়িলাম! তালপাতা পরসাদিয়া কিনিতে পাওয়া যায় না, আবার গাছে উঠিয়া কাটিয়া লওয়াও আমার সাধ্যাতীত। আমাদের সর্দার পোড়ো শিবু পাকা ‘গাছুড়ে’; অগত্যা তাহাকেই ধরিলাম। সে প্রথমে কিছুতেই সম্মত হয় না; অবশেষে তাহাকে লোভ দেখাইলাম, কাকা কলিকাতা হইতে আমার জন্ত ‘লজ্জুস্’ আনিবেন, সে তাহার অর্দ্ধেক ভাগ পাইবে। এই চুক্তি

উৎকোচের প্রলোভনে পড়িয়া শিবু তৎক্ষণাৎ আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল। আহাঙ্গাদির পর ছপুরের সময় শিবু কাস্তে হাতে লইয়া মণ্ডলদের তালগাছে উঠিয়া পড়িল, এবং ক্ষিপ্ৰহস্তে দুই তিনটা ‘ডেগ্‌ড়ো’ কাটিয়া ধাঁ করিয়া নীচে নামিয়া আসিল। তালপাতাগুলি চাঁচিয়া-ছুলিয়া সমান করা হইলে শিবু বলিল, “এখন ওতে লেখা যাবে না, দিন কত ‘পচান’ দিয়ে রাখতে হবে।” তদনুসারে সেগুলি আমাদের বাড়ীর গর্ভে পাঁকের মধ্যে পুঁতিয়া রাখা হইল; তিন দিন পরে তুলিয়া দেখিলাম, তালপাতাগুলির বর্ণ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে! তখন সেগুলি ধুইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইলাম। এইরূপ প্রক্রিয়ায় তালপাতাগুলি দীর্ঘ ব্যবহারে ও ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া নষ্ট হইয়া যায় না, অথচ ইহাদের স্থিতিস্থাপকতা গুণ বর্দ্ধিত হয়।

কিন্তু আর এক বিপদ উপস্থিত হইল! আমাদের বাড়ীতে ইংরাজী ‘কম কালি’র ব্যবহার ছিল, একালের মত তখন পল্লীগ্ৰামে ‘ব্লু ব্লাক’ কালিপূর্ণ ছ’পয়সার কাঁচের দোয়াত প্রবেশ লাভ করে নাই; সুতরাং ইহারা ‘কম কালি’তে লিখিবার ইচ্ছা করিতেন, তাঁহারা আমলা, হরিতকী, বহেড়া প্রভৃতি বেণে-মশলার সহিত বাবলার ছাল জলে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিতেন; কয়েকদিন উত্তমরূপ রৌদ্রভোগের পর তাহা কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইলে, মশলার সহিত সেই জল লোহার কড়া করিয়া ফুটাইয়া লওয়া হইত; অনন্তর কিছু গাঢ় হইলে তাহাতে হীরা কষচূর্ণ দিয়া ঘুঁটিয়া লইলেই লিখিবার উপযুক্ত কালি হইত। মশলার ‘কম’ হইতে এই কালি প্রস্তুত হইত বলিয়া বোধ হয় পল্লী অঞ্চলে ইহার নাম ‘কমকালি’; এবং শুধু ইংরেজীনবীশগণই এই কালির অনুরাগী বলিয়া সম্ভবতঃ সেকালের

লোক ইহাকে ‘ইংরাজী’ কালি বলিত। সেই ইংরাজী কালিই একটা ছোট আধ পয়সা দামের মাটির দোয়াতে পুরিয়া পাঠশালায় লইয়া চলিলাম। তালপাতের উপর তাহাতে ভাল দাগ বসিল না; তথাপি ‘কড়াগড়া’ ও ‘সেবকশ্রী’ লিখিয়া তালপাতাগুলি ভরিয়া গেলে গুরুমহাশয়-কর্তৃক সেগুলি পুষ্করিণী হইতে ধুইয়া আনিবার আদেশ প্রাপ্ত হইলাম। আরও অনেকে আমার সঙ্গে চলিল। তাহাদের তালপাতা ধুইবামাত্র কালি উঠিয়া গেল; কিন্তু আমার তালপাতার কালি আর উঠে না! অগত্যা গুরুমহাশয়ের কাছে আসিয়া সে কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে হইল। তিনি আমার বুদ্ধিবৃত্তির উপর দোষারোপ করিয়া এবং এক নির্কোষ চতুষ্পদ জন্তুর সহিত আমার উপমা দিয়া, আমাকে ইংরাজী কালি ফেলিয়া ‘ঝিউনী’ দিয়া ‘ভূবার কালি’ প্রস্তুত করিতে বলিলেন।

জমীদারী সেরেস্তার কাগজপত্র, দোকানদারের হিসাবের খাতা ইত্যাদি সেকালের যত কিছু বাঙ্গালা লেখা, সমস্তই এই ঝিউনীর কালিতে হইত; কিন্তু সকলে এ কালি প্রস্তুত করিতে পারিত না। আমি জানিতাম, আমাদের পাড়ার গদাধর এ বিষয়ে ভারি ওস্তাদ ছিল। স্নানযাত্রার দিন রাধাকান্ত দেব আমাদের পাঠশালায় তুধ-গঙ্গাজলে স্নান করিয়াছিলেন, তাই সে দিন আমাদের পাঠশালায় ছুটা ছিল। বৈকালবেলা আমি ও গদাধর পাড়ার ভিন চারি বাড়ীতে ঘুরিয়া প্রতিবেশিগণের ‘খোলাহাঁড়ি’র গা চুল দিয়া ঝাড়িয়া ভূষা সংগ্রহ করিলাম। গদাধরের মা সে সময় চাউল ভাজিবার জন্ত খোলা আলিয়াছিলেন। তিনি আমাদের একখোলা ‘ঝিউনী’ ভাজিয়া দিলেন; ‘ঝিউনী’ ‘কাঠ খোলা’র ভাজিতে হয়, অর্থাৎ ইহা ভাজিবার সময়

খোলা-হাঁড়িতে বালি দেওয়া হয় না। ভাজিতে ভাজিতে চাউলগুলি ক্রমে হাঁড়ির মধ্যে পুড়িয়া উঠে, এবং খুব ধূম উঠিতে থাকে; অবশেষে অনেকক্ষণ ভাজিবার পর তাহা পুড়িয়া ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। ইহাই ‘ঝিউনী’। ‘ঝিউনী’গুলি একখানি নেকড়ায় বাঁধিয়া একটা বড় পাথরের বাটীতে জলে ভিজাইয়া রাখা হইল।

পরদিন পাঠশালা হইতে ফিরিয়া সেই ঝিউনী-জল ভূষোটুকুতে ক্রমে ঢালিয়া ঘুঁটিয়া কালি প্রস্তুত করিয়া লইলাম। কালি বেশী চক্চকে করিবার জন্য গদাধর তাহাতে খানিক বাবলার আঠা ও কলাগাছের রস দিল। এই কালি দোয়াতে পুরিয়া তাহাতে খানিক ‘কেটো’ অর্থাৎ ছেঁড়া নেকড়া দিবার নিয়ম ছিল; হঠাৎ দোয়াত উল্টাইয়া কালিটা পড়িয়া না যায়, এই জন্তই বোধ হয় এরূপ করা হইত। একালে আর আধপয়সা দামের সে রকম মাটির দোয়াত দেখা যায় না, এবং দোয়াত ‘কেটো’ পুরিবার প্রথাও উঠিয়া গিয়াছে। যে রকম লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে দিনকত পরে কাচের দোয়াত পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইবে ও সর্বত্রই বিলাতী ‘ফাউন্টেন পেন’ প্রচলিত হইবে।—সুবিধার কথা, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ? বিলাসের সৃষ্টি এই ভাবেই হইয়া থাকে !

দুপুরের পর আবার পাঠশালা বসিত। গুরুমহাশয় পাঠশালার আসিয়া এক ছিলিম তামাক টানিয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেন। তিনি তখন নিজে দুই চারিবার তালপাতার পাখা ঘুরাইয়া শেষে পাখাখানি কোন পোড়োর হাতে দিয়া নিদ্রাবিজড়িত স্বরে তাহাকে বাতাস করিতে বলিতেন। সর্বাপেক্ষা অধিক অনুরক্ত ছাত্রবৃন্দেরই গুরুমহাশয়কে বাতাস করিবার অধিবার ছিল; তাহারাও ইহা অসাধারণ অনুরাগ বলিয়া মনে করিত। আর একরকমে গুরুমহাশয় পোড়োদিগের

উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করিতেন ; যাহার প্রতি তিনি অত্যন্ত সদয় হইতেন, তাহাকে দিয়া মাথার পাকাচুল তুলাইয়া লইতেন ! কিন্তু কখন কখন এই অনুগ্রহ নিগ্রহে পরিণত হইত ; পাকাচুল তুলিতে গিয়া যদি দৈবাৎ কেহ একটা কাঁচাচুল তুলিয়া ফেলিত, তাহা হইলে আর তাহার নিগ্রহের সীমা থাকিত না ; বেচারীকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পাঠশালার এক কোণে এক পা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত । বস্তুতঃ, ছাত্রগণের নিরন্তর পরিচর্যাফলেই গুরুমহাশয়ের মস্তকটি এই ‘পঞ্চাশোদ্ধে বনং ব্রজেৎ’এর বয়সেও কাশক্ষেত্রে পরিণত হয় নাই !

যাহা হউক, ঘণ্টাখানেক পরে গুরুমহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেন, সকল পোড়ো হাজির হইয়াছে কি না । একদিন বৈকালে গুরুমহাশয় দেখিতে পাইলেন, বেগেদের কৃষ্ণ পাঠশালায় আসে নাই । তিনি গলা চড়াইয়া বলিলেন, “কেষ্টাকে পাঠশালায় দেখ্‌চি নে, সে মধ্যে মধ্যেই বিকেলে কামাই করে ; জনকত গিয়ে তাকে ধরে আন ত, পাঠশালে গর-হাজির হওয়া কেমন মজা, তাকে দেখাই ।” গুরুমহাশয়ের আদেশ প্রাপ্তিমান্ত্র চারিজন সবলকায় ছাত্র কৃষ্ণকে ধরিতে তাহাদের বাড়ীর দিকে ছুটিল । কৃষ্ণ ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তখন গাবের আঠা ও বোতলচূর দিয়া ঘুড়ির স্তত্য ‘মাজা’ দিতেছিল । কিন্তু সে বড় সতর্ক ; পোড়োদের পদশব্দ শুনিবামাত্র নাটাই ও স্ততা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি মাটিকোঠার মধ্যে গিয়া লুকাইল । ছেলেরা তাহাকে চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল । কৃষ্ণ দেখিল তাহার সহজে বাড়ী ছাড়ে না, যদি দৈবাৎ সন্দেহ করিয়া সেই মাটিকোঠার মধ্যে প্রবেশ করে তাহা হইলেই মহা বিপদ ! চারিদিক বন্ধ, বিনা-চেষ্টার গ্রেপ্তার হইতে

হইবে। সুতরাং “যঃ পলায়তি স স জীবতি” এই ঋষিবাক্যকে সার
জ্ঞান করিয়া সে অস্ত্রের অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে নাটিকোঠা হইতে নামিয়া থিড়কীর
দরজা খুলিয়া বাড়ী হইতে প্রস্থান করিল। হঠাৎ এক জন পোড়ো দূর
হইতে তাহাকে দেখিয়া হাঁকিল, “ঐ কেণ্টা পীলায়!” তৎক্ষণাৎ তাহারা
সকলে তাহার পশ্চাতে ছুটিল। কৃষ্ণ প্রাণের ভয়ে উর্দ্ধ্বাসে ছুটিতে
আরম্ভ করিল। শেষে বাঁশতলা দিয়া, জঙ্গল ভাঙ্গিয়া, ডোবা ডিঙ্গাইয়া
বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল। ছেলেরা তাহাকে বাগান পর্য্যন্ত তাড়া
করিয়া চলিল; কিন্তু বাগানে দুর্গম জঙ্গল, আশ্রয়ভার বন, ভাঁটের
গাছ, শিয়াকুল ও বঁইচির কাঁটা! তাহার মধ্যে কৃষ্ণ কোথায় গা-ঢাকা
দিল, কেহ সন্ধান করিতে পারিল না। বাগানের নীচেই নদী।
বালকগণ ভগ্নমনোরথ হইয়া নদীর ধার দিয়া পাঠশালায় ফিরিয়া চলিল।
শুনিতে পাওয়া যায়, কৃষ্ণ মধ্যে মধ্যে এইরূপে ‘শিয়াল-কাঁকি’ দিয়া
পলাইয়া জলে নামিত, ও হাঁড়ি মাথায় দিয়া বসিয়া থাকিত!
চলিতে চলিতে জলে একটা হাঁড়ি ভাসিতে দেখিয়া এক জন পোড়ো
বলিল, “ঐ একটা হাঁড়ি ভাস্চে; কেণ্টা ঐটে মাথায় দিয়ে বসে নেই ত?”
—এই কথা বলিবামাত্র হাঁড়ি তাড়াতাড়ি ভাসিয়া নদীর অপর
পারে চলিল। নদীতে বেশী জল নাই, খুব বেশী হয় ত এক-বুক!
সকলেই বুঝিল, শ্রীমান্ কৃষ্ণচন্দ্র হাঁড়িতে মাথা ঢাকিয়া পলায়ন
করিতেছেন। ছেলেরা জলে নামিয়া পড়িল। তখন কৃষ্ণ দেখিল,
আর রক্ষা নাই; অগত্যা সে মাথার হাঁড়ি ফেলিয়া দিয়া অপর পারে
উঠিল। একজন পোড়ো সুর করিয়া বলিল,—

‘তেলও মাখি নে মছিও খাই নে, ধর্ম্মে দিয়েছি মন,
তুলসীর মালা গলার দিয়ে যাছি ছি বিন্দাবন।’

“মথুরা ছেড়ে ‘বিন্দাবন’ যাচ্ছ, কিন্তু আমাদের হাত ছাড়িয়ে আর যমুনা পার হ’তে হবে না। আগান ঘোষ তোমাকে তলব দিয়েছে; এখন আমার কাছে চল।”

তীরসন্নিহিত নদীজলে বড় বড় শ্রাওলার নীচে অত্যন্ত পাক ছিল; কৃষ্ণ পাক ছাড়াইয়া তীরে উঠিতে না উঠিতে গুরুমহাশয়ের দূতচতুষ্টয় তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। অবশেষে-তাহারা কাদা মাটি মাখিয়া কৃষ্ণকে ‘হাতসাই’ করিয়া,—

“গুরুম’শায়, গুরুম’শায়, তোমার পোড়ো উ-ড়ে যায় !

বাঁশ-বাগানে বিয়েবাড়ী বেগুন পোড়া যায়।”

সম্বন্ধে এই ছড়া আবৃত্তি করিতে করিতে ভিজ্ঞে কাপড়েই গুরুমহাশয়ের কাছে হাজির করিল।

তখন বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছিল। আমাদের পাঠশালার পশ্চাতে ঘাটের রাস্তায় গ্রাম্য যুবতীগণ কন্-কন্ শব্দে মল বাজাইতে বাজাইতে নদীতে গা ধুইতে যাইতেছিল, মধ্যে মধ্যে তাহাদের ললিত মধুর হাস্যধ্বনি পাঠশালা পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িতেছিল; এবং পাঠশালার ছেলেরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সুর করিয়া,—

“চার ধানে রতি হয়, আট রতিতে মাষা,

বারো মাষায় তোলা হয় বলে সর্ব ভাষা।”

স্বর্ণাদি মূল্যবান দ্রব্য ওজনের এই সকল নীতি প্রয়োজনীয় ‘আখ্যা’ মুখস্থ করিতেছিল। কৃষ্ণকে লইয়া হাজির করিবারাত্র এই পয়ারের স্রোতে ভাটা পড়িল; গুরুমহাশয় তৎক্ষণাৎ টুল হইতে উঠিয়া কৃষ্ণের মস্তকের কেশগুচ্ছ ধরিয়া তাহার পিঠে ঘা পনের বেত লাগাইলেন, হুকুম হইল সারা রাত্রি সে পাঠশালায় ‘কয়েদ’ থাকিবে; পর দিন

সকাল তাহাকে ‘আড়া’য়-টাঙ্গাইয়া ‘জলবিছুটী’ লাগান হইবে ! কেত খাইয়াও কৃষ্ণ কাতর হয় নাই, কিন্তু আড়ার টাঙ্গাইয়া জলবিছুটী প্রয়োগের কথায় সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল ; এবং মাটিতে পড়িয়া ধূলার গড়াগড়ি দিতে লাগিল, আর বাঁড়ের মত চোঁচাইতে আরম্ভ করিল । গুরুমহাশয় বেত্র আত্মালন করিয়া বলিলেন, “বেয়াদব ! ফের যদি কাঁদিস, তা হ’লে এখনি জলবিছুটী লাগাবো !” কৃষ্ণ দেখিল, এ বড় কঠিন স্থান, কাঁদিয়া বাঁচিবার উপায় নাই ! তখন সে গুরুমহাশয়ের পা গড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “মশায়, আজ আমাকে মাক্ করুন, আর কখন এমন কাজ হবে না ।” অনেক কাঁদাকাটির পর গুরুমহাশয় বলিলেন, “তবে চোদ্ধ হাত মেপে নাকে খত দে, আর পঁচিশ বার বাঁ হাতে নিজের ডুই কাণ মল ।” বিশেষ লজ্জাজনক কাজ হইলেও সমগ্র ছাত্রমণ্ডলীর সম্মুখে কৃষ্ণ এই আদেশ পালন করিতে বাধ্য হইল ।

সন্ধ্যাবেলা পাঠশালার ছুটি হইল । তখন অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিয়াছে ; পাড়ার বৌঝিরা বস্ত্রাঞ্চলে প্রদীপ ঢাকিয়া এ ঘর হইতে ও ঘরে যাইতেছে ; বাজারের দোকানগুলি হইতে ঘুগপৎ ‘হরিবোল’ ধ্বনি, এবং ধূপের সুগন্ধ উথিত হইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে মিশিয়া যাইতেছে ; আর অদূরে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁশর ধ্বনিত হইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন গগনতল একটি সুপবিত্র বন্দনা-গীতে পূর্ণ করিতেছে ।

সন্ধ্যা অতিবাহিত হইলে এ পথ সে পথ ঘুরিয়া, পুষ্করিণীর বাঁধা-ঘাটে কতক্ষণ বসিয়া, পুষ্করিণীর অপর পারে জঙ্গলের মধ্যে শৃগালের দল সমন্বরে ‘হুয়া হুয়া’ করিয়া ডাকিয়া উঠিলে আমরা বাড়ী ফিরিয়া আসিতাম । আকাশে অসংখ্য তারকাপুঞ্জ হীরকখণ্ডের ত্র্যম দীপ্যমান

হইত, অদূরে তেঁতুত গাছের পাতায় পাতায় জোনাকীর দল মিটমিট করিত, ঝোপে ঝোপে অন্ধকার স্তূপীকৃত হইত; তাহার নীচে বিল্লীর দল তারস্বরে অশ্রান্ত সঙ্গীতালপ করিয়া বিজন পল্লীর নৈশ গান্ধীৰ্য্য শত গুণ বদ্ধিত হইয়া তুলিত। মনে পড়িত, যখন খুব শিশু ছিলাম—তখন ঠাকুমা অন্ধকারের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিতেন, “ঐখানে ‘লেজঝোলা’ বসিয়া আছে, যে ছেলে কাঁদে, তাহাকেই ঝোলার মধ্যে পুরিয়া লইয়া যায়!” শুনিয়া রোদন ও চাপলা দুই-ই অস্তহিত হইয়া বাইত, ভয়ে বৃকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিত; ঠাকুমার হরিনামের কুলির নীচে মাথা রাখিয়া তাঁহার কাপড়ের মধ্যে মুখ লুকাইতাম। এখন বড় হইয়াছি, পাঠশালার যাইতেছি, এখনও কিন্তু ঠাকুমা তেমনই করিয়া আমার ছোট বোনকে কোলের কাছে বসাইয়া কত কি গল্প বলিতেছেন, আকাশের তারা দেখাইয়া কোনটি কোন্ দেবতা তাহারই ব্যাখ্যা করিতেছেন, যেন তিনি আমাদের সকলেরই বালাকালের পালয়িত্রী; মেহ, আদর, যত প্রভৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার; সংসারসুখের কেন্দ্রস্থরূপিনী প্রসন্নময়ী দেবী! বালিকা তাঁহার কোন কথা অবিশ্বাস করিতেছে না, বিনা-প্রতিবাদে সকল কথা শুনিয়া যাইতেছে। তখন শিশুর এই সরল নিবুদ্ধিতা দেখিয়া আমার হাসিবার বয়স হইয়াছিল।

ঠাকুমার এ সকল কথা অসম্ভব ভাবিয়া হাসিতাম বটে, কিন্তু সন্ধ্যার পর যখন মেঝেতে মাড়র বিছাইয়া তাহার উপর বসিয়া ‘দীপ-গাছা’-স্থিত মৃৎপ্রদীপের মৃদু আলোকে শিশুবোধকের ‘সান্দিপনী মুনির পাঠশালা’র ছবিখানি বাহির করিয়া রামকৃষ্ণের গুরুগৃহবাসের বিবরণ পাঠ করিতাম, তখন গুরুপত্নীর গভীর মেহে মাতৃহৃদয়ের এক অপার্থিব সুধাসমুদ্র নয়নসমক্ষে উদ্বেলিত দেখিতে পাইতাম। তাহার পর সেই

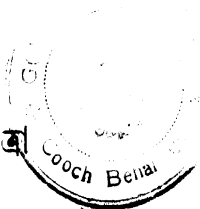
পুত্রহারী জননী রামকৃষ্ণের অনুগ্রহে বহুকাল পরে যমালয় হইতে যখন মৃত পুত্রকে ফিরিয়া পাইলেন, তখন শোককাতর বৃদ্ধ পিতামাতার সেই আনন্দকাহিনী পড়িতে পড়িতে অপূর্ব পুলকে হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিত; এক একবার দ্বাপরের সেই মেহময় গুরুর পাঠশালায় যাইতে ইচ্ছা হইত! এবং আহার শেষ করিয়া যতক্ষণ না ঘুমাইরা পড়িতাম, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই দেবশিশুদ্বয়, তাহাদের সহচরবৃন্দ, সেই মেহ ও আনন্দ, বৃন্দাবনের তৃণগ্রামল বিস্তীর্ণ গোচারণ-ক্ষেত্র, সুপরিচ্ছন্ন আভীর-পল্লীর সমুচ্ছল দৃশ্য, পত্রপুষ্পসজ্জিত পরম শোভায়িত নিভৃত নিকুঞ্জ, পিকবুহরিত জ্যোৎস্নায়াত অমলহৃন্দের শুভ্ররাত্রি ও কলহনা যমুনার স্নানীল জলকল্লোল মনের মধ্যে চিত্রবৎ পরিস্ফুট থাকিত। এ কালের অনেক আনন্দ অপেক্ষা আনন্দবিশ্বাসবিজড়িত সেই লুপ্তপ্রায় শৈশবস্মৃতি অধিকতর প্রীতিকর।

সেইজন্তই সেকালের কথার আলোচনা করিতে বসিয়াছি।



ভগবতী যাত্রা ।

ভগবতী-যাত্রা



এলা বৈশাখ নববর্ষের প্রথম দিনে পল্লীগামের অভিনব সজ্জা দেখিতে পাওয়া যায়। উৎসবের দিনে বালক বালিকা যেমন উজ্জ্বল পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া হাদিমুখে উৎসাহপ্রদীপ্তহৃদয়ে উৎসবানন্দে মত্ত হয়, এই দিনও সেইরূপ গ্রামখানি যেন নবজীবন লাভ করিয়া আঘাত-বেদনাপরিপ্লুত বিষাদস্মৃতিসমাকুল পুরাতন বর্ষের দুঃখদৈন্ত্যলাঞ্চিত জীর্ণ ধ্বনিকা পশ্চাতে রাখিয়া অভিনব বেশে নববর্ষের নূতন উৎসব আরম্ভ করে; ভগবতী-যাত্রা তাহারই উদ্বোধন।

গ্রামা পথাবীথিকা, ক্ষুদ্র বিপণীশ্রেণী, দরিদ্রের কুটীর, ধনীর অট্টালিকা —গ্রামের সর্বত্রই আজ আনন্দকোলাহলেয় হিলোল সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে। কেহ বলিয়া দিতেছে না যে, আজ নববর্ষের প্রথম দিন; কিন্তু সকলের চক্ষেই আজ বসুন্ধরা সুন্দর, আনন্দপূর্ণ; প্রভাতসূর্য্যের কিরণ আজ সুমধুর; বালকবালিকাগণের মুখ প্রফুল্ল, হাস্যবিকশিত। শ্রামশিষ্ট বনরাজি গাঢ় हरिৎ বসন ধারণ করিয়া বর্ণগোরবে নয়নসমক্ষে যেন আজ সৃষ্টির প্রথম দিবসের মনোজ্ঞ শোভা বিস্তার করিতেছে। কে বলিবে, ইহা শুধু দৃষ্টির বিভ্রম কি না!

আজ সকালে দোকান খুলিয়াই দোকানীরা নূতন খাতার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। গোবিন্দপুর বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামে দোকানের সংখ্যা

অল্প নহে; দশ পনেরখানি কাপড়ের দোকান; বিশ পচিশখানি চাউল ডাল, লবণ, তৈল প্রভৃতি জিনিসে পরিপূর্ণ মুদীখানা দোকান; পাঁচ সাতখানি মনোহারী জিনিসের দোকান; বেণে-মশলা ও মিঠাই-মুগার দোকানও অনেক আছে। কাপড়ের দোকানের মধ্যে মাড়োরারীদের কয়েকখান দোকান অল্পদিন বসিয়াছে। আজ তাহাদের নূতন খাতা নহে, তাহারা রামনবমীর দিন নূতন খাতা করিয়াছে; স্তবরাং তাহাদের দোকান ভিন্ন আজ সমগ্র বাজারে নববর্ষের উৎসবের আয়োজন চলিতেছে। দোকানদারেরা প্রত্যাষে স্থান করিয়া আসিয়া শ্রেণীবদ্ধ আমপত্র দোকানের সম্মুখে টাঙ্গাইয়া দিয়াছে; প্রভাতবায়ুতে পাতাগুলি সর-সর করিয়া কাঁপিতেছে। কেহ কেহ দোকানের খুঁটীগুলি দেবদারু ও কামিনীপত্র ঢাকিয়া দিয়াছে; কেহবা ছোট অনতিদীর্ঘ বদলীতরু দোকানের সম্মুখস্থ সোপানের দুই পাশে রোপণ করিয়া আসন্ন উৎসবানন্দের আভাস জ্ঞাপন করিতেছে। কোন কোন সৌখীন দোকানদার শুধু পাতা টাঙ্গাইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহাদের ছোট ছোট ভাই, ভাই-পো বা দোকানের কোন চাকরকে চাটুষীদের নদীতীরস্থ বাগান হইতে ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্ত পাঠাইয়া দিয়াছে; কিন্তু এ সময় অল্প ফুল পাওয়া কঠিন; বাগানে বেড়ার ধারে সারি সারি কাঠমল্লিকার গাছ, তাহাদের নিম্পত্র শাখায় থোকা থোকা ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে; গাছে উঠিয়া সেই ফুল পাড়িয়া তাহারা ঝোড়া পরিপূর্ণ করিতেছে।

ফুলগুলি দোকানে আনা হইল। পীতের ঈষৎ-আভাবুক্ত গুড় ফুলগুলি সূত্রবদ্ধ হইয়া মালাকারে শ্রেণীবদ্ধ আমপত্রের পার্শ্বে ঝুলিতে লাগিল। এই ফুলগুলি স্বকোমল, সত্ত্বপ্রস্তুত, মৃদুগন্ধপূর্ণ; বিধবার স্নানার্থল সান্নাথনের ক্রায় পবিত্র, এবং সর্বপ্রকার বাহ্যব্যজিত।

দোকানগুলি পত্রপুষ্পমালায় সজ্জিত হইলে দোকানদারগণ 'টাত'-থানিতে নিমন্ত্রিত 'খদ্দের'দের আহ্বান করিয়া বসাইবার জন্ত বিছানা পাড়িয়া, তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার আরোজন করিতে লাগিল। এ দিকে দোকানের গোমস্তা টাটের অদূরে মাতুরের উপর বসিয়া, কেহ সিন্দুর গুলিয়া তাহাতে বিশ্বপত্র ডুবাইয়া, এবং ছই একটা নূতন টাকায় চন্দন লেপিয়া, ঐ বিশ্বপত্র ও টাকা দিয়া নূতন খাতার প্রথম পৃষ্ঠার ছাপ দিতেছে। কেহ মোটা থাকের কলমে খাতায় 'শ্রীজগা' ফাঁদিয়া তাহার উপর ভাজা বালি ছিটাইয়া প্রাচীন প্রণালীতে কালি 'ব্লট' করিতেছে; আবার কেহ কেহ গত বৎসরের খাতা হইতে দেন্দার-দিগের নামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া কোন কর্মচারীর হস্তে তাহা প্রদান পূর্বক তাহাকে গ্রামের মধ্যে নিমন্ত্রণ করিতে পাঠাইতেছে। ময়রায়া বিভিন্ন দোকানদারের দোকানে নানাপ্রকার সন্দেশের বায়না পাইয়া সকাল হইতেই ভিগান আরম্ভ করিয়াছে। উনান জলিতেছে, তাহার উপর বৃহৎ কড়ায়ে রসগোল্লার পাক চড়িয়াছে; পাশে বসিয়া এক জন ভিগানদার তাড়ু দিয়া রস নাড়িতেছে। অদূরে বসিয়া একজন চাটাইয়ের উপর বাতাসা ঢালিতেছে। কাপড় দিয়া ঢাকা সঙ্কীর্ণ কাঠের 'থাকে'র উপর লোহার চাক্তি বসান, তাহার উপর সারি সারি থালা সাজান; কোন থালে চিনি বা গুড়ের ছাঁচ—বৈচিত্র্যপূর্ণ, হাতীর, রথের, ষোড়ার, বা পাখীর ছবি; কোন থালে চিনির কদম্বা; ছানাবর্জিত চিনির সন্দেশ,—সাধারণ কথায় 'চিনির ঢেলা'; জিলিপি, খাজা গজা, মণ্ডা মিঠাই প্রভৃতি। একটা 'চেঙ্গারী'তে চিঁড়া; নিকটেই একটা হাঁড়ায় মুড়কী, হাঁড়ায় মুখ কাপড় দিয়া ঢাকা; তথাপি বিন্দুপরিমাণ রসলাভের সম্ভাবনা না থাকিলেও বাছির অভাব নাই,

মক্ষিকাবৃন্দের ভন্‌ভন্‌নিরও অস্ত নাই! জমীদারবাড়ীর মোসাহেবের দলের মত ভন্‌ ভন্‌ করিয়া মাছি উড়িতেছে। সম্মুখবর্তী ইষ্টকবদ্ধ রাজপথ দিয়া একখানি গরুর গাড়ী হন্‌-হন্‌ করিয়া সবেগে চলিতেছে; গরু ছুটিতেছে, তথাপি গাড়োয়ান এক পাশে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া একটা বলদের লেজ ধরিয়া সজোরে মোচড়াইতেছে! গরু প্রাণপণে ছুটিতেছে; লাল ধূলা উড়িয়া সন্দেশগুলি রঞ্জিত করিতেছে। একটা কুকুর অদূরে বসিয়া জিহ্বা বাহির করিয়া সন্দেশের দিকে চাহিয়া আছে, তাহার লোলজিহ্বায় জল ঝরিতেছে! দোকানের পাশে অস্থগাছের ডালে বসিয়া একটা কাক এক চক্ষু মুদিয়া দোকানের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিতেছে, মধ্যে মধ্যে কর্কশ স্বরে ‘কা কা’ করিয়া ডাকিতেছে, ডালের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সরিয়া সরিয়া বসিতেছে, আবার ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিতেছে; ভাবে বোধ হয় তাহার মতলবটা এই যে, একটা সন্দেশ হইলে যাহার পেট ভরিয়া যায়, তাহার সম্মুখে খালাভরা সন্দেশ রাখিয়া লোভ দেখান এবং একটাও চুরী করিবার অবসর না দেওয়া কি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা! সম্ভবতঃ কাকটা জন্মান্তরে একজন ‘সোসিয়ালিষ্ট’ ছিল; ঠিক বলিতে পারিলাম না, বিষ্ণুশর্মা হইলে পারিতেন বোধ হয়।

বেলা দশটা বাজিতে না বাজিতে প্রত্যেক গৃহস্থবাড়ীতে আজ ভগবতী-শ্রাদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। গোয়ালঘরে ‘ভগবতী-পূজা’ হইবে, তাই গোয়াল হইতে আজ সকাল সকাল গরু বাহির করিয়া গৃহিলীরা সময়ে সেই ঘরখানি ‘নিকাইয়া’ রাখিয়াছেন। নান করিয়া আসিয়া তাহার পূজার যোগাড় করিতে লাগিলেন। ছোট একখানা রেকাবীতে চাট্টি ভিজে আতপ চাউল, একটা মণ্ডা ও

কয়েকখানি বাতাসা দিয়া একখানি নৈবেদ্য সাজান হইল। একটা সাজিতে গোটাকত অতসী, বেলা, সাদা বা লাল করবীর ফুল ও গোটাকত তুলসীপত্র সংগ্রহ করা ছিল; চন্দনপাটায় একটু চন্দন বসিয়া ধূনচিতে আগুণ তুলিয়া তাহাতে খানিক ধূপ দিয়া, রমণীগণ পুরোহিতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অন্নকণ পরে গারে নামাধলী জড়াইয়া, একখানি ভিড়া গামছা ‘তো’ করিয়া নাথায় দিয়া, ছত্রহস্তে পুরোহিত শিরোমণি-ঠাকুর যজ্ঞমানবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পদপ্রক্ষালন করিতে লাগিলেন; পূজার উপকরণগুলি গোয়ালঘরে লইয়া যাওয়া হইল। একখানি ছেঁড়া পুরাতন কুশাসনে বসিয়া অশ্রুটস্বরে গোটা-তাই মন পড়িয়া পুরোহিত ঠাকুর পাঁচ মিনিটের মধ্যে পূজা শেষ করিলেন, এবং অল্প যজ্ঞমানবাড়ী পূজা করিতে চলিলেন। বর্ষায়সী রমণীগণ কিংবা বাড়ীর ছেলেমেয়েরা নৈবেদ্য ও কিঞ্চিৎ দক্ষিণা পুরোহিতবাড়ী দিয়া আসিল।

পুরোহিত বিদায় লইতে না লইতে দৈবজ্ঞ শ্রামাচরণ আচার্য্য মহাশয় দর্শন দিলেন। তিনি আজ অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ী বাড়ী গুরিয়া সংবৎসরের শুভাশুভ শুনাইয়া বেড়াইতেছেন। পুরোহিত ঠাকুরের মত তাঁহারও আজ কিছুমাত্র অবসর নাই। সকল গৃহেই তাঁহার অব্যবহিত গতি; কিন্তু যেখানে তাঁহার কিছু প্রাপ্তির আশা নাই, সে দিকে তাঁহার টিকি দেখা যায় না। তিনি কাহারও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবারাত্র, কর্ত্তী, কত্যা, পুত্রবধূ, এমন কি বালকবালিকাগণ পর্য্যন্ত বৎসরের ফলাফল শুনিবার জন্য আসিয়া তাঁহার চতুর্দিকে সমবেত হইল। তিনি একখানি টুলের উপর বসিয়া বহুপুরাতন সূত্রবদ্ধ শ্রীহীন চশমাজোড়াটি চোখে দিয়া পুঁথি খুলিলেন, এবং গম্ভীর মুখে বিজ্ঞান জাহাজ

নামাইয়া সুর করিয়া সংস্কৃতশ্লোক পড়িয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, ‘অর্থাৎ এ-বৎসর বারাম-স্য়ারাম খুব বেশী হবে, ধাতুর অবস্থা ভাল নয়, রুটি অল্প’—ইত্যাদি।—তাহার এই সকল অন্তঃসূচক দৈববাণী শুনিয়া গ্রহিণীগণ অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন ; অবশেষে ‘আচাষি ঠাকুর’ তাঁহাদের মনস্তৃষ্টির জন্ত ও কিঞ্চিৎ লাভের আশায় যখন বলিলেন, “তা তোমাদের গ্রহ এবার বেশ প্রসন্ন, শত্রু-স্থানে শনি আছে, সংবৎসর বেশ ভালই যাবে ; তবে অসুখ-বিসুখ নিবারণের জন্ত মধ্যে মধ্যে এক-আখটা শাস্তিস্বস্ত্যারনের দরকার হবে, কোন ভয় নেই।”—তখন তাঁহারা প্রফুল্লমনে যথাসাধ্য দক্ষিণা দিয়া দৈবজ্ঞকে বিদায় করিলেন।

এ সময় গ্রামে অত্যন্ত জলাভাব। গ্রামের পুষ্করিণীটিতে বার মাস জল থাকিত ; দারুণ রৌদ্রে এবার তাহা শুকাইয়া গিয়াছে। পুষ্করিণীগর্ভ শুকাইয়া সেখানকার মাটি পর্য্যন্ত চোঁচির হইয়া গিয়াছে ! ঠিক মধ্যস্থলে পাকের উপর কয়েক অঙ্গুলিমাত্র জল আছে, কাহারও তাহা ব্যবহার করিবার যো নাই; গোয়াল কৈবর্ত প্রভৃতি গৃহস্থের ছেলেরা সেই জলটুকুর ভিতর কাদা দিয়া স্থানে স্থানে আইল ঝাঁধিয়াছে, এবং দুই তিন দল ছেলে সেই আইলের বিভিন্ন দিকে ‘গামছা ছাঁকা’ দিয়া মাছ ধরিতেছে ; মাছ প্রায়ই উঠিতেছে না, কোনবার একটা ছোট ‘চাং’ কি ‘বেলে’ মাছ উঠিতেছে ; তাহা পাইয়াই তাহারা আনন্দে লাকালাফি করিতেছে, পরস্পরের গায়ে কাদা ছিটাইয়া দিতেছে, উচ্চহাস্তে স্তব্ধ মধ্যাহ্নের সেই বৃক্ষচ্ছায়াপরিবেষ্টিত শুষ্ক জলাশয়টির চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে ; দৈবাৎ দুই কয়েকটা পিপাসাক্লান্ত কপোত আকণ্ঠ জলপানের আশায় বহু দূর হইতে উড়িয়া আসিয়া ঘণ্টাকত বন্ধে কম্পিত পক্ষে পুষ্করিণীতীরে বসি বসি

করিতেছিল, ছেলের উচ্চহাস্তে ভয় পাইয়া তাহারা আবার তখনই উড়িয়া দূরে পলাইল।

নদী গ্রামের একপ্রান্তে,—অনেক দূরে। মসজিদের কাছে কাঁটার বেড়া দিয়া ঘেরা ছোটো কাঁঠালগাছের তলার ‘ডিক্টো বোর্ড’ ইঁদারা প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছে; মুসলমান রমণীগণ সেখানে ঘটি ও কলসী লইয়া জল তুলিতেছে। কেহ পরে আসিয়া জল তুলিতেছে, কেহ আগে আসিয়া ও দাঁড়াইয়া আছে। এক চতুরা ‘বিবি’ পরে আসিয়া তাড়াতাড়ি ইঁদারায় ঘটি নামাইয়া দিয়াছে; তাই যে আগে আসিয়াছিল, সেই কটুভাবিণী রুকা তাহার সঙ্গে তুমুল কোলাহল পূর্বক ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিল। যুবতী শেখের বি বলিল, “ইয়া আল্লা! তুমি কি এক লহমা সবুর করে পার না?” রুকার দৈর্ঘ্যচ্যুতি ঘটিল; সে দস্তবিরল মুখবির হইতে অসংযত বাক্যের সহিত গুরু পরিনামে নিষ্ঠাবন বর্ণন করিতে লাগিল। এইরূপে প্রথম আক্রমণটা মুখেমুখেই চলিল, অবশেষে ক্রোধের উদ্বেজনা অধিক হইলে, দড়ী কলসী ও ঘটি মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া উভয়ে হাত মুখের নানারকম কুৎসিত ভঙ্গী করিয়া কণ্ঠস্বর সপ্তরে চড়াইয়া পল্লী বিকম্পিত করিয়া তুলিল। পাড়ার দুই পাঁচটা ছুট ছেলে এই ঝগড়া শুনিয়া হর্ষভরে সেখানে ছুটিয়া আসিল, এবং করতালি দিয়া ‘নারদ’ ‘নারদ’ বলিয়া নাচিতে লাগিল। ইহাদের সেই সহর্ষ আবাহনে কলহের বাস্তবদেবতা তাঁহার প্রিয়তম বাহন ঢেঁকির উপর আরোহণ পূর্বক এই রৌদ্রোদ্ভূত মধ্যাহ্নে সহসা শৃংখলিত আসিয়া দর্শন দিয়াছিলেন কি না, তাহা নয়লোকের নেত্রগোচর হয় নাই; কিন্তু মুসলমান বীরাজনাগণের এই কোলাহল ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া উঠিল, এবং পাড়ার অনেক স্ত্রীলোকই উভয়পক্ষে

যোগদান করিবার জন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইল। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-রমণীগণ এই কোলাহলে ওদাসীরা প্রকাশ পূর্বক কেবল “আজ বছরকার দিন, শেখের বেটীরা এত ঝগড়াও কর্তে জানে।” এই বিজ্ঞোচিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া নদীতে স্নান করিতে গেল। নদীতে এখন এক কোমরের বেশী জল নাই ; কিন্তু সেই জলটুকুই এই বৃহৎ গ্রামের সহস্র সহস্র অধিবাসীর জীবনস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। নদীটী শৈবালাদি স্তলজ উদ্ভিজ্জে পরিপূর্ণ, কেবল স্নানের ঘাটটি পরিষ্কার। তীরে বালুকারাশি ভেদ করিয়া দুই একটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝরণা হইতে কালো বালির সঙ্গে ঝির-ঝির করিয়া অতি ঠাণ্ডা জল উঠিতেছে। নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া গ্রামের প্রান্ত দিয়া চলিয়া গিয়াছে ; অনেক দূর হইতে তাহার তীরবর্তী বাঁশঝাড়, বটগাছ ও ‘বাঁশ-জালের’ বাঁশের উচ্চ অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে।

কলসগুলি ভাল করিয়া মাজিয়া রমণীগণ স্নানান্তে কলস ভরিয়া জল লইয়া যাইতেছে। কাহারও কলসীর মুখে পিতলের ছোট একটা তেলমাথা বাটী, তাহার উপর একটা কাঁচা আম। কেহ বাগানের ভিতর দিয়া আসিবার সময় দুই পাঁচটা আম গাছতলায় কুড়াইয়া পাইয়াছে, তাহা আঁচলে বাধিয়া লইয়া চলিয়াছে। গামছাখানি মস্তকে দিয়া কলসীটি কক্ষে লইয়া তাহারা অতি কষ্টে রোদ্রোদ্ভূত প্লিবজ্জিত বিজন গ্রাম্যপথ দিয়া চলিতেছে ; কলসে জল ছল্ ছল্ করিয়া বাজিতেছে, জলসিক্ত পদাঙ্ক দেখিতে দেখিতে ষাটীতে শুকাইয়া যাইতেছে ; পদতলে তাপ লাগিতেছে বলিয়া রমণীগণ দুই একবার মুখ বিকৃত করিতেছে। ক্রমে তাহারা ধীরে ধীরে ঘণ্টীতলায় আসিয়া তেলমাথা বাটীতে করিয়া অন্ন অন্ন জল তিনবার অস্থখমূলে ঢালিয়া

দিতেছে এবং তাহার শুঁড়িতে মাথা ছোঁয়াইয়া ভক্তিতরে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিতেছে।

বিধবা গৃহিণীগণ আত্মিকপূজা শেষ করিয়া, পূর্বদিন কলসী-উৎসর্গের সময় তুলসীগাছে যে ‘ঝরা’ টাঙ্গান হইয়াছে, তাহাতে জল ঢালিয়া তুলসীমূলে প্রণামপূর্বক ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের লইয়া গোয়ালঘরে ‘দুধ-উৎলাইতে’ চলিলেন। আজ এ অঞ্চলের প্রত্যেক হিন্দুর বাড়ীতেই গোয়ালঘরে ‘দুধ উৎলাইবার’ একটা নিয়ম আছে। গোশালার একটা ছোট অস্থায়ী উনান খুঁড়িয়া, গৃহকর্ত্রী তাহার উপর একটা নুতন মালসাতে কিছু দুধ রাখিয়া তাহাতে এক মুষ্টি আতপ চাউল এবং কয়েকখানি শুড়ে বাতাসা ফেলিয়া বাশের ‘চোঁচালি’ বা ‘পাকাটী’ দিয়া জাল দিতে লাগিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দুগ্ধ ও চাউল পরিপক হইয়া ‘পায়েসে’ রূপান্তরিত হইল। ইহাকেই ‘দুধ উৎলানো’ বলে। পায়েস প্রস্তুত হইলে, একখানি ‘আখট’ কলাপাতের অগ্রভাগে তাহার কিয়দংশ ঢালিয়া উনানের কাছে পুঁতিয়া, অবশিষ্ট পায়েস লইয়া গৃহিণী গৃহান্তরে প্রস্থান করিলেন। বাড়ীর ছেলে মেয়েরা তাহা ভাগ করিয়া মহানন্দে খাইতে লাগিল। আজিকার এই শুভদিনের সহিত এই ‘দুধ উৎলানো’-পায়েসের যে একটি মধুময় সন্ধাদ আছে, তাহাই নৈপুণ্যহীন নিতান্তপরিমিত পায়েসের স্বাদমাধুর্য্য বহুগুণ বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছিল।

আজ ভগবতী-যাত্রা বলিয়া গৃহস্থের বাড়ীর রাখালেরা সিন্দুর ও বাশের ‘চোঙ্গা’ ভরিয়া তেল লইয়া তাহা গরুর শিংএ মাথাইয়া, গরু লইয়া নদীতে স্নান করিতে গেল। গোয়ালার ছেলেরা গরুর পাল তাড়াইয়া বাগানের ধারে আনিয়া, ছায়াচ্ছন্ন শীতল নিভৃত আমবাগানের

মধ্যে একটা পরিষ্কার বায়ুগায় কেহ আঁচল পাতিয়া হাতের উপর রাখা রাখিয়া ‘কাত’ হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে,—পাঁচনখানা পাশে পড়িয়া আছে, আর সে মধ্যাহ্নরোদ্ৰ ও জীবনসংগ্রামের ঘোর কোলাহলের প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রকাশপূর্ব্বক স্বরচিত রাগিণীতে মেঠোস্থরে বাগান প্রতিধ্বনিত করিয়া গায়িতেছে,—

“ওরে রামশশী, যদি কাঁঠাল খাবি

বিচিগুলো রাখিস্ যতন ক’রে।”

আর একজন রাখাল তাহার পাশে বসিয়া মোটা কামারে’ ছুরী দিয়া একটা কাঁচা আম ছাড়াইতেছে, বন্ধকে গান করিতে দেখিয়া তাহারও সঙ্গীতপিপাসা প্রবল হইয়া উঠিল! আম কাটিতে কাটিতে সে-ও গলা ছাড়িয়া ধরিল,—

“সুশৃষ্ট ফল খাও রে কৃষ্ণ, আমি এনেছি-ই-ই-ই- ;

ও—এ ফল শৃষ্ট লাগ্বে বলে’ এ-এ-এ—”

হঠাৎ তাহার একটা গুরু দলদ্রষ্ট হইয়া নীলের ক্ষেতের দিকে চলিয়া গেল, আর অমনি সে গান অর্দ্ধপথেই বন্ধ করিয়া, আম ও ছুরী ফেলিয়া, সেই গাভীর পশ্চাদ্ধাবন করিল। এখন ক্ষেতে নীল নাই, তবু কি জানি, সেখানে গুরু দেখিলে পাছে ‘তাগাদগির’র দল গোলযোগ করে, এই ভয়ে সে “ফের ফের, শালার গরু” বলিয়া তাহাকে ফিরাইবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

বাগানের বাহিরে রোদ্ৰ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। ধূসর আকাশ হইতে সূর্য্যদেব জ্বালাময় কিরণ বর্ষণ করিতেছেন। এলোমেলো বাতাসে পথের ধূলা ও গাছের শুষ্কপত্র উড়িয়া যাইতেছে। রোদ্ৰকাতর উত্তপ্ত প্রকৃতির নিদ্রাধ-ক্লান্তিতে কিছুমাত্র ক্রক্ষেপ না করিয়া, একটা কোকিল

এই নিদাঘ-মধ্যাহ্নেও আশ্রয়কুঞ্জের ঘনপল্লবে লুকাইয়া ‘কুহ’ ‘কুহ’ করিয়া কুহরিয়া উঠিতেছে। গ্রাম্য বালুকেরা বিশ্রামস্থল পরিত্যাগ পূর্বক ছুরী ও নুন লইয়া আমবাগানে প্রবেশ করিয়াছে। কেহ কণ্টকময় বঁইচি-বনে ঘুরিয়া সুপক্ক কালো বঁইচি-ফলের গুচ্ছ খুঁজিতে খুঁজিতে কুহস্বরের প্রতিধ্বনি করিতেছে! কোকিল বুঝি তাহাতে অবমানিত হইয়া কণ্ঠস্বর আরও উচ্চ করিয়া পঞ্চম হইতে সপ্তম তুলিতেছে, শেষে ক্লান্ত হইয়া নীরব হইতেছে। কেহ কোন রাখালের পাচনখানা চাহিয়া লইয়া গাছের উচ্চ শাখা হইতে কাঁচা আম পাড়িতেছে; এবং পাচনখানি দৈবাৎ আমশাখায় বাধিয়া গেলে, তাহা পাড়িবার জন্ত চিতা ও লাল-ভেরেণ্ডার ডাল ভাসিয়া ক্রমাগত ‘এড়ে’ ছুড়িতেছে। বাগানের নিবিড়তর অংশে একটা শৃগাল ‘উবু’ হইয়া পড়িয়া ধুকিতেছে, এবং কোন দিকে সামান্য একটু শব্দ হইলেই মাথা তুলিয়া উত্তকর্ণে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া দেখিতেছে।

বাগানের সমুখ দিয়া রামনগরের প্রশস্ত ‘কাঁচা’ রাস্তা সুদীর্ঘ ভূজঙ্গের তায় বিসর্পিতগতিতে চলিয়া গিয়াছে; দুই একজন গলদ্বন্দ্ব পথিক ছাতামুড়ি দিয়া অতি কষ্টে সেই পথে চলিতেছে।

গ্রাম হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে—এই পথের ধারে “জলছত্র তলা”; গ্রাম্য জমিদার গাঙ্গুলীরা এই দারুণ রোদ্রে পথিকের তৃষ্ণানিবারণের জন্ত চৈত্র্যসংক্রান্তির দিন হইতে ‘জলছত্র’ দিয়াছেন। সমস্ত বৈশাখ মাসটা তৃষ্ণার্ত পথিককে জলদান করা হইবে। ‘পাউণ্ডে’র কাছে একটা প্রকাণ্ড ঝাঁকড়া বট গাছের নীচে প্রতিবৎসর জলছত্র দেওয়া হয়, সেই গাছতলাকে সাধারণে ‘জলছত্র তলা’ বলে। এটি গ্রামের পূর্ব দিক। গ্রামের উত্তর ও দক্ষিণ দু’দিকে অনেকদিন আগে আরও দুই জলছত্র ছিল; বাড়ুঁঘোদের

বড় কর্তার স্থাপিত সেই জলছত্র ছুটি তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া গিয়াছে ; স্বর্গীয় পিতার কণ্ঠি লোপ করিয়া তাঁহার যোগ্যপুত্র ‘সাহেবদাস’ বাবু (এটি তাঁহার অন্তপ্রাশনের নাম নয়, গ্রামের সাধারণের প্রদত্ত নাম) নতুন রকম ‘জলছত্র’-স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন ; কিন্তু সে গ্রীষ্মকালে নহে, শীতকালে ! বড় দিনের সময় তিনি এ তল্লাটের সাহেবদের কুঠীতে কুঠীতে ‘বিলাতি পানী’ ও ‘সরাব’ সরবরাহ করিয়া পৈতৃক অনুষ্ঠান প্রকারান্তরে বজায় রাখিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার পারত্রিক ফল কিছু লাভ হোক না হোক, ঐহিক ফল লাভ হইতেছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় ; তিনি ‘অনাহারী হাকিম’ হইয়াছেন ! তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই সাহেবেরা ‘হাল্লো মিঃ ব্যানার্জি, হাড়ুডু’ বলিয়া সাদরে তাঁহার কর্মর্দন করেন, স্তবরাং তাঁহার সশরীরে মোক্ষলাভ হয় ; এতদ্বিন্ন শীঘ্রই তাঁহার ‘রায় বাহাদুর’ খেতাব লাভেরও সম্ভাবনা আছে।

যাহা হউক, বাড়ুঘো মহাশয়ের মৃত্যুর পর গ্রামে এখন এই একটিমাত্র জলছত্রই বর্তমান আছে। যে বিশাল বটগাছের ছায়ায় এই জলছত্র সংস্থাপিত, তাহা হইতে অগণ্য ‘বরা’ নামিয়া গাছটিকে আরও দৃঢ়মূল করিয়াছে। দুই তিন বিঘা জমী লইয়া এই গাছটি বিস্তৃত ; এত বড় গাছ এ অঞ্চলে আর নাই। ইহার কতকগুলি ‘বরা’ খুব মোটা, যেন এক একটা স্বতন্ত্র গাছের গুঁড়ি ! কতকগুলি সরু, তাহাদের অগ্রভাগ ঠিক হাতীর লেজের মত, এখনও মৃত্তিকা স্পর্শ করে নাই, মাটি হইতে তিন চারি হাত উচ্চে আছে ; রাখালেরা সেই সকল বরা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া দুই একবার ‘ঝুল খাইয়া’ ঝাইতেছে। ইঁট-বোঝাই সারি সারি গরুর গাড়ী ‘কাঁ’ ‘কোঁ’ শব্দ করিয়া ধূলি উড়াইতে উড়াইতে মন্ডর গতিতে গ্রামের দিকে চলিয়াছে। এই গাছতলার আসিয়া গাড়োয়ানেরা

একবার গাড়ী থামাইয়া, খোঁয়াড়-রন্ধকের কাছে তাহার কলিকাটি চাহিয়া লইয়া তাহাতে এক একটা ‘দম কসিতেছে’, এবং নাক মুখ দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে আবার গাড়ীতে উঠিয়া গরু হাঁ শাইতেছে।

‘পাউণ্ড’ বা খোঁয়াড়টির চারি দিক বাশের বেড়া দিয়া উচু করিয়া ঘেরা ; সুতরাং গরু কি ঘোড়া তাহার ভিতর হইতে লাফাইয়া পলাইতে পারে না। এটি অনেক কালের পাউণ্ড,—মধ্যে যাহাতে ছায়া হয়, এ জন্ত চারি দিকে নিম্ন, পেঁউ, শিশু গাছের সারি। গাছগুলি বড় হইয়া উঠিয়াছে। পাউণ্ডের ভিতরটি পরিষ্কৃত, তৃণাদিবর্জিত ; সেখানে গোটাকত অস্থিচর্মসার গরু, গোটা চার পাঁচ ছাগল, এবং একটা ‘পুকুরে’ ঘোড়া আবদ্ধ আছে। গরুগুলো ছায়ায় শুইয়া ‘জাওর কাটিতেছে’ ; কি খাইয়া তাহাদের রোমস্থানে প্রবৃত্তি হইয়াছে, তাহা তাহারাই জানে ! খোঁয়াড়রন্ধকেরা অবরুদ্ধ গরুর মালিকের নিকট হইতে প্রত্যেক গরুর খোরাকী বাবদ প্রত্যহ চারি পয়সা হিসাবে অতিরিক্ত খরচা আদায় করে ; কিন্তু তাহারা এই সকল গরুকে কোন দিন যে আধ পয়সারও ‘দানাপানী’ দিয়া থাকে, এ কথা কখন কেহ বলিতে পারে না।

নীলমণি পরামাণিক এবার জেদাজেদী করিয়া অনেক টাকায় এই পাউণ্ড ‘ডাকিয়া’ লইয়াছে। পাউণ্ডের ‘কাঁচা’ পয়সা, মুহুরী বা কোন চাকরের হাতে ভার দিয়া বিশ্বাস করা যায় না, তাহারা সুবিধা পাইলেই চুরি করে ; তাই নীলমণি দিব্যাত্মিণ অধিকাংশ সময় পাউণ্ডেই থাকে, কেবল আহারের সময় বাড়ী গিয়া ছুটি খাইয়া আসে। সে তাহার ক্ষুদ্র কুটারে এক কলসী জল, একটা ঘটা, হাঁকো কল্কে, টিকে তামাক প্রভৃতি সরঞ্জামসহ একটা চক্ষুর্কির ‘খঞ্জে’ রাখিয়া দিয়াছে। ম্যাচ-বাক্সে পয়সা বেশী খরচ হয় বলিয়া তাহা সে রাখে না। একদিন পরাণে গোয়াল

তাহাকে ‘চক্ৰকি ঠুকিতে’ দেখিয়া বলিয়াছিল, “কি গো পরামাণিক দাদা! চক্ৰকি ঠুকে এ রকম হয়রাণ হওয়ার চেয়ে কি একটা ‘বাণ্ডল’ (ম্যাচবাক্স) রাখা ভাল নয়? দামই বা কত? এক পয়সা হলেই একমাস চলে যায়।” কথাটা শুনিয়া পরামাণিক-পুল হাসিয়া বলিল, “দূর বেটা ভেমে গোয়াল! সাথে কি আর লোকে বলে যে, ষাট বছরের আগে ভোরা সাবালক হস্ নে? আধ পয়সা দামের একখান চক্ৰকির পাতর, আর দু’ পয়সার ইস্পাত কিনে একটা ‘ঠুকনি’ গড়িয়ে রাখলে পাঁচটা বছর আর ভাবতে হয় না। এই পাঁচ বছর দিয়েশলাই কিনে চালাতে কতগুলো পয়সা খরচ হয় বল দেখি! কোম্পানী বাহাদুর দিয়েশলায়ের বাক্স, সরাব, আর কেরাসিনের তেল এনেই ত দেশের পয়সাটা লুটে নিলে; তা তাদেরই বা দোষ কি, আমাদের পরকাল যে আমরা নিজেই খাচ্ছি। লেখাপড়া শিখে ভদ্রের লোকেরা আরও বেশী ক’রে পরের গোলাম হচ্ছে! আমাদের বাপ দাদারা যেমন করে দিন কাটিয়েছে, আমরা-দেরও তেমনি ক’রে দিন চালানতে ক্ষেতিটে কি?”—ক্ষতি কি, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া গোপপুল লজ্জায় নিরুত্তর রহিল।

একাকী বসিয়া সময় কাটান বড় কঠিন বলিয়া নীলমণি তাহার কুটীরে একখানি ‘কৃষ্ণিবাসী রামায়ণ’ আনিয়া রাখিয়াছিল। এখানি তাহার নির্জনের সঙ্গী। গাঙ্গুলীদের চাকর ফটিক ঘোষ ‘জলছত্রতলা’য় তাহার নবনির্মিত ক্ষুদ্র ‘টোঙ’খানিতে বসিয়া পিপাসার্ত পথিকগণকে বুটভিজে, গুড়েবাতাসা ও জল বিতরণ করিতেছে, আর নীলমণি তাহার নিকটে গাছের ছায়ায় একখানি মাদুরে বসিয়া মাথা নীচু করিয়া সৰ্ব্বশরীর হুলাইয়া সেই বহু পুরাতন বিবর্ণ ছিন্নপ্রায় পুঁথিখানি গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেছে। রাবণ কর্তৃক ‘সীতাহরণে’ রামের

খেদ' যে অংশে আছে, তাহাই সে পাঠ করিতেছে ; একঘেয়ে শূরে প্রত্যেক শব্দ বানান করিয়া ছত্রের পর ছত্র পড়িয়া যাইতেছে । রাখাল কৃষাণেরা দূর মাঠ হইতে গৃহপ্রত্যাগমনকালে এখানে এক ছিলিম তামাক খাইতে আসিয়া এই অপূর্ব পবিত্র গাথা শুনিতে শুনিতে আর উঠিতে পারে নাই ; পথিকেরা শততালিবিশিষ্ট ছিন্ন চটি জোড়াটি সম্মুখে রাখিয়া, অর্ধ ছাতাটা কোলের উপর ফেলিয়া, এক-পা ধূলি লইয়াই বসিয়া গিয়াছে, এবং একাগ্রচিত্তে এই অমৃতময়ী কাহিনী শ্রবণ করিতেছে । কতবার তহারা এই অমর গাথা শুনিয়াছে, কিছুতেই ইহা তাহাদিগের নিকট পুরাতন হয় নাই ! বিশেষতঃ, আজ এই নিদাঘের অপরাহ্নে, প্রান্তরের প্রান্তবর্তী বিবিধবিহঙ্গকৃজিত বৃক্ষচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন এই প্রচ্ছন্ন কুটীর-দ্বারে, সন্ততার নামগন্ধবিহীন এই শাস্ত স্নিগ্ধ পল্লীজীবনের কেন্দ্রস্থলে নরদেব রামচন্দ্রের সেই বেদনাপ্লুত করুণকাহিনী শ্রবণ করিয়া, প্রাচীন যুগের মধুর স্মৃতি, সেই শাস্তি, সেই তৃপ্তি, সঙ্গে সঙ্গে গভীর বিষাদ ও হঃসহ বিরহের একটি মনঃভেদী চিত্র তাহাদের নয়নসমক্ষে সজীব হইয়া উঠিতেছিল । তাহার পর যখন তাহারা শুনিতে পাইল রামচন্দ্র সীতাদেবীর অদর্শনে হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছেন, কবি সেই কথা সুকোমল কবিতায় সরলভাবে বলিতেছেন,—

“চাহিয়া বেড়ান রাম গোদাবরীর তীরে ।

সীতা সীতা বলিয়া ডাকেন উচ্চৈঃস্বরে ॥

কাদিয়া বিকল রাম ফুলিল তই অঁাখি ।

রামের ক্রন্দনে কঁাদে বনের যত পাখী ॥

সীতা সীতা বলি রাম পড়ে ভূমিতলে ।

তাই তই বলিয়া লক্ষণ করে কোলে ॥

তুই হাত তুলিয়া রাম সীতা বলি ডাকি ।

দেখা দিয়ে রাখ প্রাণ সীতা চন্দ্রমুখী ॥”

তখন স্মধুর সঙ্করণ সমবেদনায় তাহাদের বক্ষঃপঙ্কজ হইতে আকুল দীর্ঘশ্বাস ও চক্ষুঃপ্রান্তে বিন্দু বিন্দু অশ্রু ফুটিয়া উঠিল। লক্ষ্যের উদার ভ্রাতৃপ্রেম, রাজপুত্রের কঠোর বনবাসের ক্লেশ ও দুঃসহ বিরহবিষাদব্যাকুলতাকে তাহারা নিতান্ত অভ্যস্তভাবে গ্রহণ করিয়া তাহা তাহাদের স্ব স্ব ব্যক্তিগত দুঃখ দুর্গতি বলিয়াই অনুভব করিতে লাগিল। যিনি ভগবানের অবতার, রঘুকুলপঙ্কজ রবি, মনুষ্যশ্রেষ্ঠ—তাহার এত বিপদ, এমন কষ্ট, ভাবিয়া তাহারা নিজের দুঃখ দৈন্ত্য ও দরিদ্র-জীবনের শত শত অভাবের আলা ভুলিয়া গেল। দুঃখী তাপী ও হতাশের ক্ষুব্ধ হৃদয়ের তীব্র আলা প্রশমনের উপযোগী অমৃতস্বরূপ এমন শান্তিময় মহাসঙ্গীত পৃথিবীর আর কোন্ ভাষায় গীত হইয়াছে? আদি মহাকবির অমরগাথা ভিন্ন আর কোন্ সঙ্গীত করুণরসে মানব-হৃদয়কে এমনভাবে বিগলিত করিতে পারে?

দেখিতে দেখিতে সূর্য্য অস্ত গেল। বট পাকুড়ের দীর্ঘ ছায়া দীর্ঘতর হইয়া ক্রমে অরণ্যের প্রান্তে মিলাইয়া গেল। পথের ধলায় আকাশের অনেক দূর পর্য্যন্ত ধূসরিত হইল; গরুর পালের সঙ্গে রাখালগণ গ্রামাভিমুখে ফিরিয়া চলিল। দূরবর্তী নদীতীর হইতে গাজনের সন্ন্যাসীদের ঢঙ্কাধ্বনি কাণে আসিয়া বাজিতে লাগিল। চড়কপুঞ্জ শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু গ্রামস্থ শ্রমজীবিবর্গের ‘বাণ ফুঁড়িয়া’ নাচিয়া বেড়াইবার আগ্রহ প্রশমিত হয় নাই; তাই আজও আবার তাহারা বাণ ফুঁড়িয়া, বিচিত্র বর্ণের শাড়ী নালকৌচা আঁটরা পরিয়া, বিবিধ অলঙ্কারে ও পুষ্পমালায় সজ্জিত হইয়া, পায়ে নুপুর বাধিয়া, আগুন আলিয়া ‘ধূপবাণ’

খেলিতে খেলিতে গ্রাম্য বাজারে, শিবমন্দিরের সম্মুখে, স্থানীয় জমীদার ও ভদ্রলোকদিগের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বক্শিস্ আদায় করিতেছে। সন্ধ্যাসমাগমে গ্রাম্যবিগ্রহ গোবিন্দদেবের আঙ্গিনা হইতে খোল করতালের শব্দ উঠিতেছে। সমস্ত বৈশাখ মাস নগরসঙ্কীৰ্ত্তন হইবে। আজ মাসের প্রথম দিন; তাই অধিকারী-পাড়ার কীর্ত্তনের দল ধুমধামে বাহির হইবার জন্য সজ্জিত হইতেছে। গলে পুষ্পমালা, চন্দনচকিত দেহ, পরিধানে পটবস্ত্র, এবং নামাবলীতে সৰ্ব্বাঙ্গ আৱত 'নাম'-কীর্ত্তননিরত গৌরভক্ত গায়কসম্প্রদায় নাচিতে নাচিতে ও—

“শ্রীবাসের আঙ্গিনা মাঝে আমার গৌর নাচে,

আমার গৌর নাচে ভক্ত সঙ্গে, নিতাই নাচে প্রেমতরঙ্গে,

মুখে হরি বোল—হরি বোল বলে' রে!”

এই গান গায়িতে গায়িতে রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা গ্রাম ঘুরিয়া বাজারের মধ্যে উপস্থিত হইলে, দোকানদারেরা তাঁহাদের ঘিরিয়া-দাড়াইয়া মাথার উপর হাত ঘুরাইয়া “সকলে একবার কৃকানন্দে পূর্ণ ক’রে হরি হরি বলো” বলিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল। অজাতশত্রু বালকগণ দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত নাচিতে নাচিতে কণ্ঠস্বর আরও উচ্চ করিল; এবং হরিশ্রবনি কীর্ত্তনের ধ্বাণ্ডা ও খোলের “বুজতা-বুজাং বুজাং-বুজাং” শব্দের উচ্ছ্বাসে গাঙ্গনের ঢাকের আওয়াজ একেবারে ঢাকিয়া গেল।

কিন্তু সন্ধ্যাদীপ প্রজ্জ্বলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে হালধাতার আগ্নেয়জনে দোকানদারেরা অধিকতর ব্যস্ত হইয়া উঠিল। যে দোকানদার অল্পদিন তাহার দোকানে সামান্য একটা মাটির ‘ডেন্‌কো’ আলিতেও কষ্টবোধ করে, সে-ও আজ লণ্ঠনের মধ্যে ঘাসে করিয়া তৈলের বাতি জালিয়া

রাখিয়াছে ! কিন্তু বাজারের মধ্যে আজ ‘বাবুদের দোকানের’ই বাহার সর্বাপেক্ষা অধিক। চন্দ্রবাবুর পূর্বপুরুষ জমীদার ছিলেন বলিয়া তাঁহার দোকানখানি গ্রামের মধ্যে ‘বাবুদের দোকান’ বলিয়া প্রসিদ্ধ। আজ তাঁহার দোকানে চাঁদোয়ার নীচে লাল নীল ও সাদা বেলোয়ারি ‘হাঁড়ি’র মধ্যে বাতি জলিতেছে। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদিগের বসিবার জন্য সতরঞ্চির উপর একটা গালিচা পাতা ; তাহার উপর দুই তিনটা গির্দা বালিশ ; তিন চারিটা বাঁধা ছাঁকা বৈঠকের উপর সারি সারি শোভা পাইতেছে। অদূরে রৌপ্যানির্মিত সুদৃশ্য কারুখচিত আতরদান গোলাপ-পাণ প্রভৃতি সৌখীন সামগ্রী তাঁহার পৈতৃক সম্রমের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তিনি ভিন্ন কে নববর্ষ উপলক্ষে দোকান এমন সুন্দররূপে সজ্জিত করিবে ? চন্দ্রবাবু জমীদারের ছেলে, ব্যবসায় করিতে বসিয়াও তিনি যে তাহা ভুলিতে পারেন নাই, ইহার প্রমাণস্বরূপ তিনি একটা গির্দা বালিশে হেলান দিয়া লোমবহুল দামোদরটী সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করিয়া মশলাখচিত গোলাপবাসিত ছাঁচি পানের সঙ্গে, ফরসীতে সুগন্ধি গম্মার তামাক টানিতেছেন ; কুণ্ডলীকৃত ধূম উড়িতেছে ; একজন চাকর ঝালরশোভিত একখানা প্রকাণ্ড পাখা লইয়া বাবুকে বাতাস করিতেছে। কোন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক আসিলেই বাবু মুহূ হাসিয়া তাৎপল্যবঞ্জিত আরক্ৰিম দস্তরুচিকোমুদী বিকাশপূর্বক বলিতেছেন, “এস ভাই, ব’স, সব শেষে বুঝি গরীবকে মনে পড়লো ?” এটা মৌখিক বিনয়ও নয়, সৌখীন অভিমানও নয়, দোকানদারী মাত্র ; অভ্যাগত ব্যক্তিগণ ইহা লৌকিকতামাত্র বিবেচনা করিয়া কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়াই ঝণাৎ করিয়া দুই চারিটি টাকা বাবুর সম্মুখে ফেলিয়া তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতেছেন ; দোকানদার বাবু আর একবার ঝিষ্ট হাসিয়া টাকাগুলি তুলিয়া

সম্মুখস্থিত রক্তনির্মিত রেকাবীতে রক্ষা করিতেছেন। দোকানের গোমস্তা একটু তকাত্বে বসিয়া খেঁকিয়াবাঁধা নূতন খাতাতে টাকাগুলি জমা করিয়া লইতেছে।

এখানে জলযোগের আয়োজন কিছু গুরুতর ; এজন্য একটু বেশী রাত্রি হইবে বুঝিয়া, নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা দোকানদার বাবুর অমুমতি লইয়া অন্যান্য দোকানে ‘খাতাসাইত’ করিতে চলিলেন ; এবং সেই সকল দোকানে টাকাটা আধূলিটা জমা দিয়া গোটা দুই চারি রসগোল্লা ছানাবড়া ও খানদুই জিলিপি, শেষে পান তামাক খাইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিলেন। দোকানদারের চাকরেরা বিভিন্ন দোকানে টাকা দিয়া ‘খাতাসাইত’ করিয়া বেড়াইতেছে। অবসর বুঝিয়া গ্রামস্থ ধোপা, নাপিত, পারঘাটার পাটনী, বাজার-পরিষ্কারক মেথর, জমীদারের ‘হাল্‌সানা,’ পাইক, এবং গ্রাম্য চৌকিদারেরা দোকানে দোকানে সন্দেশের বার্ষিক আদায় করিয়া ফিরিতেছে ; ইহাদিগকে বিদায় করিবার জন্য প্রত্যেক দোকানী কিছু কিছু ‘রাশি’ সন্দেশের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই দুই তিনটে করিয়া পাইয়া ইহার সহর্ষচিত্তে দোকানদারবর্গের জয়ঘোষণা করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেছে।

রাত্রি অধিক হইলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ চন্দ্রবাবুর দোকানে জলযোগ করিতে বসিলেন। বেলের সরবৎ, মুগের ডাল ভিজ্জে, নোনা, পেঁপে, ডাব প্রভৃতি ফল-ফুলুরী হইতে লুচি, কচুরী, ছানা, ক্ষীর কিছুই বাদ গেল না। এমন কি, চন্দ্রবাবু যথেষ্ট আয়াস স্বীকারপূর্বক অন্নপরিমাণ পাকা আম কাঁটালও সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; এবং পাকা আম কাঁটালের ঠিক সময় উপস্থিত হইবার পূর্বে উক্ত দ্রব্যদ্বয় সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে কিরূপ বেগ পাইতে হইয়াছে, উক্ত কার্যব্যাপদেশে তাঁহার

জমীদারীর কয়জন পেয়াদা গ্রামে গ্রামে কয়দিন ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, এবং কি পরিমাণ অর্থব্যয় হইয়াছে,—জমীদার-দোকানদার মহাশয় কথাপ্রসঙ্গে সে কথারও উল্লেখ করিতে ভুলিতেছেন না ! ভোক্তারাও অকৃতজ্ঞ নহেন, “হাজার হোক—জমীদারের নজর কি না, বনিয়াদী চাল কোথায় যাবে ?” ইত্যাদি স্ততিবাক্য প্রয়োগে তাঁহাদের অনেকেই চন্দ্রবাবুর প্রশংসাপিপাসু শ্রবণদ্বয়ের পরিতৃপ্তিসাধন করিলেন ।

কিন্তু আর দুইখানি দোকানের কথা এখনও বলা হয় নাই ; সেই দু'খানির মধ্যে প্রথম গ্রাম্য ডাক্তার হরিহর চাটুয্যের ঔষধের দোকান, দ্বিতীয় শিবু সাহার সরাপের দোকান । উভয় দোকানই কেরোসিনের উজ্জ্বল আলো, রঙ্গীন শিশি বোতল, ফুলের তোড়া ও নানাবিধ চিত্রপটে সুসজ্জিত ; কিন্তু ন'টা বাজিবার অনেক পূর্বেই আজ শৌণ্ডিকালয়েয় সদর দরজা বন্ধ হইয়াছে ! দ্বারপ্রান্তের ব্যবধানপথে আলোকরশ্মি বহির্দিশে বিকীর্ণ হইতেছে ; সুসভ্য নব্য বাবুরা কোঁচান চাদরে মুখ ঢাকিয়া অত্যন্ত সতর্কভাবে ত্রস্তপদে দোকানের খিড়কী-দ্বারে গোপনে ‘খাতাসাইতে’ করিতে যাইতেছেন ; কিন্তু তাঁহাদের জলযোগটা সেখানে কি ভাবে সম্পন্ন হইতেছে, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন ; তবে হাসির গরুর পথ হইতে স্তনিতে পাওয়া যাইতেছে ।

হরিহর বাবুর ডাক্তারখানার ‘খাতাসাইতে’র ব্যাপার লইয়া গ্রাম্য ডাক্তার-মহলে প্রথম প্রথম কিছু আন্দোলন উঠিয়াছিল । তাঁহার বলিতেন, ডাক্তারের পক্ষে এ রকম দোকানদারী বড়ই নিম্ননীয় ; কিন্তু হরিহর বাবু সাধারণের নিন্দার কিছুমাত্র তোয়াক্কা রাখেন না । তিনি বিদ্যার পর্বত, বুদ্ধির সাগর, জ্ঞানের আকর ; গীতা হইতে রসায়ন, এবং বেদ

হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং পর্য্যন্ত সৰ্বশাস্ত্রে সকল বিদ্যায় সুপণ্ডিত। বঙ্কিম বাবুর গীতা ও ‘কৃষ্ণচরিত্র’ পাঠ করিয়া সম্প্রতি তিনি আৰ্য্যধর্মের ও আৰ্য্যধর্ম্মানুসোদিত অনুষ্ঠানের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার যুক্তি এই যে, দোকানদারী যখন করিতেই হইল, তখন আৰ্য্যমতে করাই ভাল; কিছু টাকাও আসে, জাতীয় ভাবও বজায় থাকে। ভদ্রলোকের কথা বিশ্বাস করা অবশ্য কর্তব্য; কিন্তু তিনি মিছরীর সরবতে ‘লেমন সিরাপ’ ঢালিয়া তদ্বারা নির্মায়িত নিরীহ ভদ্রলোকদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় দিয়া, তাহার পর রাত্রি তপুর পর্য্যন্ত সোড়াওয়াটারের বোতল ও কাচনির্মিত সুধাপাত্র শতগুণ করিয়া ধনাঢ্য সুহৃদবৃন্দের যে অভ্যর্থনাকার্য্যে রত হন, তাহাতে জাতীয় ভাব ও খাটি হিন্দুয়ানী কি পরিমাণে রক্ষিত হয়, গ্রামের বাচস্পতি মহাশয় দিব্যর শাস্ত্রাচাৰ্য্যশীলন করিয়াও এপর্য্যন্ত তাহা মিত্রপণ করিতে পারেন নাই।

রাত্রি এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। গ্রামের উৎসব-কোলাহল নিবৃত্ত হইয়া চতুর্দিকে শান্তি বিরাজ করিতেছে। গ্রামখানি সমস্ত দিনের উৎসবানন্দ বৃকে বহিয়া যেন শান্তিভরে জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির ‘স্নগ্ধ শীতল ক্রোড়ে অচেতন হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু হরিহর বাবুর মজলিস এখনও ভাঙ্গে নাই। তাঁহার ‘ডিম্পেন্সারী’ হইতে ঘন ঘন তবলার আওয়াজ আসিতেছে, এবং একটি বাবু পানানন্দে বিভোর হইয়া শাস্তিপু্রে পাতলা কৌচান চাদরখানি স্থীলোকের ছায় পরিধানপূর্ব্বক, পরিধেয় বস্ত্রখানি মাথায় বাধিয়া নানা ভঙ্গীতে নৃত্য করিতেছে, ‘বাহা’ ‘বাহা’ করিয়া বেশুরো চীৎকার করিতেছে, এবং কম্পিতপদে নাচিতে নাচিতে ফরাসের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া ঢলু-ঢলু

লোহিত নেত্রদ্বয় উজ্জ্বল উৎকীর্ণ করিয়া রাসভবিনিন্দিত কণ্ঠে স্থলিতস্বরে
গায়িতেছে,—

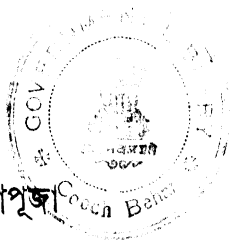
“সুখ পান করিনে আমি, সুখা থাই মা তারা ব’লে,

আমার মন-মাতালে মেতেছে আজ,

যত মদ-মাতালে মাতাল বলে !”



ଦଶହରା ଗନ୍ଧାପୂଜା ।



দশহরা গঙ্গাপূজা

আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে আকাশে নবীন মেঘের সঞ্চার দেখিয়া যুগান্তরপূর্বে যেমন রামগিরির নিভৃত উপত্যকায় অভিশাপক্লিষ্ট 'অবলা-বিপ্রযুক্ত' প্রবাসী যক্ষের হৃদয়ে সুগুরু বিরহবেদনা জাগিয়া উঠিয়াছিল, একালেও তেমনি গগনবিলম্বী ধূসর মেঘচ্ছায়া নববর্ষাগমে প্রত্যেক প্রবাসীর বাথিত মৰ্ম্ম স্পর্শ করিয়া, প্রিয়জনমিলনবঞ্চিত তুষিত বিরহি-হৃদয়ে অব্যক্ত বিরহ-হতাশের সঞ্চার করে। প্রথম আষাঢ়ের বিভাদ্রাম-ক্ষুরিত মেঘের ঘটা, নিদাঘের দীর্ঘসঞ্চিত-উত্তাপ-ক্লান্তিহরা প্রাবৃত্তের ঘনবর্ষণ, জলাশয়ে নবজাগ্রত ভেকের সর্ষ মকম্বনি, ধারাপাতপৃষ্ঠ তৃণাকুর ও বৃক্ষলতার শিথ-গ্রামসৌন্দর্য্যময় শাখাপল্লবের প্রচুরোদগমের সহিত পল্লীবাসিগণের হৃদয়ে নববর্ষার একটি প্রাচীন উৎসবকাহিনী স্বতঃই জাগিয়া উঠে;—সেই মধুর গ্রাম্য উৎসবটি দশহরা গঙ্গাপূজা।

বিল, খাল, নদী প্রভৃতি জলাশয় গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্রোত্তাপে শুকাইয়া গিয়াছিল; জ্যোষ্ঠের শেষ হইতে ঘনবর্ষণে সেগুলিতে আবার নবপ্রাণের সঞ্চার হইতেছে। বর্ষার প্রারম্ভেই গোবিন্দপুরের প্রান্ত-বাহিনী তরঙ্গিনীর শীর্ণদেহে আবার লাবণ্য বিকশিত হইতেছে। অপরিণীতা কিশোরীর দেহে ও মনে যৌবনের কোন লক্ষণ লক্ষিত হয় না; কিন্তু তাহার জীবনের এক বাহ্যলক্ষণে, সীমস্তের এই বিন্দু

সিন্দুররাগের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের অন্ধকার-গুহালীন সুস্থ প্রেম সহসা জাগিয়া যেমন তাহার সর্বদেহে যৌবন ও শাবল্য, লজ্জা ও কোমলতারূপে বিকশিত হইয়া উঠে, সেইরূপ বর্ষার পূর্বাঙ্কে নিদাঘকাদম্বিনীর একরাত্রির প্রবলবর্ষণে ক্ষুদ্র নদীহৃদয়ে বত্মা আসিয়া পল্লীবাসীর আবেগচঞ্চল হৃদয়ে সিন্ধু সৌন্দর্য্যময় সুকোমল অনুভূতির সঞ্চার করিয়া থাকে !

গ্রীষ্মকালে ক্ষুদ্র নদীটি শৈবালদলে ভরিয়া গিয়াছিল ; অত্যন্ত পুরু ‘টোপাপানার’ স্তূপ ও গ্রাওলা ; তাহার উপর দিয়া নৌকা-চালন সহজ ছিল না, বিদেশী নৌকাগুলিকে অতি আয়াসের সহিত ‘গুণ’ টানিয়া লইয়া বাইতে হইত। ময়রার মধ্যে মধ্যে এই শৈবালরাশি কাটিয়া গাড়ী বোঝাই করিয়া গৃহে লইয়া বাইত, এবং তাহার সাহায্যে গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিত। সে সময় নদীতে এক গলার বেশী জল ছিল না, শৈবালবর্জিত স্থানের ঘাটে সেই জলটুকু টল টল করিত,— অতি নিশ্চল, নীচে শাবুক-গুগলী, এমন কি, বালি পর্য্যন্ত উপর হইতে দেখা যাইত। কিনারায় এক একটা ‘ঝরণা’ হইতে ঝিরঝির করিয়া ঠাণ্ডা জল উঠিতেছে দেখিয়া ছেলেরা স্নান করিতে আসিয়া সেই সকল ঝরণার ভিতর পা ডুবাইয়া ক্রমাগত দাপাদাপি করিত, এবং জানুর উর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত ডুবিয়া গেলে তুই তিন জনে মিলিয়া সেই ঝগঝগ বালকের হাত ধরিয়া সমস্বরে “হিঁয়ো জোয়ান টানো, সাবাস জোয়ান টানো,” প্রভৃতি বাক্যে উৎসাহ প্রকাশ করিতে করিতে তাহাকে টানিয়া তুলিত। তিন চারি জন হস্তপ্রসারণ করিয়া খানিক জল ঘিরিয়া সঘনবাহুবিক্ষেপে নদীবক্ষে কৃত্রিম তরঙ্গের সৃষ্টি করিত ; কিন্তু নদীতে বর্ষাগম দেখিয়া তাহাদের মধ্যে বর্ষাস্থলভ জলক্রীড়া আরম্ভ হইয়াছে। কেহ নতুন শ্রোতে

শ্রাম ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে; কোথাও পাঁচ সাত জনে মালকৌচা করিয়া কাপড় পরিয়া কোমরে গামছা বাঁধিয়া সেই পঙ্কিল জলে ‘ডিম-পাড়াপাড়ি’ খেলা করিতেছে। আজ কাল পাশ্চাত্য-শিক্ষামুরাগী গ্রাম্য ছেলেরা এই আমোদজনক জলক্রীড়াটি পরিত্যাগ করিয়াছে; অতএব এখানে ইহার একটা সজ্জিস্থ বিবরণ প্রকাশ করিলে, ভরসা করি, আমাদের নাগরিক পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবে না।

চারি পাঁচটি ছেলে বাহবেষ্টনে অনেকখানি জল ঘিরিয়া রাখিলে, একটি বলিষ্ঠ বালক কতকগুলি শৈবাল লইয়া অনেক দূর হইতে ডুব দিয়া সবেগে এই বেষ্টনীর মধ্যে উপস্থিত হইল; এবং শৈবালগুলি রাখিয়া সে যে ভাবে আসিয়াছিল, সেই ভাবে প্রস্থান করিল। সেই দামগুলি দেখিয়া ‘পাখী বাসা করিয়া গেল’ বলিয়া অন্তান্ত লকলে উচ্চরবে আনন্দ করিতে লাগিল। বাসা করা, ক্রমে ডিমপাড়া, ডিমে তা’ দেওয়া, ডিম ফুটান, ছানাকে খাবার দেওয়া প্রভৃতি উপলক্ষে সেই বালকটি অন্তের অদৃশ্যভাবেই ডুব দিয়া এই বন্ধনীর মধ্যে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে লাগিল। অবশেষে ছানা উড়াইয়া লইয়া যাইবার সময় আসিল। যে সকল বালক বাহবিস্তার করিয়া বাসা রক্ষা করিতেছিল, তাহারা এইবার প্রসারিতপদে অধিক সতর্ক হইয়া দাঁড়াইল! বলিষ্ঠ বালকটি দূর হইতে এক ডুবে ইহাদের ভূজ-বন্ধনের মধ্যে আসিয়া ভাসমান লৈবালগুলি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সমস্ত জল আলোড়নপূর্ব্বক পলায়ন করিল। ‘ছা উড়িয়া নিয়ে গেল রে’ বলিয়া অন্তান্ত ছেলেরা তৎক্ষণাৎ ডুব দিয়া তাহার পশ্চাদ্ভাবন করিল। সকলেই ভিন্ন ভিন্ন দিকে ছুটিল; কিন্তু জল পঙ্কিল,—সুতরাং পলাতক কোন দিকে গেল, জলের মধ্যে চক্ষু উন্মীলিত করিলেও তাহা দেখিবার

উপায় নাই। এ দিকে পলাতক বালকটি ডুবসাঁতার দিয়া বহু দূরে ভাসিয়া উঠিল; তাহার মাথার উপর প্রচুর টোপাপানা। গলায় শৈবালদাম মালাকারে বেষ্টিত, মুখে কোতুকহাস্ত। শিরোমণি মহাশয় স্নানান্তে একবুক জলে দাঁড়াইয়া আস্থিক করিতেছিলেন; এক ছোকরার মাথা ঠকাস্ করিয়া তাহার জাম্বুদেশে আসিয়া লাগিল! তিনি মুখখানি বিকৃত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন; তাহার পর সেই প্রতিহত বালকটি অপ্রতিভ হইয়া মাথা তুলিতেই, শিরোমণি ঠাকুর চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তাহার উদ্ধতন ছাপান পুরুষকে অতি উৎকট গালাগালি দিতে লাগিলেন; সেই গালাগালির সঙ্গে এতই ইতর কথা মিশ্রিত ছিল যে, ঠাকুরের মুখে সেই কথাগুলি শুনিয়া অতি বড় মূর্খেরও তাহা দেবতা-স্তুত বলিয়া মনে হইল না! ঠাকুর মহাশয়ের এইরূপ উগ্রমূর্তি দেখিয়া ছেলেরা মুখে গামছা দিয়া হাসিতে লাগিল।

এই ভাবে দিনের পর দিন কাটিতেছিল। ছেলেরা সকালে পাঠশালায় লিখিয়া আসিয়া দোয়াত কলম ও পাততাড়ী ফেলিয়াই আম-ধাগানে ছুটিত। সেখানে কতকগুলি গাছ-পাকা আমের সন্ধানি করিয়া সকলে কোমরে গামছা বাধিয়া জলে নামিত। বাগান-রক্ষকেরা ঘর বাড়ীর সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিয়া বাগানের ‘টোঙ্গে’ স্থায়ী রকমের আড্ডা বাধিয়া বাস করিতেছিল। তাহাদের পরিবারস্থ কেহ কেহ বাগানের মধ্যেই তাহাদের ভাত আনিয়া দিত। সকালে বিকালে এক একটা পাকা কাঁটাল ভাঙ্গিয়া তাহার সহিত তাহারা সেই লোহিতবর্ণ কদম নিঃশেষ করিত, এবং প্রভাতে ও সন্ধ্যাকালে গাছে গাছে ঘুরিয়া ‘টোকা’ দিয়া কাঁটাল পরীক্ষা করিয়া দেখিত; পাকা কাঁটালগুলির বোটা দড়ীতে বাধিয়া তাহা ধীরে ধীরে মাটিতে নামাইত। রাখালেরা গোরক্ষণ

কার্য্য সম্পূর্ণ উদাসীন প্রকাশ পূর্ব্বক ‘গেজে’ লইয়া আত্মকানন-মধ্যবর্তী ভাঁট ও আশ্রাণ্ডার জঙ্গলের মধ্যে ঘুরিয়া বৃক্ষচ্যুত স্তম্ভক আয়ের সন্ধান করিত; গরুগুলি রক্ষকশূণ্য হইয়া কখন দূর মাঠে চরিতে বাইত, কখন আউস ধানের ক্ষেতে প্রবেশ করিত।

এ দিকে গৃহস্থবাড়ীতে চাকল্য ও কলরবের বিরাম নাই; মধ্যাহ্নে বর্ষীয়সী রমণীগণ দাওয়ার বসিয়া আহাৰাদি শেষ করিয়া, মুখপ্রক্ষালন না করিয়াই, আলুলান্নিতকেশে, প্রসারিতপদে, প্রশান্তচিত্তে গল্প করিতে-ছেন, “অমুক মাগীর বড় ‘ডামাক’; অমুকের বো আসল কলির মেয়ে, মুখ টিপ্পলে দুধ বেবোয়, তিন দিনও হয় নি ন-বসতে এসেছে, খাণ্ডী মাগীকে পটপটিয়ে দশ কথা শুনিয়ে দিলে!” “অমুকের বড় জোরের কপাল, পর পর তিন বেটা; আমাদের সাধের বো কি কপাল করেই এসেছিল! পাঁচ মেয়ের পর সোণার চাঁদ ছেলেটুকু হলো, তা তিন মাসও থাকলো না, এমনই ভগার বিচের!”—বিধাতার ক্রটীর এইরূপ কঠোর সমালোচনা ও নানা প্রসঙ্গের আলোচনা চলিতেছে। বহুকাল হইতেই বঙ্গান্তঃপুরে এমনই ভাবে এই সকল গল্প চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু কখন ভাড়া পুরাতন হইল না! ছোট ছোট মেয়েরা যখন মা ও ঠাকুর-মার বয়স লাভ করে, তখন শৈশবস্কলভ আমোদপ্রমোদ পরিত্যাগ করিয়া মা ও ঠাকুরমাদের আদর্শে এই সরস সমালোচনার চিরনবীন ভাণ্ডারট দখল করিয়া বসে, এবং চির-প্রবাহিত গল্পশ্রোত অক্ষুণ্ন রাখে;—কিন্তু হে পাশ্চাত্য শিক্ষা! তুমি এ যুগের নব্যা রমণীগণের নিকট হইতে তাঁহাদের মাতা ও পিতামহী-প্রদত্ত এই রসের ভাণ্ডারট কাড়িয়া লইয়া তথায় সূক্ষ্ম পশমশিল্পের প্রবর্তন এবং ‘মৃণালিনী’ ও ‘বিষবৃক্ষ’ প্রতিষ্ঠিত করিতেছ!



আষাঢ়াস্ত বেলা। আহারাদির পর ঘুমাইয়াও বেলা শেষ হয় না ! রমণীগণ এক ঘুম দিয়া উঠিয়া অপরাহ্নে কেহ কাঁথা সিলাই করিতেছে, কেহ কেহ কেশরচনার আরোজন করিতেছে। অধিকাংশ বাড়ীতেই পরদিনের জন্ত ‘খোলা’ জালা হইয়াছে ; দশহরার দিন ভাত খাইতে নাই, খোলা-হাঁড়ীতে চিঁড়া মুড়ি থৈ ভাজা হইতেছে। ছোট ছোট ছেলেরা উননের পাশে মায়ের কাছে বসিয়া পাকা কাঁটালের বিচি পোড়াইতেছে, বিচিগুলি পুড়িলে তাহা তুলিয়া তাহাতে তেল লবণ মাখাইয়া চাল-ছোলাভাজার সঙ্গে চৰ্কণ করিতেছে ; কোন কোন গৃহিণী বাড়ীর কর্তাদের বৈকালিক জলযোগের জন্ত কাঁটালের ‘মাড়ী’ (রস) করিতেছেন ; বধূগণ মাথাঘসা আমলা মেথি প্রভৃতি দ্বারা সুরভীকৃত নারিকেল তৈলে (তখন ‘কুস্তলীন’ প্রভৃতি সুরভিত কেশতৈলের আবির্ভাব হয় নাই) কেশ-সংস্কার পূর্বক কলসীকক্ষে নদীতে গা ধুইতে চলিয়াছে ; ললাটে ‘কাঁচ-পোকা’র একটি গোল টিপ্, নাকে নোলক, অধরে তাগ্বলরেখা, স্বক্কে ‘চারখানা’র সুরঞ্জিত পেড়ে গামছা, পায়ে নাপ্তিনীর সাবধানানুলিপ্ত অলঙ্কারাগ, পাছে আলতা মুছিয়া যায়—এই ভরে তাহারা অতি ধীরে পা ফেলিয়া চলিতেছে। কোন কোন গৃহস্থকতা কেশবিগ্রাস করে নাই, আঙুলফলঙ্কিত কেশপাশ পিঠের উপর ছাড়িয়া দিয়া চারিগাছ মলের বন্ধারে পল্লীপথ ধ্বনিত করিয়া চলিয়াছে। অপরাহ্নে পুরুষসামাগ্র-শূন্ত, বৃক্ষলতাপরিবেষ্টিত সেই সঙ্কীর্ণ গ্রামাপথে এই সকল বৃবতীর সঙ্কোচ-সম্পর্ক-হীন, ব্রীড়াবিরহিত, কোতুকহাস্তরঞ্জিত প্রসন্ন মুখখানি দেখিলে সত্য-সত্যই নাট্য-কারের সেই প্রসিদ্ধ গ্রাম্য ছড়াটি মনে পড়িয়া যায়,—

“এলোচুলে বেগে-বৌ আলতা দিয়ে পার,

কলসী কাঁকে নোলক নাকে জল আনতে যায়।”

কোন কোন গৃহস্থবধূ নূতন স্বস্তুরবাড়ী আসিয়াছে, এখনও লজ্জা
 ভাগ করিতে পারে নাই; বাপের বাড়ী থাকিতে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে
 সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে তরুচ্ছায়াসমাবৃত দীঘির ঘাটে জল আনিতে
 যাইত; স্বস্তুরবাড়ী আসিয়া তাহাদের সে স্নযোগ, সে স্বাধীনতা নাই;
 আজ পিতৃগৃহের সেই অবিচ্ছিন্ন সুখ ও অকুণ্ঠিত স্বাধীনতার কথা মনে
 করিয়া তাহাদের বক্ষে দীর্ঘনিশ্বাস ঘনাইয়া উঠিতেছে। স্বাণ্ডীর আদেশ
 পালনে ও অত্যাচার গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় পিতামাতার মেহমাথা
 স্নমধুর বাণী ও পিতৃগৃহের প্রতিদিনের নব নব আনন্দকাহিনী দিবসের
 অল্প সময় তাহাদের মনের ভিতর চাপা থাকে; কিন্তু শান্ত শীতল
 স্তব্ধ অপরাহ্নে, যখন সংসারের সকল কায শেষ হইয়া যায়, সন্মত
 দিনের পর একটু অবসর ঘটে, তখন তাহাদের বিরহ-কাতর কোমল
 হৃদয়ে সমুজ্জ্বল অতীত স্মৃতি ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। তখন
 তাহাদের প্রাণ এই অনভ্যস্ত নবীন মেহের জটিল বন্ধন হইতে
 মুক্তিলাভ করিয়া প্রথম জীবনের সেই বিপুল হর্ষকল্লোলমুখরিত
 স্নগভীর মেহের উদ্যম তরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িতে কিরূপ অধীর
 হইয়া উঠে, আশি পুরুষ লেখক কেমন করিয়া তাহা প্রকাশ করিব ?
 তাহার উপর আজ নব বর্ষার অপরাহ্নে আকাশে নবীন নীল কাদম্বিনী
 ঘনাইয়া আসিয়াছে; নদীর অপর পারস্থ প্রান্তর-প্রান্তে ধূসর বনরাজি
 অবিরল রুষ্টিধারাপাতে ঝাপসা দেখাইতেছে; বলাকাশ্রেণী গুল্মপঙ্ক
 বিস্তার করিয়া কম্পিতবক্ষে কোন অহুদ্বিষ্ট জলাশয় অভিমুখে
 উড়িয়া চলিয়াছে। গৃহপ্রান্তে পীতাম্বু ঝিল্লের ফুল ফুটিয়া প্রাচীরের চাল
 আলো করিয়া রাখিয়াছে; রাশি রাশি হুন্দে, সাদা ও লালসন্ধ্যামণি
 ফুল প্রস্ফুটত হইয়া সন্ধ্যা-সমাগমের আভাস দিতেছে; এবং আসন্ন

বৃষ্টির সম্ভাবনায় হর্ষাকুল ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা নাচিয়া নাচিয়া হু-
করিয়া বলিতেছে,—

“কচুর পাতায় নল,

জোরে মার ঢল।”

কেহ কেহ বা সমোচ্চ কণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছে,—

“কচুর পাতায় করম্‌চা,

এই সেযথান উ-ড়ে যা।”

প্রাঙ্গনস্থ শশার ‘টালে’ গোটাকতক বুলবুল সঙ্কার এই আলোকাক্রকারের মধ্যে উড়িয়া বুরিয়া বেড়াইতেছে, শশার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলগুলি কাটিতে কাটিতে অর্থহীন ভাষায় কতই আনন্দ প্রকাশ করিতেছে ; এবং অদূরবর্তী থানার ‘হাতা’র যে প্রকাণ্ড বৃদ্ধ ঝাউগাছটা দাঁড়াইয়া আছে, সঙ্কার বাতাসে তাহার শাখাপত্র কম্পিত হইয়া অবিরাম সোঁ-সোঁ শব্দ উঠিতেছে। বর্ষার সিক্তসারাস্রবায়ুত্যাগিত ঝাউর এই দীর্ঘ মর্শ্মোচ্ছ্বাসের ও বিহঙ্গকুলের এই বিচিত্র সাক্ষ্যকূড়নের অর্থ কি, তাহা এই সকল গ্রাম্যবালিকা জানে না ; কিন্তু তাহাদের কোমল হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে, তাহারা বেদনাপ্লুত হৃদয়ে অন্তর্লীন বিরহের কঠোরতা অনুভব করিতেছে ; এবং যুগান্তর পূর্বে আবাচের কোন স্মরণীয় প্রথমদিবসে আকাশে নবমেষের সঙ্কার দেখিয়া দেবী বীণাপাণির বরপুত্র হৃদয়ে যে অতৃপ্তি ও বেদনা অনুভব করিয়া অমর গাথায় বলিয়াছিলেন,—

“সেবালোকে ভবতি সুখিনোহপশ্চাৎখাবৃত্তিচেতঃ

কণ্ঠাল্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে।”

বালিকা প্রকাশ করিতে না পারুক, তাহার পিতৃগৃহের সুখস্বতির আলোচনার চঞ্চল চিত্ত ঝঙ্কারিত করিয়া ক্ষুদ্র হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে

এই অন্নান স্নানটাই পুনঃ পুনঃ অভিনব রাগিণীতে ধ্বনিত হইতেছে ; এবং মৃৎপ্রদীপের শলিতা পাকাইতে পাকাইতে কেবলই তাহার মনে হইতেছে, বালাকালের মতন তেমনি সুধাসিক্ত পুরাতন পরিচিত কণ্ঠে যদি কেহ একবার তাহাকে আহ্বান করিয়া বলে,—

“বেলা যে প’ড়ে এল জলকে চল !”

কিন্তু তেমন কেহই ত সেখানে নাই ! ব্যাকুলা বালিকার অশ্রুতরল ছল ছল নেত্রে স্নান সন্ধ্যার ক্ষীণ দীপালোক হিল্লোলিত হইয়া উঠিল।

ক্রমে রাত্রি গভীর হইয়া আসিল। ঝম্ ঝম্ শব্দে গুটি পড়িতেছে, বিজ্ঞাতের সমুজ্জল আলো, মেঘের গর্জন ; মাঝে মাঝে ‘চিকুর’ হানিতেছে, গুরুগুরু মেঘ ডাকিতেছে ; ছেলেরা কাপড় মুড়িদিয়া শুইয়া পড়িয়াছে। বাড়ীর বাহিরে বাঁশতলার গর্তের নূতন জলে অসংখ্য ভেক সৰু মোটা বিবিধ কণ্ঠে আনন্দধ্বনি করিতেছে, আর একটা কোলাবাঙ দুই তিন মিনিট অন্তর এক একবার “গ্যাং” “গ্যাং” করিয়া ডাকিয়া সেই জলাশয়ে স্বকীয় মহিমাযিত অস্তিত্বের পরিচয় জ্ঞাপন করিতেছে। সেই ভেকের কণ্ঠস্বর ও টিনের ‘মুরি’ দিরা ছাদসঞ্চিত গুটিধারা গৃহপ্রান্তস্থ একটা মানগাছের প্রকাণ্ড পাতার উপর পড়িয়া যে শব্দসম্ময় উৎপন্ন করিতেছে, তাহা বালক বালিকার শ্রবণবিবরে কুহক-ধারা ঢালিয়া তাহাদের চক্ষু বুজাঘোরে আচ্ছন্ন করিতেছে ; কিন্তু আজ সহজে কেহ নিদ্রা যাইতে পারিতেছে না। কাল দশহরা গঙ্গাপূজা ; দশহরার জন্ত দশ রকম ফল সংগ্রহ করিতে হয়। কোথায় কোন্ ফল পাওয়া যায়, খুব সকালে না উঠিলে চাটুঘোদের বাগানে ফল পাওয়া শক্ত হইবে, ইত্যাদি নানা কথাই আলোচনা চলিতেছে। ইতিমধ্যে ঘরের এক কোণে একটা প্রকাণ্ড বাঙ জলাশয়স্থ নবজলধারা-মুখরিত

কুটুম্বগের সহর্ষ মকধ্বনি শুনিয়া আর আত্মগোপন করিতে পারিল না, “কৌ-কট-কট” করিয়া ডাকিয়া উঠিল; শুনিয়া ছেলেরা লাফাইয়া উঠিয়া লাঠি দিয়া খাটের তল হইতে তাহাকে টানিয়া বাহির করিল। একজন গামছা মুড়িদিয়া রান্নাবরের বারান্দা হইতে খানিক গোবর লইয়া আসিল, তাহার পর নিরীহ ভেকের মস্তকে সেই গোময় স্থাপন করিয়া তাহাতে একটা তৈলসিক্ত জলন্ত শলিতা বসাইয়া দিল। শ্বেক সেই গোময়সংলিপ্ত শলিতা মাথায় লইয়া ঘরের চারি দিকে লাফাইয়া বেড়াইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ছেলে মেয়ের দল হাততালি দিতে দিতে

“তোরা দেখ্‌বি যদি আয় রে চলে”

ব্যাঙের মাথায় পিদ্দীম্ জ্বলে!”

বলিয়া উল্লাসহাস্তে গৃহ মুখরিত করিয়া তুলিল। অবশেষে বুড়া-কর্ত্তামা আসিয়া ‘কৃষ্ণের জীব’ ব্যাঙ বেচারিকে অব্যাহতি দান করিলেন।

খুব ভোরে ছেলের দল চাটুঘোদের কামরাস্তা বাগানে চলিল; সেখান হইতে বোটা-সংযুক্ত কামরাস্তা, জামরুল, ডালিম, লেবু, পেয়ারা, থোকা থোকা জাম, কলসা সংগ্রহ করিয়া কৌচড় ভরিয়া বাড়ী লইয়া আসিল। মাসী, পিসী, দিদিমল্লিকীয়া পাড়া-প্রতিবেশিনীগণ পূজা দিবার জন্ত সেই সকল ফলের কিছু কিছু অংশ চাহিয়া লইলেন; কিন্তু এখনও তিন রকম ফল বাকী, কোথা হইতে তাহা সংগ্রহ করা যায়, এই চিন্তায় অনেকেই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। শেষে তাহারা খেজুর গাছ হইতে পীতবর্ণ পরিপুষ্ট খেজুরের ‘কাঁদি,’ মজুমদারদের খিড়কীর বাগান হইতে সাদা সাদা ‘সাহেব-করম্‌চা’ ও একটা ‘কেলেকৌড়া’র ফল আনিয়া দশ রকম পূর্ণ করিয়া সহর্ষচিত্তে সাবধানে ঘরে তুলিয়া রাখিল। ‘কেলেকৌড়া’ এক রকম কণ্টকময় লতার ফল, দেখিতে অনেকটা

কাঁচা সুপারির মতন ; কোন প্রয়োজনে লাগে কি না জানি না, কিন্তু ‘মেরে-পাঁচালি’ মতে এই ফল দশহরা উপলক্ষে সংগৃহীত দশ রকম ফলের মধ্যে একটি অপরিহার্য ফল,—এই ফলে মনসাদেবী বিশেষ প্রীতলাভ করেন। ‘কেলেকৌড়া’র শিকড় না কি সর্প-বিষের মহৌষধ।

গ্রামে ছেলোদের মধ্যে আজ খেজুর পাড়িবার ধুমই কিছু বেশী ; খেজুরের বড় বড় ‘কাঁদি’ কাটিয়া মহানন্দে তাহারা বাড়ী লইয়া যাইতেছে, এবং তাহাতে যথেষ্ট তৈল লবণ মাখাইয়া, বিভিন্ন থোকায় বিভক্ত করিয়া সেগুলি ঘরের চালের ‘বাতা’য় সারি সারি টাঙ্গাইয়া রাখিতেছে। তৈল ও লবণে জর্জরিত হইয়া সেগুলি দুই এক দিনের মধ্যে একটু নরম হইলে ছেলেরা তদ্বারা রসনার তৃপ্তিসাধন করে ; কিন্তু সে রসে বালক বালিকা ভিন্ন অপরের তৃপ্তিলাভ সম্ভবপর নহে।

একটু বেলা হইলে গৃহকর্ত্তী স্নান করিয়া আসিয়া মনসাপূজার আয়োজনে মনোনিবেশ করিলেন। গোময়লিপ্ত তুলসীতলায় পাতাসেজের একটি ছোট শাখা প্রোথিত হইল ; বারকোসে নৈবেদ্য, পাথরের বাটীতে কাঁচা দুধ, পাথরে কলা আম জাম কাঁটাল প্রভৃতি সমরোপযোগী সুপক ফল, ধূনচিতে ধূপ, ঝাঁঝরী-ঢাকা দীপ গোময়ের উপর বসান ; সমস্ত আয়োজন হইলে সেগুলি তুলসীতলায় রক্ষিত হইল। পুরোহিত শিরোমণিঠাকুর আসিয়া একে একে দশ রকম ফল, ফুল, নৈবেদ্য ও ধূপ দীপ সহকারে দেবীর পূজা শেষ করিয়া গৃহান্তরে চলিলেন ; যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, “নৈবেদ্যগুলো পিপড়েতে যেন নষ্ট না করে, একটু সকাল সকাল আমাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিও, দিদি !”

পুরোহিতবাড়ীতে নৈবেদ্য ও ফল-ফুলারি প্রেরিত হইলে গ্রামস্থ রমণীবর্গের সাধারণ মাসী মুক্তাঠাকুরাণী মনসার কথা বলিবার জন্য

সহাস্রবদনে গৃহপ্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। ছেলে মেয়েরা চিঁড়াদই ও আর কাঁটাল দিয়া ফলার আরম্ভ করিবে, তাহারই উদ্দেশ্যে কঠোর চারিদিকে লাফাইয়া বেড়াইতেছিল, ইতিমধ্যে মুক্তাঠাকুরাণীর আবির্ভাবে সকলের চাঞ্চল্য অন্তর্হিত হইল; এমন কি, সহসা তাহাদের ফলাহারের আকাঙ্ক্ষাটাও কিছুকালের জন্ত নিবৃত্ত হইয়া গেল! বাড়ীর গিন্নি ও বৌ-বিরী ছেলে মেয়েদের লইয়া মুক্তাঠাকুরাণীকে ঘিরিয়া বসিল। ঠাকুরাণী গম্ভীর ভাবে পিড়ির উপর বসিয়া নানা কথায় গৌরচন্দ্রিকা করিয়া অবশেষে ‘মনসা পূজার কথা’ আরম্ভ করিলেন,—

“এক ছিল মণ্ডল, তার সাত বেটা; মস্ত গেরস্ত; গোয়ালভরা গরু, গোলাভরা খন্দকুটো, সোণার সংসার। ছোট বেটার বউ বড় লক্ষ্মী মেয়ে, নামটি তার কনে বৌ। কনে বৌ একদিন বিকেলে কলসী কাঁকে ‘জলকে গিয়েছে’, যেতে যেতে দেখতে পেলে মাঠে ধানের জমীর ‘আ’লে’ গরুর পায়ের একটা ‘পাউটার’ (পদচিহ্নের) মধ্যে ছোট ছোট দুটি ডিম! ‘আহা, কোন পাখীর ডিম এখানে প’ড়ে রয়েছে, এখনি কিসে নষ্ট করবে’ বলে কনে বৌ ডিম দুটি তুলে নিয়ে তার ডুরে শাড়িখানির আঁচলে গেরো দিয়ে বাঁধলে; তার পর বাড়ী এসে তাকের উপর সরার মধ্যে পোয়াল চাপা দিয়ে দিবি ক’রে ঢেকে রাখলে। এক দিন যায়, দু’ দিন যায়, রোজ দেখে, ডিম আর ফোটে না! শেষে এক দিন দেখলে ডিম দুটি ফুটেছে; পাখীর বাচ্চা নয়, দুটো গোখরো সাপের ছোট ডেঁকা! কনে বৌ তখন ডেঁকা দুটিকে রোজ রোজ একটু করে দুধ গন্ধাজল দিতে নাগলো। দুধ গন্ধাজল খেতে খেতে তারা বেশ ডাগর হয়ে উঠলো। তখন কনে বৌ বাড়ীর মধ্যকার ধানের গোলাতে তাদের তুলে রাখলে। কনে বৌর কাছে রোজ রোজ দুধ কলা খেয়ে-খেয়ে তারা ফুলে উঠতে নাগলো।

“গোলায় ধান বের কর্তে গিয়ে একদিন মণ্ডলের বড় ছেলে দেখলে ছোটো ‘ওরেবত’ সাপ গোলার মধ্যে ফোঁস্-ফোঁস্ করচে! দেখে ভয়ে পালিয়ে এল। শেষে কয় ভাই মিলে সাপ ছোটোকে বের করে ফেললে, লাঠি নিয়ে মারতে গেল; গিন্নি বললে, ‘আহা! বাসুসাপ মারিস্ নে, তাড়িয়ে দে।’ মায়ের কথা শুনে ছেলেরা সাপ ছোটোকে না মেরে তাড়িয়ে দিলে। কনে বৌ আবার এক সময় এসে তাদের চুপে চুপে গোলায় তুলে রাখলে।

“তার পরদিন মণ্ডলের মেজ ছেলে ধান বের কর্তে গিয়ে দেখে,— ছোটো ওরেবত সাপ গোলার মধ্যে ফোঁস্-ফোঁস্ করচে! দেখে ভয়ে পালিয়ে এল। শেষে কয় ভাই মিলে সাপ ছোটোকে বের করে ফেললে, লাঠি নিয়ে মারতে গেল; গিন্নি বললে, ‘আহা! বাসুসাপ, মারিস্ নে, তাড়িয়ে দে।’ কি করবে? মায়ের কথা ঠেলতে পারে না; ছেলেরা সাপ ছোটোকে না মেরে তাড়িয়ে দিলে। কনে বৌ আবার এক ‘ছাঁকে’ এসে তাদের চুপে চুপে গোলায় তুলে রাখলে।

“এমনি করে সেজ, ন, ফুল, ছোট, সকল ছেলে একে একে সাপ ছোটোকে তাড়িয়ে দেয়, আর কনে বৌ ‘নক্’ ক’রে তাদের কুড়িয়ে-কুড়িয়ে আনে। শেষে বাড়ীর কর্তার কাণে সে কথা গেল। সে কনে বৌকে ডেকে বললে, ‘হাঁদেখ কনে বৌমা, তুমি যে ভ্রম কলা দিয়ে কালসাপ ঘরে পুষ্ছো, তা ভাল হচ্ছে না; সাপ ছোটোকে তাড়িয়ে দাও, বনে যাক।’ কনে বৌ ঘোমটা টেনে আস্তে আস্তে বললে, ‘আমি ওদের হাতে করে মানুষ করেছি, কি করে তাড়াবো? তা’ গ্রাণ ধরে পারবো না। গাছ পুঁতে কি সে গাছ নিজের হাতে কাটা যায়? ওরা ত কারু ক্বেতি করে নি।’

“কনে বোকে খোঁটা দিয়ে তখন বাড়ীর পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলতে নাগলো ; চোখের জ্বলে বোটির গাল ছুটি ভেসে যেতো, সে হাপুস নন্ননে দিবেরান্তির কাঁদতো। আর তার অপরাধই বা কি ? তার পরাণের সামিগ্রী যে সোয়ানী, সে-ও তাকে উঠতে বসতে ঝাঁটা নাখি মারতে নাগলো, নড় কথায় বলতে নাগলো, ‘হয় তুই সাপ ছাড়, না হয় বাড়ী ছাড়।’

“একদিন সন্ধ্যাবেলা কনে বো গোলার ছয়োরে ‘সন্ধ্যা দেখাতে’ গিয়েছে, এমন সময় সাপ ছুটো তাকে ডেকে বললে, ‘দিদি গো দিদি ! আমাদের জন্তে তোমার বড় ‘নাখোতা’ হচ্ছে ; সতীনন্দী তুমি, তোমার এ কষ্ট আর তো চোখে দেখা যায় না, আমরা আর এখানে থাকবো না।’ কনে বো বললে, ‘কোথা যাবি ভাই তোরা ? আমার কষ্ট হচ্ছে আমারই হোক, আমি থাকতে কেউ তোদের বিদেয় করতে পারবে না।’

“সাপেরা ছুটি ভাই বললে, ‘না দিদি, আমরা দেশে যাব। দেশে আমাদের কত ধন দৌলত, কত ঐশ্বর্য্য আছে ; রাশীমাকে বলে তোমাকে একবার দিনকতকের জন্তে সেখানে নিয়ে যাব। যাবে তো দিদি ?’

“কনে বো বললে, ‘হ্যাঁ ! গেরস্তের বো আমি, আমায় কি কোথাও যেতে আছে ? তোরা যেমন পাগল, আমার যাওয়া-টাওয়া হবে না।’

“সাপেরা হেসে বললে, ‘তা হবে না দিদি ! আমরা পাল্কী বেহারার নিয়ে আসবো, তুমি বাপের বাড়ীর নাম করে’ যাবে ; আমরা কাঁধে করে তোমাকে দিনকতক পরে রেখে যাব।’

“কনে বো তখন মাথা নেড়ে বললে, ‘আচ্ছা, আমি যেন যাব, আর যদি তোদের জাত ভাইয়েরা আমাকে খেয়ে ফেলে ?’ সাপেরা হেসে

বলে, 'তা' খাবে না, দিদি, তোমাদের মানুষের মধ্যে যত খল আছে, সাপের মধ্যে তত খল নেই।'

"সাপ ছ'ভাই চলে গেল। ছ'মাস যায়, ছ'মাস যায়, এক দিন তারা দুই ভাই মানুষের বেশ ধরে বারোটা 'কাহার' আর পাল্‌কী নিয়ে কনে বোকে নিতে এল। কনে বো আগে কোন দিন ভাবে নি যে সাপেরা আবার তাকে নিতে আসবে! তাই তরাসে তার গা থর-থরিয়ে কাপ্তে নাগ্‌লো। কথা দিয়েছে, কি করে? স্বাণ্ডীকে বলে, 'মা! দিনকতক আমি বাপের বাড়ী থেকে আসি, অনেক দিন যাই নি।'

"স্বাণ্ডী বলে, 'তা' বাবে বই কি মা! হাজারো হোক, মা বাপের চেয়ে ব্যথার ব্যথী কে আছে? পাল্‌কী বেহারা যখন এসেছে, তখন আর ফিরানো ভাল হয় না, একবার দিনকতক থেকে এসগে।'

"স্বাণ্ডীর পারের ধুলো নিয়ে, স্বগুর, ছয় ভাগুর, সোয়ামী সকলকে প্রণাম করে, কনে বো পাল্‌কীতে গিয়ে বস্‌লো; বারোটা বেহারা পাল্‌কীখানা উড়িয়ে নিয়ে চ'ল্‌লো।

"কনে বো অনেক দিন নাগপুরীতে থাক্‌লো। 'ছ' মাস পরে বেহারাদের কাঁধে চড়ে স্বগুরবাড়ী ফিরে এলো। নাগরাণী মনসাদেবী তাকে অনেক গয়নাগাঁটি, অনেক টাকাকড়ি ধনদৌলত দিলেন; আর বলে দিলেন, যেন তাদের গেরস্তালীতে জষ্টি আবাড় মাসে মনসা পূজো হয়, তা'হলে আর সাপের ভয় থাক্‌বে না, সুখসম্পদ উথ্‌লে উঠ্‌বে।

"অনেক টাকাকড়ি মণিযুক্তো নিয়ে কনে বো স্বগুরবাড়ী ফিরে এসে দেখ্‌লে সেখানে তার নামে দুর্নাম রটেছে; সকাই শুনেছে, বো বাপের বাড়ী যায় নি! সমস্ত বো বাপের বাড়ী যায় নি ত পাল্‌কী চড়ে কোথায় গেল? আর এত টাকাকড়ি গয়না-গাঁটই বা কে দিলে? স্বাণ্ডী

মুখ বাঁকা করে রইল ; শব্দর বলে, ‘আমার কুলে কালী পড়লো’ ; সোয়ামী কথা কয় না ; ছয় জা কাছে যে’সতে দেয় না ; পাড়াপড়সী পাঁচজনে ছি ছি করতে নাগলো । দেখে শুনে কনে বৌ নজ্জায় মরে গেল । মনে মনে বলে, ‘মা মনসা দেবী ! তুমি জান আমি নিদুর্ভাগী কি না, তুমি আমার এ কলঙ্ক দূর কর, মা !’

‘সেদিন মনসা পূজো ; মনসা তখন টেকির মত রূপ ধরে এক বাড়ীতে পূজো খাচ্ছিলেন । তাঁর মাধায় টনক নড়লো, একটা সাপকে ডেকে বলে দিলেন, ‘বা, কনে বৌকে বলে আয় তার কোন ভয় নেই ; খুব ধুমধামে মনসা পূজোর আয়োজন করুক !’

“ভারি ধুমধামে মনসা পূজোর আয়োজন হ’লো, দশ শলি চিঁড়ে কোটা হ’লো, দশ মণ দইএর বাসনা দেওয়া হ’লো, কুটুম-কুটুম্বিতের ভারি ধুম পড়ে গেল ; মণ্ডলদের জাতভাইয়েরা যে যেখানে ছিল, সকলে এসে জুটলো, চিঁড়ে দৈয়ের পেলায় ফলার নাগলো ।

“সকলে ফলার খেতে বস্বে, এমন সময় যে মণ্ডলদের জাতের চাই, সে বলে, ‘বুড়ো মণ্ডল, আমরা আর সব পারি, কিন্তু তোমার বাড়ীতে খেতে পারি নে । পারি নে কেন, তা বলি শোন । তোমার কনে বৌ বাপের বাড়ীর নাম করে এতদিন কোথায় কাটিয়ে এল, আর এত টাকাকড়ি মণিমুক্তোই বা কোথায় পেলে, তা আমরা কেউ জানি নে । যার ঘরে এমন বৌ থাকে, তার সঙ্গে সমাজে চলাচল কেমন করে হ’তে পারে ? হ্যাঁ, তবে যদি কনে বৌ এই দেশের মাঝে দাঁড়িয়ে আমাদের এ সকল কথার জবাব দিয়ে মনের সন্দ মিটোতে পারে, তা’হলে আমরা তোমার বাড়ী ফলার খাওয়া মঞ্জুর কর্তে পারি । এতে রাজী হও ভাল, না হও তুমি আজ থেকে একঘরে হ’য়ে রইলে ।’

“চাইয়ের এই কথা শুনে মণ্ডলবাড়ী কান্নাকাটি পড়ে গেল। এত অপমান, এমন নজ্জা কি মানুষের হয়? বুড়ো মণ্ডল মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো, তার সাত ছেলের মুখ চুপ হয়ে গেল, মণ্ডল-গিন্নি চারদিকে শরৎের ফুল দেখতে নাগলো, কনে বোর কাছে এসে কেঁদে বসে, ‘কি হবে মা, আজ যে জাত যায়! তো হ’তে যে আমাদের মুখ হাসবে, তা ত জানতাম না; পারিস্ ত আজ সকলের মান বাঁচা।’

“কনে বো তখন হাত জোড় ক’রে বসে, ‘হেঁই মা মনসা, আজ নজ্জা নিবারণ কর!’ স্বাগুড়ীকে বসে, ‘যদি আমি নিন্দুঘী হই, যদি আমার গুরুজনের উপর ভক্তি থাকে, আমি যদি সতীনন্দী হই, ত দশের কাছে আজ আমাদের মুখরক্ষে হবে। এতদিন আমি কাউকে কোন কথা বলি নি, আজ আমি সকল কথা খুলে বলবো, দশঠাকুরকে বৈঠকে বসতে বলে পাঠাও, আমি যাচ্ছি।’

১ “তার পর কনে বো ময়লা কাপড় পরে, মাথা নীচু করে, দশঠাকুরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো; সতীনন্দীর হাতের পাঁখা, সিঁথির সিঁহর জল্-জল্ করে উঠলো; আর কোথা হ’তে দুটো পেলায় অজগর সাপ (মা বলতে গা শিউরিয়ে উঠছে!) ছুটে এসে কনে বোর কাঁধের উপর উঠে ফণা ধ’রে দাঁড়ালো!

“কনে বো তখনই চিন্তে পারলে, এরা তার কুড়িয়ে-পাওয়া ছুটি ভাই! কনে বোর মনে তখন ভরসা হলো যে, মা মনসা আজ নজ্জা নিবারণ করবেন। তখন সে দশের মাঝে মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে বলতে নাগলো, ‘এক ছিল মণ্ডল, তার ছিল সাত বেটা; মস্ত গেরস্ত; গোয়ালভরা গরু’ (এই স্থানে মুক্তাঠাকুরাণী প্রথম হইতে সৰ্ব্বস্ত গরুটার পুনরাবৃত্তি করিলেন)—কথা শেষ হলে সাপ দুটো আস্তে আস্তে নেমে

বনে চলে গেল ; দশে ধন্তি ধন্তি করতে নাগলো ; মণ্ডল বল্লে, ‘মা ! তুমি আমার ঘরের নন্দী, তুমি আমার সতীসাক্ষী বোমা ; তোমার মনে বড় কেলেশ দিয়েছি, বুড়ো শ্বশুরের অপরাধ নিও না মা !’

“কনে বৌ বল্লে, ‘মা মনসা আজ আমাদের নজ্জা নিবারণ করেছেন ; কলিতে তিনি জাগ্রত দেবতা, আজ হ’তে ঘরে ঘরে যেন তাঁর পূজো হয় ।’

“ধুমধামে চিঁড়ে দৈয়ের ফলার হয়ে গেল ; ঘরে ঘরে মনসা পূজোর ধুম পড়লো । মণ্ডলদের সুখসম্পদ উথ্লে উঠলো । শেষে অনেক কাল মুখে ঘরকন্না করে সতীনন্দী কনে বৌ বুড়ো বয়সে পাকাচুলে সিঁদূর পরে’ হাতের নোয়া অক্ষর রেখে সোয়ামী পুতুর নাতি-পুতি থুয়ে স্বর্গে গেল ।”

মুক্তাঠাকুরাণী ওরফে ‘মুক্তোমাদী’ স্বাভাবিক সরল অলঙ্কারবর্জিত ভাষায় এই সরস কাহিনী বর্ণনা করিলেন । কথা শেষ হইলে কিঞ্চিৎ জলযোগের জন্ত চারি দিক হইতে তাঁহার উপর অনুরোধ চলিতে লাগিল ; মুক্তাঠাকুরাণী বলিলেন, “ও মা, এখন কি আমি জল খেতে পারি ? আরও দশ বাড়ীতে আমাকে কথা শুনোতে হবে, তবে ত আমার মুখে জল দেওয়ার যো হবে ; বোসবাড়ী দত্তবাড়ী বক্সীবাড়ীর গিন্নীরা হা পিত্যোশে বসে আছে, তাদের আগে ঠাণ্ডা করি গিয়ে ! খাওয়ানর জন্তে ব্যস্ত কেন মা, তোমাদেরই ত খাচ্চি ; এখন আসি ।”

বেলা দশটার মধ্যে মনসা পূজা শেষ হইয়া গেল ; এমন সময় নদী-তীরে অনেকগুলি ঢাক যুগপৎ সজোরে বাজিয়া উঠিল । গ্রামের ছেলেরা তেল মাখিয়া কোমরে গামছা জড়াইয়া নদীতীরে গঙ্গাপূজা দর্শিতে ছুটিল ।

গৃহস্থের বাড়ী-বাড়ী আজ যেমন মনসা পূজা হইতেছে, তেমনি গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যবসায়িগণ ঢাক ঢোল বাজাইয়া নদীতীরে গঙ্গাপূজা

করিতেছে। গোবিন্দপুরে শ্রীমানী ও নন্দীদের আড়তই সর্কাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রতিষ্ঠাপন্ন; ইহাদের বিবিধ পণ্যদ্রব্য নানা স্থান হইতে নৌকা-বোঝাই হইয়া গোবিন্দপুরের ঘাটে আসিয়া থাকে। পণ্যদ্রব্যপরিপূর্ণ নৌকা বাহাতে নির্বিঘ্নে ঘাটে আসিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে গঙ্গা-দেবীকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য বৎসরান্তে আজ দেবীর পূজা হইতেছে। গত বৎসর শ্রীমানীদের তিনখানি চুণের নৌকা গঙ্গায় ডুবিয়া যাওয়াতে তাহাদের বড় ক্ষতি হইয়াছিল। হয় ত কোন কারণে দেবী জাহ্নবী অনুগত ভক্তের প্রতি রুষ্ট হইয়া থাকিবেন, এই আশঙ্কায় শ্রীমানীরা এবার অত্যন্ত ধুমধামে পূজা দিতেছে। নদীতীরে অনেকখানি স্থান কোদালী দ্বারা পরিষ্কার করিয়া, সেখানে ছড়াঝাঁট দিয়া একটা ছোট সামিয়ানা ও 'নীলের চাদরে'র নীচে পূজার আয়োজন হইয়াছে। এই অঞ্চলে প্রতিমাগঠন পূর্বক গঙ্গাপূজা করিবার নিয়ম নাই; শুনিয়াছি, কোন কোন স্থানে ভগীরথানুসারিণী মকরবাহিনী মূর্তির পূজা হয়; কিন্তু এ অঞ্চলে মৃণ্ময় ঘাটে দেবীর আবাহন করিয়াই তাঁহার পূজা হইয়া থাকে, তবে অনুষ্ঠানের ক্রটি হয় না। নাকে তিলককাটা, নামাবলীতে আবৃতদেহ, সন্তঃস্নাত পুরোহিতেরা সামিয়ানার নীচে পূজায় বসিয়া গিয়াছেন; গম্ভীরস্বরে মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে। পুরোহিতের হস্তে এক একবার ঘণ্টা বাজিতেছে, আর বট গাছের ছায়ায় সবুজ ঘাসের উপর উপবিষ্ট চাকীরা 'ড্যাং ড্যাং—ড্যাড্যাং ড্যাং' শব্দে ঢাকে ঢুই একবার কাঠি দিয়া সঙ্গীদের সঙ্গে আলাপ করিতেছে। পূজার কাছে বড় বড় বার-কোসে বুটভিজ্জে, মুগের ডালভিজ্জে, খণ্ড খণ্ড পাকা কলা; হুই পাঁচ জন নাছোড়বান্দা অতিথি, ফকীর, বোষ্টম ও চাকর-বাকরের জন্তু ধাশা-বোঝাই চিঁড়ে ও মুড়কী, তেকাটার উপর পিতলের রেকাবীতে আর,

জাম, নারিকেল, কাঁটাল, বনকাঁটাল কাঁকড় প্রভৃতি নানাবিধ সাময়িক ফল সুপাকারে সজ্জিত। . নিকটে একটা প্রকাণ্ড ধূপাধারে ধূপ জলিতেছে ; কলার পাতায় রাশি রাশি ফুল, পদ্মকুলই বেশী। দোকানদারদের ছোট ছোট ছেলেরা কাঁশর ঘণ্টার বিশৃঙ্খল শব্দ তুলিয়াছে। নদীতীরে কুড়ি পঁচিশখানি ছোট বড় নোকা বাঁধা। নোকার মাঝিরা নোকাগুলিকে উত্তমরূপে ধোত করিয়া তাহাদের গলুই তৈল ও সিন্দূরে রঞ্জিত করিয়াছে ; কেহ কেহ নোকাগ্র শুভ্র সোলার মালায় ও সোলার কদম্বফুলে ভূষিত করিয়াছে। বড় বড় নোকায় যে সকল মেড়ুয়াবাদী দাঁড়ী ‘গুণ’ টানিবার জন্ত নিযুক্ত আছে, তাহারা নোকার শতছিদ্রবিশিষ্ট সুবৃহৎ পালগুলি নদীতীরে সবুজ ঘাসের উপর বিছাইয়া, গুন্‌ছুঁচ দিয়া পালের ছিন্ন অংশগুলি মেরামত করিতেছে। কোপীনের উপর আজ্ঞাভুলবিলম্বিত বহির্বাণধারী, নামাবলী-বেষ্টিতমস্তক ভিখারীর দল কাঁধে ঝুলি লইয়া নোকায় নোকায় ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছে, এবং গ্রাম্য কারুকাৰ্য্য-খচিত সারিন্দের তাঁতের উপর দ্রুত ছড় বুলাইয়া, তাহার সৰুৰূপ কম্পিত তানের সহিত আপনার স্থল কণ্ঠস্বর মিলাইয়া, গগার মোটা মোটা শিরা ফুলাইয়া মাথা ঘুরাইয়া টিকি ঢুলাইয়া গায়িতেছে,—

“ব্রজ হ’তে তোমায় নিতে পাঠায়েছে মাই,

তুমি যাবে কি না যাবে হরি ! জানতে এলাম তাই।”

তাহাদের কণ্ঠস্বর সুপ্রশস্ত নদীতীর ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে। অদূরে আউসের ক্ষেতে বসিয়া কৃষাণেরা নিড়ানী দ্বারা বড় বড় শ্রামা ঘাস ও কাঁটা নিড়াইতেছে ; মধ্যে মধ্যে উদ্দাম বায়ুপ্রবাহে ধাত্তশীৰ্ষ-গুলি হিল্লোলিত হইতেছে। মুক্ত আকাশের নীচে এই জ্বলন্তল নিম্নল বায়ুহিল্লোলে, কঠোর শ্রমসাধ্য দৈনিক কায করিতে করিতে উৎসবের

বাঞ্চে ও ভিখারীদের গানের সুরে এই সকল কুবকের মনে আনন্দধারা প্রবাহিত হইতেছে ; তাই নিড়ানী চালাইতে চালাইতে তাহাদের অনেকেই সমস্বরে গায়িতেছে,—

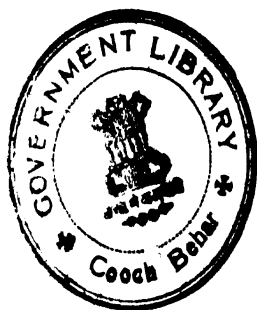
“যখন ক্যাতে ক্যাতে ব’সে ধান কাটি

ও মোর মনে জাগে তার লয়ান ছুটি ।”

দোকানদারেরা জলের উপর দিয়া এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত নদীর বুকে যে ফুলের মালা পরাইয়া দিয়াছে, তাহা হইতে দুই পাঁচটা ফুল ধরিয়া ভাসিয়া যাইতেছে ; সেই ফুল সংগ্রহ করিবার জন্ত নানরত ছেলেরা দলবদ্ধ হইয়া জলরাশি তোলপাড় করিয়া সেই দিকে সাঁতার দিয়া যাইতেছে আকাশে এই মেঘ, এই রোদ্র ; মেঘের ছায়া চঞ্চল নদীবক্ষে কিছু কাল ক্রীড়া করিয়া অতৃদিকে চলিয়া যাইতেছে, এবং মধ্যাহ্নের উজ্জল সূর্যালোকে তখনই বারিরাশি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে ; মেঘ ও রোদ্রের এই ছায়ালোক বক্ষে ধরিয়া নদীস্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে ; দেখিয়া মনে হয়, বহুকাল পূর্বেও এমনই একদিন দেবী ভাগীরথী ভগীরথের অভিশপ্ত পিতৃপুরুষগণের চিতাভয়ে জীবন সঞ্চার করিবার জন্ত এমনই করিয়া কলপ্রবাহস্বাক্ষরিত ক্ষিপ্ত চঞ্চল চরণে ধাবিত হইয়াছিলেন ; তাঁহার পূণ্যপাদম্পর্শে চারি দিকে এমনই আনন্দ ও উন্মাদনার সঞ্চার হইয়াছিল ! যাজ্ঞিকেরা মঙ্গলবাণনিদাদিত শঙ্খঘণ্টা-আরাবিত তীরতরুচ্ছায়ায় বসিয়া এমনই ভাবে ভক্তিমধুর স্তবপাঠে তাঁহার আবাহন করিয়াছিলেন, এবং সেই পতিতপাবনীর সংস্পর্শে অনুর্বর তটভূমি ফুলে ফলে ও নানা শস্ত্রে সুশোভিত হইয়াছিল ।—প্রাচীন যুগের সেই দুর্লভ নিষ্ঠা, ভক্তি ও অনন্তসাধারণ নির্ভর আর নাই ; তথাপি নববর্ষার এই মেঘ-রোদ্রহিলোলিত আনন্দ-কল্লোলপূর্ণ উৎসবময় দিবা হর্ষোচ্ছাস-মনাকুল অতীত স্মৃতির বিস্মৃতপ্রায়

ব্রহ্মভাগ্য হইতে যে স্মরণচিহ্নটুকু আহরণ করিয়া আনিতেছে, তাহাতেই আমাদের ক্ষুদ্র গুহ মরুচিন্তে শাস্তিরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে ; এবং এই উৎসব-দৃশ্য আমাদের জ্ঞানালোকপ্রদীপ্ত সংশয়সঙ্কুল অনভ্যন্ত চক্ষুর সম্মুখে স্বপ্নলোক-সম্ভূত মনোহর বায়ুচিত্রের স্থায় প্রতিভাত হইতেছে।





অানষাত্রার মেলা ।

স্নানযাত্রার মেলা



দশহরার চারিদিন পরে শুক্লা-চতুর্দশীর রাত্রে প্রতিবেশী বন্ধুর গৃহে বসিয়া ছিলাম। রাত্রিটা বেশ উপভোগ্য মনে হইতেছিল। চতুর্দশীর চাঁদ আকাশে হাসিতেছিল; হাসিমাখা চাঁদমুখ পুষ্করিনীর জলে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। সম্মুখস্থ বাগানে অযত্নরোপিত রজনীগন্ধার ঝাড়,—তাহার দীর্ঘ কাণ্ডে থোকা থোকা ফুল কুটিয়া শুভ্র কৌমুদী-পরিপ্লাবিত নিশীথিনীকে নৃত সৌরভে আমোদিত করিয়া তুলিয়াছিল। সমগ্র গ্রামখানি মৌন, সুপ্তবৎ স্থির; গ্রাম্যপথে জনপ্রাণীর সাড়া-শব্দ নাই। সঙ্কীর্ণ পথগুলি আঁকিরা-বাঁকিয়া বিভিন্ন গৃহস্থের কুটারদ্বারে, নদীর ধারে, গ্রামপ্রান্তে, প্রসারিত! পথের দুইধারে কলা-বাগান, আম কাঁটালের বাগান, তরিতর-কারীর ক্ষেত, বাঁশের ঝাড়। বাঁশের মাথাগুলি পথের উপর ঝুঁকিয়া গড়িয়াছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নালোক নিম্নস্থ আশাওড়া বা ভাঁট গাছের পত্রগুচ্ছ চুম্বন করিতেছে। বাঁশের ঝাড়ে একটা শিয়াল শুক পাতার উপর দিয়া থস্-থস্ করিয়া চলিতেছে। এমন সময় চম্পক বৃক্ষের বন পত্রান্তরাল হইতে একটা পাখী ডাকিয়া উঠিল,—“বো—কথা কও!”

সেই রাত্রিতেই স্থির হইয়া গেল, পরদিন অতি প্রত্যুষে মুকুটিয়ায় ‘স্নানযাত্রার মেলা’ দেখিতে যাইতে হইবে! তৎক্ষণাৎ চাকরকে দুইখানি গন্ধর গাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিতে আদেশ করা হইল; উবাগন্মের পূর্বেই তাহারা আমাদের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইবে।

সরকারী খাজনা-খানার ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া চারিটা বাজিয়া গেল। দুই পাঁচ মিনিট পরেই দরজায় গাড়োয়ানের আবির্ভাব হইল; গলায় যুগ্মরবাধা হুটপুট দুই দামড়া ও একখানি ছেঁ-বিশিষ্ট গরুর গাড়ী। প্রতিবেশী বন্ধুগৃহেও এইরূপ একখানি গো-শকট উপস্থিত হইয়াছিল। গাড়ীর ভিতর বিচালীর গদী,—এই গদীর উপর যথারীতি শয্যা-রচনা করিয়া আমরা দুই বন্ধু ছেঁয়ের ভিতর প্রবেশ করিলাম। নির্জজন পল্লীপথে গাড়ী ‘হটর-হট’ শব্দ করিয়া চলিতে লাগিল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে আমরা গ্রাম ছাড়িয়া মাঠে পড়িলাম। প্রথমটা কিছুকাল গাড়ীর মধ্যেই বসিয়া ছিলাম; কিন্তু দেখা গেল, তাহাতে ইঠাৎ জ্বখম হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল! সকলেই জানেন, গরুর গাড়ীতে ‘স্প্রিং’ থাকে না—এবং পল্লীগ্রামের পথ সমতল নহে। গাড়ী চলিতে চলিতে হট করিয়া ‘ত্বাসা’য় পড়িলেই আমাদের দুইজনের নাথা সজোরে ঠোকা-ঠুকি বাধাইল! দুই চারিবার এভাবে ঠোকর লাগিলে নাথা কাটিয়া রক্তপাত হইত, কিন্তু তাহার আর অবসর দিলাম না; আর না বসিয়া গাড়ীর ছেঁয়ের মধ্যে পাশাপাশি শয়ন করিলাম! গাড়ী হটর-হটর করিয়া মেঠো পথে ছুটিয়া চলিল; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পা হইতে নাথা পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ সবেগে আন্দোলিত হইতে লাগিল।—সে সুখের তুলনা নাই!

মাঠে পড়িয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তখন পাঁচটা বাজে; আকাশে আর নক্ষত্র নাই, কেবল শুক-তারা উষার ললাটে জল্-জল্ করিতেছে। পূর্বাকাশ লোহিত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু পশ্চিম গগন আলোক-লেখাহীন। মাঠের উপর দিয়া স্নীতল বায়ু বহিয়া যাইতেছে; সেই বায়ুহিল্লোলে বৃক্ষপত্রের সর-সর কম্পন, তরু-শাখায় নবজাগ্রত বিহঙ্গমকুলের স্তম্ভুর কাকলী, পথিপ্ৰান্তস্থ বহদূরবিস্তৃত ধাত্তক্ষেত্রে আউস ধাত্তের শ্যামল শোভা,

এবং মুক্ত প্রকৃতির কমনীয় কাস্তি ;—শকট-যন্ত্রণা ভুলিয়া প্রাণ ভরিয়া পল্লীর দৃশ্য-বৈচিত্র্য দেখিতে লাগিলাম। যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখিলাম,—পল্লী-জননী যেন সবুজ মধুমলের শাড়ী পরিয়া ললাটে উষার সিন্দূর-রাগ ধারণ করিয়া মৃদুমৃদ হাসিতেছেন ; তাঁহার আনন্দাশ্রু বৃক্ষপত্রে তৃণক্ষেত্রে শিশির-বিন্দুরূপে শোভা পাইতেছে ! মনে মনে ‘সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্ত-শ্যামলা’ বঙ্গজননীকে প্রণাম করিলাম।

জেলাবোর্ডের সুদীর্ঘ মেঠো পথ পদ্মাতীর পর্য্যন্ত প্রসারিত। আমাদের গ্রাম হইতে মুকুটিয়ার দূরত্ব ছয় ক্রোশ। গো-শকটে ছয় ক্রোশ পথ অতিক্রম করা অল্প সাহস বা ধৈর্য্যের কাষ নহে ! তবে আমরা পল্লীবাসী ; গো-শকটারোহণে আজন্ম অভ্যস্ত ; স্মতরাং গাড়ীর মধ্যে পড়িয়া থাকিতে তেমন কষ্ট হইল না। গাড়োয়ান গরুর ল্যাজ মলিয়া ‘চুম্‌কুড়ি’ ছাড়িয়া, এবং সম্মুখে বু কিয়া পড়িয়া উভয় হস্তে বলদদ্বয়ের পিঠের দাঁড়া টিপিয়া, তাড়াতাড়ি গাড়ী চালাইতে লাগিল। আমরা যতই অগ্রসর হইলাম, পথে যাত্রী-সমাগম ভতই বাড়িতে লাগিল।

পথের দুই ধারে ধানের ক্ষেত। ধাত্তক্ষেত্রের সুদূর সীমান্তে আর কাঁটালের বাগান। বাগানের অস্তরালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম। সেই সকল গ্রাম হইতে বালক যুবক বৃদ্ধ শত শত লোক ‘আইল’ ভান্ধিয়া দ্রুতপদে পথের দিকে আসিতেছে। সেই সকল দলে বালিকা যুবতী বৃদ্ধারও অভাব নাই। সংবৎসরের পরে মেলা দেখিতে পাইবে—এই আনন্দে ও উৎসাহে তাহারা আমাদের গাড়ীর পাশ দিয়া দ্রুত চলিতে লাগিল। কোনও যুবতীর ক্রোড়ে এক বৎসরের একটি পুত্র বা কন্যা ; কোনও বর্ষীয়ান পুরুষের স্বন্ধে দুই তিন বৎসরের শিশু।—যাত্রিগণের বেশ-বৈচিত্র্যই সর্বত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করে ! কাহারও কাঁধে গামছা, হাতে বাঁশের লাঠি ; কাহারও অঙ্গে

ফুলকাটা শাদা কামিজ, পরিধেয় বস্ত্রখানি অপেক্ষা তাহা ওজ্জ্বল; ‘কোরা’ চাদরখানি তো করিয়া বুকে বা কাটদেশে বাঁধা, কিন্তু ত্রশ-করা কালো জুতা-জোড়াটি হাতে! কাহারও বুকের পকেটে গিল্টিং-চেনে বাঁধা তের সিকার ‘ওয়াটারবারি’ ঘড়ী; কাহারও কাঁধে অতি পাতলা ফিন্‌ফিনে লাল বা সবুজ ‘সিক্কে’র চাদর; কাহারও হাতে ছাতা, মাথায় লাল রুমাল বাঁধা। পল্লীযুবক-গণের বিচিত্র বসনভূষণ, বিচিত্র বেশ!

কিন্তু মেলা-দর্শনাভিলাষিণী পল্লীনারীগণের বেশভূষার বৈচিত্র্যও অল্প নহে; ছিন্নচীরধারিণী ভিথারিণী হইতে গুলবাহার-শাড়ী-পরিহিতা মণ্ডলদের ‘ঝি’ পর্য্যন্ত সকলকেই সেই দলে দেখিতে পাইলাম। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু নারীও এদলে বিস্তর; কাহারও হাতে রূপার বালা, কোমরে গোট, পায়ে বাঁক-মল; কাহারও প্রকোষ্ঠে কালো চুড়ির গোছা; কাহারও কানে পাশা, নাকে নথ, গলায় দানা; কাহারও সীমস্তুর সিন্দুর অতি স্থলাকারে মস্তকের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত প্রসারিত; কাহারও মাথার খোঁপাটি গম্বুজাকৃতি, তাহার উপর দুটি রূপার ‘পুঁটে’; কপালে টিপ, নয়নে কাজল। পুরুষ ও রমণীরা দলে দলে চলিতেছে, হাসিতেছে, গল্প করিতেছে—যেন মনে স্থখের সীমা নাই, উৎসাহের অন্ত নাই। ভাবিলাম, কত অল্পে ইহারা সুখী, কিন্তু সে সুখও কত পরিমিত!

আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, কতকগুলি বোষ্টম ও ফকীর মেলা দেখিতে যাইতেছে; বোধ হয়, ভিক্ষা-সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে আছে। বোষ্টম বাবাজীদের লাজে-বাঁধা এক একটি ‘বোষ্টুমী’; ইহারা সংসারত্যাগী, কিন্তু সেবাদাসী ভিন্ন এক পা-ও চলিতে পারে না! এ অঞ্চলের মেলাস্থলে অসংখ্য নেড়ানেড়ীর সমাগম হয়; ভেক না লইলে ভিক্ মিলে না, এই প্রচলিত প্রবাদানুসারেই বোধ হয় বাবাজীরা ঘটা করিয়া সাজ-সজ্জা

করিয়াছে। কাঁচা পাকা দাড়ী আবক্ষলব্ধিত; কাহারও কাহারও দাড়ীর অগ্রভাগে গেরো দেওয়া; দীর্ঘ কেশগুলি মাথার সম্মুখে চূড়াকারে বাঁধা; কেহ কেহ সেই চূড়ায় এক একটি কৃষ্ণচূড়া ফুল গুঁজিয়াছে; অঙ্গে দীর্ঘ আল্‌থেল্লা—পৃথিবীর সকল রঙ্গের বস্ত্রের টুকরাই সেই আল্‌থেল্লায় বর্তমান! হাতে ‘গাব্‌গুবাব্‌গুব’ যন্ত্র; পায়ে নুপুর। বাবাজীদের সেবাদাসীরাও বেশ সাজ করিয়াছে;—কাহারও হাতে রূপার চুড়ি, কাহারও হাতে রূপার বালি বা কাচের চুড়ি, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি, নাকে রসকলি, দাঁতে মিশি, মুখে হাসি, হাতের খঞ্জনীতে কচিৎ ঘা পড়িতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে বাবাজীদের পায়ের নুপুর রণু রণু বাজিয়া উঠিতেছে! বৈষ্ণবীরা পানের সঙ্গে খসান চিবাইতে চিবাইতে ও গল্প করিতে করিতে চলিয়াছে।

এ অঞ্চলে মুসলমান ফকীর একান্ত বিরল। আমি যে সকল ফকীরের কথা বলিলাম, তাহারা দরবেশ বা বাউল। তাহাদের ললাটে তিলক, কণ্ঠে ফুল মালা, সেই মালায় ফটক, পদ্মবীজ, প্রবাল, রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি নানা সামগ্রী সন্নিবিষ্ট; ডোর-কোপীন ও বহির্বাসের উপর গেরুয়া রঙ্গের আল্‌থেল্লা, কাঁধে ঝুলি, হাতে লাঠা বা ‘কিস্তি’ (দরিয়াই নারিকেলের মালা)। দুই চারিটা খাঁটা গোঁসাই-গোবিন্দকেও চলিতে দেখিলাম। বর্তুস উদরটা তাহাদের আগে আগে চলিয়াছে; কটিতে কোপীনের উপর শুভ্র বহির্বাস আঁটা, মুণ্ডিত মস্তকে স্থল আর্কফলা, ললাটের উর্দ্ধদেশে দুইপাশে ‘রাধাকৃষ্ণ’ নামাক্তিত ছাপা। উভয় বাহুতে, বক্ষঃস্থলে, উভয় পঙ্করে সীতারাম, মদন-মোহন, গোপীনাথ প্রভৃতি নানা নামের ছাপা; কণ্ঠে স্থল তিন কণ্ঠী তুলসীর মালা, রূপার আংটায় বৃহৎ হরিনামের ঝোলাটি সেই মালাদামে ঝুলিতেছে; বাবাজীদের দাড়ী-গৌক-বিষর্জিত মুখে শাস্তি ও সন্তোষ সুপ্রকাশিত। প্রথর রৌদ্রে ও পথশ্রমে বাবাজীদের সর্বাপ্রকার ঘর্ম্মাক্ত; ঘর্ম্মে

ললাটের তিলক ও অঙ্গের ছাপা গলিয়া ধারা বহিতেছে ! ধররবিতাপে বাবাজীরা কিছু কাতর ।

পথটির অনেক স্থলই ছায়াচ্ছন্ন । পথের দুই ধারে মধ্যে মধ্যে আম কাঁটালের গাছ, জামগাছ, তেঁতুলগাছ, বট পাকুড়ের গাছ ; জেলা বোর্ড এই সকল বৃক্ষের অধিকারী ; শান্ত পথিক কেবল ছায়ার অধিকারী ! আজ দেখিলাম, শত শত পথিক এই সকল বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করিতেছে,—স্বৈদজলে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত । পথিপ্ৰান্তে জামগাছে গুচ্ছ গুচ্ছ কাল জাম পাকিয়া রহিয়াছে । পিপাসার্ত্ত বালক ও পল্লী-যুবকের দল পিপাসা-শান্তির জন্ত জামগাছে উঠিয়া জাম খাইতেছে ; কোনও সঙ্গী-বালক গাছে উঠিতে না পারায় বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া ছুটি পাকা জাম চাহিলে—কেহ এক থোকা অর্দ্ধপক ‘মাছরাঙ্গা’ জাম নীচে ফেলিয়া দিতেছে ; কেহ ততদূর বদান্ততার পরিচয় দেওয়াও অনাবশ্যক মনে করিয়া জাম খাইয়া তাহার অঁটিগুলি প্রার্থীর মস্তকে নিক্ষেপ করিতেছে !

বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছে । রৌদ্রের উত্তাপ ইহারই মধ্যে অত্যন্ত দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে । গাড়ীর মধ্যে গুইয়া থাকিতে আমাদের কষ্টবোধ হইল, গাড়ী হইতে একবার নামিলাম ; কিন্তু সেই রৌদ্রপ্রতাপ পথে পদব্রজে অগ্রসর হওয়া আরও কঠিন বোধ হইল ; অগত্যা পুনর্বার গাড়ীতে উঠিলাম । গাড়োয়ান আশ্বাস দিল, “আর বাবু ! আসো পড়েছি, দণ্ড-দুই সবুর করেন ; কোশখানিক ভুঁই পাড়ি দিতি পাল্লিই কাম হাসিল ।”

কিন্তু পথ ত আর শেষ হয় না ! পাঁচ ছয় ক্রোশ আসিয়াছি, এখনও এক ক্রোশ ? এ দিকে গাড়ীর বলদের গতি ক্রমেই মন্ডর হইতে মন্ডরতর হইতেছে । তাড়াতাড়িতে গাড়ীর চাকার তেল দেওয়া হয় নাই,

গাড়ী ‘কাঁ’ ‘কোঁ’ শব্দে অতি ধীরে চলিতে লাগিল। আমাদের সম্মুখে আট দশখানি গাড়ী ; পশ্চাতেও দশ পনেরখানি চলিতেছে। এই সকল গাড়ীতে চাপিয়া বিভিন্ন পল্লী হইতে গ্রামবাসীরা মেলা দেখিতে যাইতেছে। আমাদের অগ্রে যে সকল গাড়ী চলিতেছিল, তাহাদের চক্ৰোৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশি বায়ুপ্রবাহে আমাদের চোখে মুখে উড়িয়া পড়িতে লাগিল। মাথার অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে, চুলের মধ্যে মাটির স্তর পড়িয়া গেল! আমার সঙ্গী উকীল বন্ধুটি কিছু অতিরিক্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন,—তিনি তোয়ালে দিয়া পুনঃ পুনঃ মাথা ঘষিতে ও মুখ মুছিতে লাগিলেন, এবং “কি কুকর্মান্বই করা গিয়াছে! এমন স্থানে কি ভদ্রলোকে আসে?” ইত্যাদি বাক্যে মানসিক অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার এই আক্ষেপোক্তিতে গাড়োয়ানদের ক্রক্ষেপ নাই! যতই তাহারা মেলাস্থলের সন্নিকটবর্তী হইতে লাগিল, তাহাদের আনন্দ ও উৎসাহ ততই বর্দ্ধিত হইল; তাহারা ‘পাল্লাপাল্লি’ করিয়া গাড়ী চালাইতে লাগিল। পশ্চাতের অনেক গাড়ী আগে গেল, সম্মুখের কোনও কোনও গাড়ী পিছাইয়া পড়িল। এইরূপ ‘গাড়ী-দৌড়ে’ যে সকল গাড়োয়ান হঠিয়া গেল, বিজয়ী গাড়োয়ানেরা স্থূল রসিকতায় তাহাদিগের অক্ষমতাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। পরাজিত গাড়োয়ানেরা সম্মুখে বুঁকিয়া-পড়িয়া দুই হাতে বলদ-শুগলের লেজ ডলিয়া, ও তাহাদের তলপেটে পদতাড়না করিয়া চুম্‌কুড়ি ছাড়িয়া বলিতে লাগিল,— “আগে চল, বাবান্‌ ডা!” একজন গাড়োয়ান তাহার অগ্রগামীকে পশ্চাতে ফেলিবার অভিপ্রায়ে সম্মুখস্থ গাড়ীর ‘পাশ কাটাইয়া’ যাইবার চেষ্টা করিল; পথ তেমন প্রশস্ত নহে, পথের পাশেই বর্ষার জলনিকাশের ‘নয়জুলি’ ;—‘দড়-বড় দড়-বড়’ করিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে বলদ ছুটী ঝাঁক সামলাইতে পারিল না, গাড়ী ছড়মুড় শব্দে নয়জুলির মধ্যে পড়িয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে

আরোহী চীৎকার করিয়া উঠিল, “ওরে বেটা হারামজাদা ! শেষে কি গর্ভে ফেলে খুন করবি ?” তাহার সহযাত্রী আর্তনাদ করিয়া বলিল, “ওরে বাবা রে ! মাথাটা ছাতু হয়ে গিয়েছে রে !”—আমরা গাড়ী থামাইয়া, কি বিল্ডট ঘটিল দেখিবার জন্ত নামিলাম। আহত আরোহিণীকে তৎক্ষণাৎ গাড়ীর ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করা হইল। এই গাড়ীর আরোহিণী শ্রামনগরের ‘কুঠি’র নায়েব প্রাণরক্ষা বিশ্বাস ও তত্ত্ব শ্রালক (উক্ত কুঠির আমীন) কুড়োরাম মণ্ডল,—মেলা দেখিতে যাইতেছিল। গাড়ীর হৈ-এর ‘বাতা’র গুঁতা লাগিয়া কুড়োরামের কপাল খানিক কাটয়া গিয়াছিল ! কুড়োরামের মুখভঙ্গী দেখিয়া—তাহার বিপদে সহানুভূতি প্রকাশ করিবে কি, দর্শকেরা হাসিয়াই অস্থির ! কুড়োরাম গাড়োয়ানকে ‘শ্রালক’ সম্বোধন করিয়া বলিল, “কপাল কাটলো, তাতে ছুঁখু নেই ; রক্তে যে আমার বারো টাকা দামের গরদের চাদরখানা নষ্ট হয়ে গ্যালো, তার কি ? এমনই ক’রে কি গাড়ী হাঁকায় ? একবার কুঠিতে ফিরে চ, ‘শ্রামচাঁদে’র চোটে তোকে শাস্ত করাবো।” গাড়োয়ানেরা ধরাধরি করিয়া গাড়ীখানি নয়জুলি হইতে টানিয়া পথে তুলিল। কুড়োরাম আমীন আর গাড়ীতে উঠিল না, অবশিষ্ট পথটুকু হাঁটিয়া চলিল।

বেলা প্রায় এগারটার সময় আমরা মুকুটিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলাম। গ্রামখানি ক্ষুদ্র। জমীদারের কাছারীবাড়ী এবং গ্রাম্য গৃহস্থগণের আবাসগৃহ—সকলই খড়ো ঘর। গৃহগুলির প্রাচীর মৃত্তিকা-নির্মিত ; ক্ষুদ্র বৃহৎ—দোচালা হইতে আটচালা পর্য্যন্ত সকল গৃহই বেশ পরিস্কৃত-পরিচ্ছন্ন,—গোশালাগুলিও। কোনও বাড়ীতে ছ’খানি কোন বাড়ীতে তিন চারিখানি চালা-ঘর। ঘরগুলি বিচ্ছিন্ন, দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত। —প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর আগিনাটুকু বৃক্ষলতায় সমাচ্ছন্ন ; কাহারও

ঘরের কানাচেতে একটা আমগাছ, কোনও ঘরের কোণে একটি অনতিবৃহৎ কাঁটাল গাছ। গাছের গোড়ায় শুক পাতা দিয়া ‘ওম্ বাঁধা’; সরু বৌটার কলসী বা ধামার মত মোটা মোটা কাঁটাল ঝুলিতেছে। কাহারও চালে লাউ কুমড়ার গাছ উঠিয়াছে; কাহারও ঘরের সম্মুখে খানিকটা জমি জাক্রীর বেড়া দিয়া ঘেরা; বেড়ার মধ্যে তামাক, বেগুন ও শাকের চারা। কাহারও উঠানে অল্পটুকু ডাব গাছের নীচে একটা পয়স্বিনী গাভী ‘খুঁটা’য় আবদ্ধ থাকিয়া নাক মুখ ডুবাইয়া নান্নায় ‘জাব’ খাইতেছে; ছদ্মপানে পরিতৃপ্ত লাল ‘নাল্কি’ বাছুরটি অদূরবর্তী নিবিড়-পত্র গাবগাছের ছায়ায় গুইয়া ঘুমাইতেছে। গৃহস্থের ঘরের পাশে ছাই-গাদা; একটা কালো কুকুর তাহার উপর কুণ্ডলী পাকাইয়া গুইয়া উদাসীনভাবে গ্রামের পথে যাত্রি-সমাগম নিরীক্ষণ করিতেছে। মলিনবস্ত্রপরিহিত চাষার ছেলে মেয়েরা সারি বাধিয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া এক দুই তিন করিয়া গরুর গাড়ী গণিতেছে; গৃহস্থ তাহার পিঁড়ায় বসিয়া থেলো ছঁকায় পরম পরিতৃপ্তিভরে তামাক টানিতেছে, এবং এবার মেলায় কিরূপ যাত্রি-সমাগম হইবে, কত দোকান আসিয়াছে, কেমন ঘটাইতেছে, ইত্যাদি অপরিহার্য্য বিষয়ের আলোচনায় সঙ্গিগণের কর্ণে সুধাবর্ষণ করিতেছে।

বেলা এগারটার পর জগন্নাথের ঘরের সম্মুখে আসিয়া গুনিলাম, দেবতার স্নানযাত্রা অনেকক্ষণ পূর্বে শেষ হইয়া গিয়াছে! একটি ক্ষুদ্র ইষ্টকালর তাঁহার বাসগৃহ; স্বতন্ত্র মন্দিরের অস্তিত্ব নাই। মুকুটিয়া গ্রামের জগন্নাথ এই গৃহে বিরাজ করেন। পুরোহিত ঠাকুর দিনান্তে একটা ফুল দিয়াও দারুভ্রক্ষের অর্চনা করেন কি না সন্দেহ; কিন্তু স্নানযাত্রার দিন তাঁহার আদরের সীমা থাকে না! মুকুটিয়ার জগন্নাথ রথের দিন সমারোহে অভিনন্দিত হন না; স্নতরাং বলিতে হয়, স্নানযাত্রাই

তাহার ‘স্পেশাল’ পরব ; যেমন—‘জন্মের মধ্যে কর্ম নিম্নর চৈত্র
মাসে রাস !’

স্নানযাত্রার পর ঠাকুরের ভোগ শেষ হইয়াছে ; জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা
স্ব স্ব আসনে বিশ্রাম করিতেছেন। যাত্রীরা দলে দলে বিগ্রহত্রয়কে প্রণাম
করিয়া মেলা দেখিতে যাইতেছে ; অনেকে প্রণামীও দিতেছে।—প্রণামী
সংগ্রহের লোভে পুরোহিতেরা আজ ঠাকুরঘর বন্ধ করেন নাই।

গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে ভৈরব ‘নদ’ অবস্থিত। ভৈরবের তীরেই মেলা
বসিয়াছে। সেদিকে লোকজনের বসতি নাই। স্থানটিকে নদীর ‘দেওয়াড়’
বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। পূর্বকালে ভৈরব ‘নদ’ নামেই পরিচিত ছিল।
নবাব-সৈন্তেরা এই নদ দিয়া যশোহর অঞ্চলে যুদ্ধযাত্রা করিত। তখন
বাঙ্গলায় ধন ছিল, ধান ছিল, মান ছিল ; এখন তাহার কিছুই নাই ! এখন
ধনের পরিবর্তে বন, ধানের পরিবর্তে পাট, এবং মানের পরিবর্তে লাঞ্ছনা
বঙ্গের ভূষণ হইয়াছে। বঙ্গের অধিকাংশ নদীর যে অবস্থা—ভৈরবেরও এখন
সেই অবস্থা,—বোধ করি, তাহার অপেক্ষাও দুরবস্থা হইয়াছে। মোহনা
বন্ধ হওয়ায় নদী মজিয়া গিয়াছে। নদীতে এক-বুক মাত্র জল, তাহাও
শৈবালে, টোপাপানায় ও পক্ষে পরিপূর্ণ। নদীর উভয় তীরে শস্যক্ষেত্র,
কোথাও গহন বন ;—ব্যাঘ্র, বরাহ, ম্যালেরিয়া, ওলাবিবি দীর্ঘকাল হইতে
এ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেছে। যাহাদের অদৃষ্টে দুঃখভোগ অপরিহার্য,
তাহারাই কিছুকাল ইহার মধ্যে কোনও রকমে বাঁচিয়া থাকে ; কিন্তু
তাহাদের উদরে অন্ন নাই, দেহে বস্ত্র নাই, মনে সুখ শাস্তি নাই।

তথাপি সংবৎসরের পরে গ্রামখানিতে আজ নূতন উৎসাহের সঞ্চার
হইয়াছে। বর্ষব্যাপী জড়তা পরিহার করিয়া সকলেই কয়েকদিনের উৎসব-
নন্দকে তাহাদের সঙ্কীর্ণ জীবনপথের পাথর-রূপে গ্রহণ করিবার জন্ত

ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে ! প্রভাত হইতে এ পর্য্যন্ত সহস্রাধিক লোক মেলাস্থলে সমাগত হইয়াছে। আট দশ ক্রোশ দূরবর্তী গ্রাম হইতে পল্লীবাসীরা মেলা দেখিতে আসিয়াছে, এখনও আসিতেছে।

দোকান পশারীও বড় কম আসে নাই ; দক্ষিণে কৃষ্ণনগর ও পশ্চিমে বহরমপুর,—নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের এই প্রধান নগরদ্বয় হইতেও বিস্তর দোকান আসিয়াছে। দোকানদারেরা সারি সারি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থায়ী চালা তুলিয়া তাহার মধ্যে দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। ছ’দিকে দোকান, মধ্যে সঙ্কীর্ণ পথ। এক এক রকম জিনিসের দোকান এক এক দিকে। কোথাও কাপড়ের দোকান, কোথাও বাসনের দোকান, কোথাও নানাবিধ মনোহারী দ্রব্যের দোকান। দীর্ঘ তিন বৎসরের চেষ্টার পর পশ্চিম বঙ্গের দুর্গম পল্লীতে এই মেলা উপলক্ষে ‘স্বদেশী’র যে অবস্থা দেখিলাম, তাহা অত্যন্ত শোচনীয়,—হৃদয়বিদারক ! দেখিলাম, রাশি রাশি বিদেশী পণ্য দ্রব্য,—জর্মানীর আমদানী চীনে মাটির শিবভূগা কালী গণেশ হইতে মাঝেপাঠারের কাপড় পর্য্যন্ত সকল দ্রবাই সোৎসাহে বিক্রীত হইতেছে ! দুই তিনটি দোকানে নানা আকারের সুন্দর সুন্দর পাথরের বাটী, থোরা, ডিস্ প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ সজ্জিত আছে ; সেখানে দুই দশজন বর্ষিয়সী পল্লীনারী ভিন্ন অন্য ক্রেতা দেখিলাম না ! তাহারাই পাথর ও থোরা-খুরীর দর করিতেছে ; কিন্তু বিলাতী কাচের ও এনামেলের বাসনের দোকানে অত্যন্ত ভিড়। পল্লীগ্রামের ‘ভাই-সাহেব’রা ও পল্লীবাসী নিম্নশ্রেণীর হিন্দু যাত্রীরা পরমানন্দে বিলাতী কাচের ও লোহার বাসন কিনিতেছে ; শত শত লোকের হাতে কাচের বাটী, এনামেলের ডিস্, পেয়লা, গামলা !—আমার একটি বন্ধু একজন মাতব্বর মুসলমান যাত্রীকে কয়েকটি এনামেলের বাটী কিনিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাপু ! তোমার দেশের এমন সুন্দর পিতল

কাঁসার বাসন থাকিতে এই সকল বাজে বিলাতী জিনিস কেন কিনিলে ?” মুসলমান মাতব্বরটি তাহার সুদীর্ঘ দাড়ীতে অঙ্গুলীচালন করিয়া অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর শ্রীমুখবিনিঃসৃত পলাণ্ডু-গন্ধে বায়ুমণ্ডল সুবাসিত করিয়া সদন্তে বলিল, “আমার খোস্ !”

এত রকম সুন্দর সুন্দর পিতল কাঁসার বাসন আমদানী হইয়াছে যে, দেখিলে চক্ষু জুড়ায় ; কিন্তু তাহা ক্রয়ের জন্ত লোকের তেমন আগ্রহ দেখিলাম না । কৃষ্ণনগর হইতে মাটির পুতুলের দোকান আসিয়াছে ; নানা রকম সুন্দর সুন্দর পুতল ; কিন্তু বিলাতী সাদা কাচের পুতলই অনেক যাত্রীর হাতে দেখিলাম । জুতার দোকানে চাষার ভয়ঙ্কর ভিড় ; পেটে ভাত না থাক, পায়ে জুতা চাই ; নিত্য তাহাদের পিঠে যে পয়জার পড়িতেছে, তাহাই যেন যথেষ্ট নহে !

বিলাতী ছাতি ভয়ঙ্কর সস্তা ; স্বদেশী ছাতি বলিয়াই তাহা বিক্রীত হইতেছে ! তাহার কক্ষির বাঁট ভিন্ন আর কিছুই স্বদেশীয় নহে ;—তাহার কাপড়, শিক, প্রিং, এমন কি, ছাতি জড়াইয়া বাঁধিবার ফিতাটুকু ও বোতামটা পর্য্যন্ত বিলাতী ! বর্ষা আসন্নপ্রায়, সূতরাং দলে দলে চাষারা গেঁজে হইতে সিকি, ছয়ানি, আধুলি বাহির করিয়া, কেহ বা ট্যাঁক হইতে একটি টাকা খুলিয়া ছাতি কিনিতেছে । পূর্বে পূর্বে দেখিতাম, কোথাও মেলা বসিলে সেখানে তালপত্রের খাঁটি স্বদেশীর আতপত্র প্রস্তুত হইত ; চারি পয়সা দিয়া পল্লীবাসীরা এক একটা তালপাতার ছাতি কিনিত । একটা তালপাতার ছাতি পাঁচ বৎসরেও নষ্ট হইত না ; কিন্তু এখন আর তালপাতার ছাতিতে মন উঠে না ; অন্ততঃ পক্ষে ঘটা-বাটা বাঁধা দিয়াও মেলায় বারগুণা পয়সার প্রিংএর ছাতি কিনিতে হইবে ! রাজপুরুষেরা কেন না বলিবেন, “তোমাদের দেশের চাষার পর্য্যন্ত পায়ে জুতা, মাথার

ছাতা ;—‘ইণ্ডিয়া’র Prosperityর সীমা নাই !’—দুঃখের কথা বলিব কি, আমাদের গাড়োয়ানটা পর্য্যন্ত একটি পয়সা চাহিয়া লইয়া তামাক থাইবার জন্য দেশলাই কিনিল ! তাহাকে জিজ্ঞাসা করা গেল, “চক্ৰমকি রাখিস্ না কেন ?” সে বলিল, “আধ পয়সার দিৱেশালুয়ে দশ দিন তামাক থাওয়া চলে ;—সোলা রে, ঠুক্‌নী রে, পাথর রে ! এ সব জঞ্জাল কে ঘাড়ে নিয়ে বেড়ায় ?” দেশের লোকের রুচি কিরূপ বিগ্‌ড়াইয়াছে দেখুন ; দেখিলাম, যে সকল লোক ক্ষেতে কৃষাণী করিয়া দৈনিক আট পয়সা উপার্জন করে, বা ‘খোরাক-পোষাক’ সহ পাঁচ সিকা বেতনে গাড়োয়ানী কিংবা বাথালী করে, তাহারাও মেলা দেখিতে আসিয়া দুই পয়সা দিয়া এক এক বাস বিলাতী সিগারেট কিনিতেছে, এবং তাহা মুখে গুঁজিয়া পরম নিশ্চিন্ত মনে ধোঁয়া উড়াইতেছে ! আমার পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটি এই শ্রেণীর সিগারেট-ধূমপায়ী একটি ‘মাল্‌তের পো’কে বলিলেন, “আধ পয়সার তামাক কিন্লে পাঁচ সাত বার থাওয়া চলে, তা না কিনে সিগারেট থাও কেন ?” ‘মাল্‌তের পো’ এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া দশনকাস্তিতে আমাদের ননের ভাস্তি ঘুচাইয়া বলিল, “বলেন কি, কর্ত্তা ! তামাক রাখ, টিকে রাখ, কল্‌কে রাখ ; তামাকের ফাঁসাদ কত ? আর এ ক্যানোন মজা, মুখে গুঁজে দিৱেশালুই ধরাতে না ধরাতে তামাকের তেপ্পা মেটে !”

কাপড়ের দোকান অনেক দেখিলাম। চাদরা সেখানে বোদ্দাই কাপড় চাহিতেছে, কিন্তু দোকানদারেরা বোদ্দাই বলিয়া অসঙ্কোচে বিলাতী চালাইতেছে ! পল্লীগ্রামে স্বদেশীর এইরূপ দুর্গতি দেখিয়া মৰ্ম্মাহত হইলাম।

লোহা-লকড় হইতে ‘কাঁচকেচের পাটী’ পর্য্যন্ত কত জিনিসের দোকান দেখিলাম, তাহার সংখ্যা নাই ! ষিষ্টানের দোকানও শতাধিক। মধ্যাহ্নে স্কাথ তাড়নায় যাত্রীরা এই সকল দোকানের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে।

লুচি-কচুরীতে সকলের ক্ষুধা দূর হইতেছে না, অনেকে নূতন মাটির কলসীতে নদী হইতে জল আনিয়া কলাপাতায় চিঁড়া-দৈএর কলার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে; আম, কাঁটাল, কলা, গুড় প্রভৃতি ফলারের উপকরণ। কুমারের দোকানে মাটির হাঁড়ী কলসী পৰ্কতপ্রমাণ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে! কাঁটাল-বিক্রেতাগণ ছোট বড় হাজার হাজার কাঁটাল গরুর গাড়ীতে খাঁচায় পুরিয়া বিক্রয় করিতে আনিয়াছে;—সেই কাঁটালের স্তূপ দেখিয়া মনে হয়, এত কাঁটাল কি নিবে কে? কিন্তু ক্রেতার অভাব নাই। এবার পল্লী-অঞ্চলে প্রচুর কাঁটাল ফলিয়াছে; যে গাছে কখন কাঁটাল ধরে না, তাহাতেও এবার কাঁটাল দেখা যাইতেছে। দুই চারি পয়সায় এক একটা কাঁটাল পাওয়ায় অনেক গরীব লোক এই অন্নকষ্টের দিনে কাঁটাল খাইয়াই দিনপাত করিতেছে।

দেখিলাম, আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠানও এখানে উপেক্ষিত হয় নাই। সৰ্ব্বপ্রথমেই ‘কুপন’ খেলার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। ইহা একপ্রকার জুয়াখেলা; এক পয়সার বাজি ধরিয়া যদি ‘জিত’ হয়, তাহা হইলে কয়েক পয়সা লাভ হয়; যদি ‘হার’ হয়, তবে সেই পয়সাটিই যায়। চাষার ছেলেরা দুই চারি আনা হাতে লইয়া খেলিতে বসিয়াছে; কেহ দুই এক টাকা জিতিয়া সরিয়া পড়িতেছে; কেহ বা কষ্ট-সঙ্কিত অথ হারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিতেছে। কুপন-খেলোয়াড়েরা এমন কৌশলে খেলা করে যে, প্রথমে অল্প লোককে কিঞ্চিৎ লাভ দেখাইয়া শেষে সৰ্ব্বস্ব অপহরণ করে। লালপাগড়ীর দল এই অবৈধ খেলা চলিতে দেখিয়াও তাহা বন্ধ করিতেছে না! রূপচাঁদের মহিষায় কি না সম্ভব?

একটা ফাঁকা জায়গায় নাগরদোলা ও কাঠের ঘোড়া বন-বন শব্দে ঘুরিতেছে; চাষার দল—ছেলে বুড়ো—তাহাতে উঠিয়া বসিয়াছে

কোনও কোনও রসিক নাগর পল্লী-বারবিলাসিনীকে পাশে বসাইয়া নাগর-দোলায় ছলিতেছে! দলে দলে লোক উৎসবের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া সেখানে সমবেত হইয়াছে। নিকটস্থ পানের দোকানে নানা ভঙ্গীতে শিশিবোতল সাজাইয়া বিভিন্ন পল্লীর ‘বয়্যাটে’ ছোকরার দল ‘এক পয়সায় চার চার গোলাপী খিলি’ বেচিতেছে।

বারবিলাসিনীগণের ‘দোকান’ এ অঞ্চলের মেলার প্রধান বিশেষত্ব। মেলায় ইহাদের সমাগম যত অধিক হয়, জমীদারদের লাভও তত অধিক হইয়া থাকে; এইজন্ত তাঁহারা মেলা-ক্ষেত্রের একটি অংশ ইহাদের জন্য ঘিরিয়া রাখেন। ইহারাই মেলার প্রধান কলঙ্ক। ইহাদের প্রবেশাধিকার না থাকিলে, শুনিয়াছি, মেলা জমে না! এক একটি রূপজীবিনী তিন-চারি হাত লম্বা ‘টোঙ্গে’ রূপের দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। মেলার একপ্রান্তে এইরূপ শত শত টোঙ্গ! অর্থোপার্জনের আশায় এখানে নানা পল্লী হঠতে তিন শতাব্দিক রূপজীবিনীর সমাগম হইয়াছে। কাহারও পায়ে স্থূল কাঁসার মল, প্রাকোষ্ঠে রূপার খাড়ু বা বালা, নাকে নোলক বা নখ; কাহারও অঙ্গে তই চারিখানি গিল্টির গহনা; পরিধানে বোকাই শাড়ী, ঢাকাই শাড়ী, গুলবাহার শাড়ী, নীলাঙ্গরী, বালুচরী, পূপছায়া চেলী। শিকারের সন্ধানে অনেকে চারিগাছা মলের বন্ধনিত গ্রাম্য চাণীদের ও পাইক-পেছান্দা নগদীগণের তৃপ্ত চিত্ত উদ্ভাস্ত করিয়া মেলার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

মেলাস্থলে নেড়া-নেড়ী, দরবেশ, নানা শ্রেণীর ককির, বোষ্টম, বোরগী অনেক জুটিয়াছে; তাহারা এক একটি স্থানে আড্ডা লইয়া গান জুড়িয়া দিয়াছে। বোষ্টমীদের কাঁসার মতন খন্থনে মিষ্টি কর্তব্যের সহিত বাবাজীদের কর্কশ মোটা সুর মিলিয়া বিচিত্র স্বরতরঙ্গ উৎপন্ন করিতেছে! ইহাদের প্রধান বাস্তব্য ডুপি, খঙনী, কুপুয়, ও গোপীঘড়

‘গাব্‌গুবাব্‌’। এক এক আড্ডায় এক এক রকম গান চলিতেছে, সেখানে লোক ‘ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে’; মুহমুহঃ অজস্র গাঁজা চলিতেছে। গাঁজার গন্ধে কাহার সাধ্য সে দিকে অগ্রসর হয় ?

এক স্থানে একটা ছোট তাম্বু ; তাম্বুর সম্মুখে একখানি লাল কাপড়ে লেখা আছে, “দি গ্রেট নেশানাল্‌ ছারকাচ্‌!” তাহার অদূরে “অন্তাশেচার্জ বন্দেমাতরম্‌ মেজিক্‌!” ‘নেশানাল্‌’ ও ‘বন্দেমাতরম্‌’ শেষে বেদের বানব-নাচের ও ভেল্‌কী-খেলার বিজ্ঞাপনে পর্য্যন্ত আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ‘কিমার্শ্যামতঃপরম্‌?’ কিন্তু হঠাৎ অত্যন্ত বাড়াবাড়ির এইরূপই পরিণাম : আক্ষেপ করিয়া ফল নাই। দর্শকেরা এই বস্ত্রাবাসের সম্মুখে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বস্ত্রাবাসের দ্বারপ্রান্তে একটা লোক কাল গেঞ্জিফর গায়ে দিয়া, বানরের মুখোন্‌ মুখে আঁটিয়া, চাদরের লেজ কাঁধে ঝুলাইয়া নান ভঙ্গীতে নাচিতেছে ; আর একজন জীর্ণ ভাঙ্গা টুলের উপর বসিয়া একটা ক্ষুদ্র ‘হারমোনিয়মে’ সুর দিয়া রাসভবিনিন্দিত সুরে গায়িতেছে, “মনাগুন জ্বল্‌ছে দ্বিগুণ, কর্‌লে কি গুণ, ঐ বিদেশী!” ‘ছারকাচ্‌’ দেখিয়া মনাগুনের জ্বালা নিবাইবার জন্য চাষারা দলে দলে দুই পরসাদক্ষিণা দিয়া তাম্বুর ভিতর প্রবেশ করিতেছে। “অন্তাশেচার্জ বন্দেমাতরম্‌ মেজিকে”র দর্শনী কিন্তু এক পরসার অধিক নহে।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া বড় পরিশ্রান্ত হওয়া গেল। বেলা দুইটার সময় একট ময়রা-দোকানে জলযোগ শেষ করিয়া মেলাস্থল হইতে বিদায়গ্রহণের আয়োজন করিতেছি, এমন সময় আকাশে হঠাৎ একখানি মেঘ উঠিয়া রম-রম শব্দে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ‘ওনিয়াছিলাম, নানষাত্রার দিন বৃষ্টি হইবেই, কিন্তু হঠাৎ এ ভাবে বৃষ্টি আসিবে, কে ভাবিয়াছিল ? বৃষ্টি শীঘ্র থামিল না, মেঘরাশি ক্রমে আকাশের চারিদিকে স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল।

চারিদিক্ অন্ধকার করিয়া মুঘলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। দোকান-
দারেরা দোকানের ঝাঁপ ফেলিয়া দিল। দর্শকগণ যে যেখানে পারিল,
আশ্রয় লইল; অনেকে আশ্রয়হলের অভাবে গাছতলায় দাঁড়াইয়া
ভিজিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই উৎসবক্ষেত্রে নিস্তব্ধ
শূন্যের আকার ধারণ করিল; কেবল কন্-কন্ জলের শব্দ, আর মুহূর্ভূহঃ
মেঘগর্জন! আমরা নিকপায় হইয়া জমীদারের কাছারী-ঘরে আশ্রয়
লইলাম;—সেখানে তখন একদল দরবেশ দর্শকবন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া,
গোপীযন্ত্রের সহিত তাহাদের স্থল কণ্ঠ নিলাইয়া, নানাভাবে অঙ্গভঙ্গী
করিয়া মাথা নাড়িয়া গায়িতেছিল,—

“আপন দেল-কেতাবসে চুড়ে লে।

মুরসিদ আমার কোন্‌খানে বিরাজে রে ॥

(মুরসিদ আমার কোন্‌ শিররে জাগে রে!)

ঘরখানি বান্দো বান্দা, দুয়ারখানি ছান্দো,

আপনি মরিয়ে বাবা, মিছে পরের লেগে কান্দো রে!

আঠারো মোকামের মধ্য জলে হার সরে রে,

তিল-প্রনাণ জায়গা বান্দা আঠারো সজ্জা পাড়ে রে!

আমার গোদার দোস্ত মহম্মদ নবি,

কোন্‌খানে নেমাজ করে রে!

আসমান-জোড়া ফকীর রে ভাই! জমীন-জোড়া কৈথা,

এ সব ফকীর ন’লে পরে তার কবর হবে কোথা রে!

মুরসিদ আমার কোন্‌ শিররে জাগে রে!”



ବ୍ରହ୍ମସାହିତ୍ୟ ।

রথযাত্রা

—:~:—

গোবিন্দপুরের বাঁড়ুঘোরা বনিয়াদী বড়মাহুষ; কিন্তু এখন তাঁহাদের ভয়দশা। শুনিয়াছি, পূর্বকালে তাঁহাদের প্রত্যাপে 'বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাইত'! তাঁহাদের দেউড়ীর সম্মুখ দিয়া কেহ পাকী হাঁকাইয়া বাইতে সাহস করিত না। কোন অম্বারোহী এই দেউড়ীর সম্মুখস্থ রাজপথে আসিয়া পড়িলে, তাহাকে ঘোড়া হইতে নামিয়া দূরে গিয়া অশ্বে আরোহণ করিতে হইত; এবং তাঁহাদের লাঠিয়ালের ভয়ে নীলকর সাহেবেরা গোবিন্দপুরের চতুঃসীমার মধ্যে পদার্পণ করিত না, পাছে লাঠিয়ালেরা কোন ছলে তাহাদের অপমান করে।

বাঁড়ুঘো বাবুদের পুরাতন ভূত্যাগণ সন্ধ্যার পর গ্রামের মধ্যে দুই একটা স্থানে আড্ডা করিয়া এই সকল পুরাতন কথার আলোচনা পূর্বক সেকালের জ্ঞাত হা-হুতাস করে, এবং অনেকখানি তামাক পোড়ায়। পূর্বকালের সেই সকল প্রতাপশালী বাঁড়ুঘো বাবুদের হীনপ্রভ, পূর্ব-সম্পদ-গৌরব-চ্যুত বংশধরগণ এখনও পুরাতন চাল একেবারে ছাড়িতে পারেন নাই; গ্রামের মধ্যে দলাদলি বাধিলে তাঁহারা এক দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, এবং অপর দল অপদস্থ হইলে জীবন সার্থক মনে করিয়া থাকেন। কোন উপায়ে গ্রামস্থ লোকের ভয় ও ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিলে ইহাদের অনেকেই আপনাদিগকে প্রাতঃস্মরণীয় পূর্বপুরুষগণের

অপেক্ষা ভাগ্যবান মনে করেন ; কেবল যাঁহারা ইঁহাদের মধ্যে শিক্ষিত হইয়া প্রকৃত নম্রোত্তম লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ই স্ব-বংশের শোচনীয় অধঃপতনে আন্তরিক কষ্ট অনুভব করেন ।

গুনিয়াছি পূর্বকালে বাঁড়ুয্যে বাড়ী ‘বারো মাসে তেরো পার্কণ’ হইত । একে জমীদারীর আয় অধিক ছিল, বংশধরগণ মা ঘট্টীর কুপায় রক্তবীজের জায় ব্যাপকতা লাভ করিয়া প্রত্যেকে ছ’ কড়া ছ’ ক্রান্তির মালিকে পরিণত হয় নাই ; এক একটি কথ্যাবিদ্যায় তখন পাঁচ সাত সহস্র রজতমুদ্রা দক্ষিণা দান করিতে হইত না, এবং খোলাভাঁটির সভ্যতা তখনও পল্লী-অঞ্চলে অজ্ঞাত ছিল । তাহার উপর প্রজার অবস্থা ভাল ছিল, নির্ঝিয়ে রাজস্ব আদায় হইত ; টাকায় ঘোল সের তেল, আট সের ঘি পাওয়া যাইত, বারো আনায় একমণ উত্তম মিহি চাউল মিলিত, একটাকা ব্যয় করিলে ঘরে বসিয়া তিন মণ গম পাওয়া যাইত ; কাজেই ‘বাবুদের বাড়ী’ পূজাপার্কণ হইলে গ্রামের লোককে উন্নত জালিতে হইত না ; বাঁড়ুয্যে বাড়ীতেই সকলে মহাসমারোহে লুচি-মণ্ডায় উদয় পরিতৃপ্ত করিত । ধুমধামের ও অন্ত ছিল না । দুর্গোৎসবের সময় তাঁহাদের বাড়ীতে যে জাঁক হইত, তাহা দেখিয়া কবির দলের এক জন ওস্তাদ একবার নবমীপূজার দিন এই গানটা গায়িয়া একজোড়া শাল শিরোপা পাইয়াছিল,—

“সত্য যুগে সুরথ রাজা
করেছিলেন দেবীর পূজা,
ত্রৈতা যুগে রাম ;
কলিযুগে বিশ্বনাথে
সদায় হলেন ভাবানী

মরি, কি পূজোর ঘট।

গোবিন্দপুরে মহিষমর্দিনী।”

এখন সে সকল ধুমধাম আর নাই। পালোয়ানেরা দেউড়ীর সম্মুখে সকাল বেলা গায়ে মাটি মাখিয়া আর কুস্তি করে না; পাড়ে, দোবে, চৌবে, মিশির প্রভৃতি টিকিওয়াল দারোয়ানেরা সন্ধ্যাকালে দলবদ্ধ হইয়া সিদ্ধি ঘোঁটে না; অপরাহ্নে বাঁড়ুয়ো বাড়ীর বিস্তীর্ণ চত্বরে আর গৃহবাজ, লোটন, মুষ্টি প্রভৃতি নানাজাতীয় বিভিন্ন বর্ণের পারাবতের সলীল গতিভঙ্গী ও শস্তভঙ্গের দৃশ্য দেখা যায় না। মা কমলার অন্তর্দ্বানের সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দপুরের বাঁড়ুয়ো-বাড়ী হইতে সকল রকম ধুমধামই অন্তহিত হইয়াছে; কিন্তু দোল ও রথযাত্রার আজও কিছু কিছু ঘটা আছে। এই উৎসব একমাত্র বাঁড়ুয়ো পরিবারের নিজস্ব নহে, ইহা গ্রামবাসিগণের সাধারণ সম্পত্তি। বালকবালিকা হইতে বৃদ্ধ বৃদ্ধা পর্য্যন্ত গ্রামস্থ সকলেই এই উৎসব-উপলক্ষে আমোদে মত্ত হয়।

অনেক দিন আগে বাঁড়ুয়ো বাবুদের কাঠের রথ ছিল। একবার গ্রামে আগুন লাগিয়া বহুসংখ্যক গ্রামবাসীর গৃহাদি দগ্ধ হইয়া যায়; সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের দারুণ রথখানিও ব্রহ্মার কুক্ষিগত হয়, দেবতার সামগ্রী বলিয়া তিনি পক্ষপাত প্রদর্শন করেন নাই। তাহার পর অর্থ ও উৎসাহ,—বোধ করি এ উভয়েরই অভাববশতঃ আর কাঠের রথ নির্মিত হয় নাই। তদবধি প্রতি বৎসর বাশের রথ নির্মাণ করিয়া গৃহবিগ্রহ গোবিন্দদেবের রথযাত্রা চলিতেছে; কিন্তু প্রতি বৎসর রথের আকার ক্ষুদ্র হইতে বেক্রম ক্ষুদ্রতর হইতেছে, তাহাতে দীর্ঘকাল পরে ইহার সাকার অস্তিত্বের কতখানি অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা এখন কে বলিতে পারে?

বাহা হউক, দক্ষাবশিষ্ট কাঠের রথের চক্রগুলি, দুইটি কাঠনির্মিত অশ্ব, একটি সারথি ও কয়েকটি কাঠপুত্তলিকা অগ্নিস্থ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিল। সারা বৎসর তাহারা বাঁড়ুয্যে বাবুদের চণ্ডীমণ্ডপের প্রান্তবর্তী একটি অন্ধকারময় গুদামে বিশ্রাম করে; রথের দুই দিন পূর্বে সেগুলিকে গুদাম হইতে বাহির করা হয়। চক্রগুলি নবনির্মিত বংশরথে সংযুক্ত হইয়া থাকে, ঝুল ও ধলায় সমাচ্ছন্ন অশ্বদ্বয়ের দেহও রঞ্জিত হয়; এবং বর্ষব্যাপী তত্ত্বাবধানের অভাবে, কিংবা ছোট ছোট ছেলেদের উৎপাতে সারথির অথবা কোন পুত্তলিকার হস্ত পদ স্থানচ্যুত হইলে, সেই 'ডিস্লোকেশন'গুলির উপর 'ব্যাণ্ডেজ' জড়াইয়া, এবং তাহাদের দাড়ি গোঁফ ও মাথার চুল 'ভূষোর' কালি দিয়া আঁকিয়া, তাহাদিগকে রথে তুলিয়া বংশদণ্ডের সহিত দড়ি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

রথের দিন খুব সকাল হইতেই বাঁড়ুয্যে বাবুদের চর্মচটকা-সমাচ্ছন্ন দেউড়ীর নীচে গোটাকত ঢাক ঢোল ও কয়েকখানা কাঁশি অতি উচ্চরবে আপনাদিগের আগমনবার্তা ও রথের উৎসবকাহিনী সমস্ত পল্লীর মধ্যে ঘোষণা করিতে থাকে।

বাঁড়ুয্যেদের কাটা দেওয়াল-সংলগ্ন প্রকাণ্ড জীর্ণ দেউড়ীটার সম্মুখে আজ কি সমারোহ! বহুদিনের রোদ্ভদন্ধ, প্রাচীন, জীর্ণসংস্কারবর্জিত ধূসর প্রাচীর আঘাটের নবজলধারা-সম্পাতে শৈবাল-সমাবৃত হইয়াছে : সম্মুখে প্রকাণ্ড আঙ্গিনা। সকাল হইতেই সেখানে ছোট ছোট ছেলেদের হাট বসিয়াছে; কেহ নাচিতেছে, কেহ খেলিতেছে, কেহ কাহাকেও মারিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ বা ভালমানুষের মত রথের লাল চূড়ার দিকে চাহিয়া আছে। আজ স্কুল পাঠশালা বন্ধ; মা সরস্বতীর নিকট বিদায় লইয়া আজ সকল ছেলেই নিশ্চিন্ত!

বেলা আটটার মধ্যেই গোবিন্দদেব রথে উঠিবেন; চারি জন ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ঠাকুরদালান হইতে রথতলায় সিংহাসনসহ বহিয়া আনিল; বাহক চারি জনের বয়সের যে পার্থক্য, তাহাদের আকারপ্রকার ও পরিচ্ছদের বিভিন্নতা তাহা অপেক্ষা অল্প নহে। গোবিন্দদেবের সিংহাসন তাহারা কাঁধে তুলিয়া বহিয়া আনিতেছে; পশ্চাতে একদল লোক, অধিকাংশই বাঁড়ুয্যে পরিবারের সম্পর্কীয় লোক,—জামাই, জামাইএর ভাই, মামাতো ভাইএর সম্বন্ধী, পিস্তুতো ভগিনীর দেবর প্রভৃতি মাতব্বর কুটুম্ব ও সরস্বতীর বরপুত্রগণ, কপালে তিলক কাটিয়া, বাহ-ম্লে ছাপা লাগাইয়া, ময়ূরকণ্ঠী, পীতাম্বরী কিংবা চেনীখানি কাঁচাইয়া পরিয়া, এবং উত্তরায়খানি কেহ দেহের উপর উল্লীধোভাবে উপবীতের মতন ঝুলাইয়া, কেহ তাহা ‘তো’ করিয়া কাটিদেশে জড়াইয়া, কেহ বা সুশুদ্দ উপবীতগুচ্ছে কণ্ঠ বেঁধেন করিয়া, খোল করতাল বাজাইয়া,

“জয় গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন দয়া কর হে!”

সংকীর্তন করিতে করিতে চলিয়াছে। ঠাকুরদালান হইতে বাহির হইয়া দেউড়ীতে আসিতে দুই পাশে সারি সারি ঘর। পূর্বে এখানে ক্রিয়াকর্মে ব্রাহ্মণভোজন হইত; এখন কার্ণিসের উপর কপোত ও ঝেঝের নীচে সরীসৃপের বাসা হইয়াছে! এই সকল প্রকোষ্ঠের বারান্দায় দাঁড়াইয়া পাড়ার সধবা, বিধবা, কুমারী, যুবতী, বৃদ্ধারা গোবিন্দদেবকে রথে যাত্রা করিতে দেখিয়া গুণ্যসঞ্চয় করিতেছে। সম্মাগত রমণীগণের নিকটবর্তী হইয়া সংকীর্তনকারীদের উৎসাহ ও হরিভক্তি সহসা বাড়িয়া উঠিল; তাহারা গলার শিরা ফুলাইয়া উভয় হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া মাথা নাড়িয়া উর্দ্ধমুখে নাচিয়া নাচিয়া কেবলই গায়িতেছে,—“দয়া কর, কর হে!”—ছেলেদের মধ্য হইতে ঘন ঘন

‘হরিবোল’ শব্দ উঠিতেছে। ঠাকুর ও সংকীৰ্ত্তনের দল দেখিয়া দলবদ্ধ রমণীগণের কেহ উভয় হস্তে ললাট স্পর্শ করিয়া, কেহ নতজামু হইয়া মূস্তিকায় ললাট স্পর্শ করিয়া, কেহ বা গলগয়ীকৃত-অঞ্চলে সাষ্টাঙ্গে মাটিতে লুটাইয়া প্রণাম করিতেছে; দক্ষিণ হস্তে সংকীৰ্ত্তনকারীগণের পদরজ তুলিয়া লইয়া ভক্তিভরে তাহা জিহ্বায় ও মস্তকে স্পর্শ করিতেছে। হায় অন্ধভক্তি! ইহারা জানে না—এই পদরজের সঙ্গে এমন পায়ণ্ডেরও পদধূলি মিশ্রিত আছে, যাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া ভগবতী বসুমতী অহরহঃ অসহভার অহুভব করিতেছেন; কিন্তু সরলা, সুশীলা, ভক্তিবিবহলা পল্লীরমণীগণ কোনও পাপিষ্ঠের পরিচয় জানিবার জন্ত উৎসুক নহে। তাহারা বিশ্বাস করিতেছে, যাহার মনে যতই পাপ থাক, যে পবিত্র নাম তাহারা উচ্চারণ করিতেছে, তাহার অধমতার গম্ভীর-প্রবাহে তাহাদের সকল কলুষ বিধৌত হইয়া গিয়াছে, যেমন শতবর্ষের সঞ্চিত পাপ একবার মাত্র ভাগীরথ-তরঙ্গে অবগাহন করিলে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

ঠাকুর রথে স্থাপিত হইলেন। পুরোহিত চক্রবর্তী মহাশয় রথের সর্বোচ্চ ‘থাকে’ উপবিষ্ট হইয়া গোবিন্দের ক্ষুদ্র সিংহাসন ধরিয়া রহিলেন। যিনি বিশ্বমণ্ডল ধারণ করিয়া আছেন, এই পাপ কলিমুগে তাঁহাকেও আবার হাত দিয়া ধরিয়া রাখিতে হয়! নতুবা যদি তিনি রথ হইতে পড়িয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার হাত পা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে! রথের পাঁচটা চুড়া। প্রত্যেক চুড়ার উপর এক একটি শ্বেতচামরের ধ্বজ। চুড়াগুলি লোহিত বস্ত্রে মণ্ডিত। প্রধান চুড়ার নীচে একটা ছোট তালপাতার ছাতি গুণ্ডভাবে অবস্থিত; পাছে রথচুড়া ভেদ করিয়া বর্ষার জলধারা গোবিন্দের মস্তকে পতিত হয়, সেই আশঙ্কায় এইরূপ সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছে।

পাড়ার ছেলেরা কারিনীগাছের ডাল, দেবদারুপাতা, প্রক্ষুটিত কদম্ব-পূর্ণ কদম্বশাখা ভাঙ্গিয়া আনিয়া, তদ্বারা রথের আগাগোড়া ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। রথের চতুর্দিকে পুষ্পস্তবক ও পুষ্পমালা ঝুলিতেছে। একটু বেলা হইলে রথের কাছে ঠাকুরের বালাভোগ আনীত হইল ; করেক জন ব্রাহ্মণ লুচি, মোহনভোগ, সন্দেশ, ক্ষীর, ছানা, আম, কাঁটাল ও অন্যান্য নানাবিধ ফলফুলারী এক একখানি বারকোসে ও পিতলের থালে সাজাইয়া লইয়া রথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ভোগ আসিতেছে দেখিয়া হঠাৎ চারিদিকে তুমুল কলরব উঠিল ; “ভোগ আস্চে, বাজে লোক সব তফাৎ!” বলিয়া দুই চারি জন মোড়ল-গোছের লোক হুঙ্কার ছাড়িল। মাথায় লাল চাদর-বাঁধা দুই একটা পাইক লাঠি ঘাড়ে লইয়া নিকটেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল ; উপযুক্ত অবসর দেখিয়া তাহাদের হাতের লাঠি কাহারও কাহারও পিঠে পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে সকলে সমস্ত্রমে সরিয়া গেল।

যে সকল স্ত্রবহৎ পাত্রে ভোগ আনীত হইল, বাহকগণ দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া তাহা উচু করিয়া ধরিল। পুরোহিত ঠাকুর গোবিন্দদেবের কাছে বসিয়াই উর্দ্ধ হইতে ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করিয়া দিলেন। নিবেদনকালে পুরোহিতহস্তনিক্ৰিপ্ত দুই চারিটা তুলসীপত্র বারকোসে আসিয়া পড়িল ; দুই একটা ফুল ঘুরিতে ঘুরিতে কোন বারকোস-ধারীর মাথায় পড়িয়া তাহার দীর্ঘ টিকির পাশ দিয়া গড়াইয়া গেল। ঢাক ঢোল ও কাঁশি জোরে জোরে বাজিতে লাগিল, এবং সেই সঙ্গে ঢেলী বা নীলাম্বরীর উপর লাল চাদর বা ক্রমাল-বাঁধা ছোট ছোট ছেলেরা আনন্দভরে নাচিতে আরম্ভ করিল।

ছপুরের সময় রথতলার বেশী লোক থাকে না, কেবল দুই চারি জন দোকানদার সহচরবর্গের সাহায্যে অস্থায়ী দোকান সাজাইবার

আয়োজন করে ; এবং পাড়ার দুই একটা দুই ছেলে নিঃশব্দপদসন্ধারে দেউড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া মধ্যাহ্ন-নিদ্রাকাতর ঢাকীদিগের ঢাকে সজোরে দুই চারিটা ঘা দিয়া উর্দ্ধ্বাঙ্গে ছুটিয়া পলায় ; আর তাহাদের অপেক্ষাকৃত ভীক্ৰ সহচরগণ দূর হইতে তাহাদের এই হুঃসাহসিক অনুষ্ঠান দেখিয়া আনন্দে হাততালি দিয়া হাসিতে হাসিতে পরস্পরের গায়ে চলিয়া পড়ে ।

কিন্তু বেলা যত শেষ হইয়া আসে রথতলায় জনকোলাহল ক্রমেই তত বাড়িতে থাকে । বেলা চারিটা বাজিতে না বাজিতে রাজপথের দুই ধারের শ্রেণীবদ্ধ পল্লীবাসীরা,—বালক বালিকা হইতে বৃদ্ধ বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকলেই রথতলার দিকে অগ্রসর হয় । ছোট ছোট ছেলেদের ট্যাঁকে ও মেয়েদের আঁচলে দুই চারিটা পয়সা বাঁধা ; মা বাপের কাছে পার্কণী আদায় করিয়া তাহারা রথ দেখিতে যাইতেছে । কাহারও পরিধানে সন্তো-ধোত কাপড়, গায়ে ‘ছক-কাটা’ পিরাণ, তাহার উপর কৌচান চাদর ; কেহ বা নূতন ধুতি চাদরে সজ্জিত হইয়া চলিয়াছে । সাধারণ পল্লীরমণীগণ নদীতীরস্থ বৃক্ষান্তরালবর্তী নিহৃত পথ দিয়া রথ দেখিতে যাইতেছে ; পথিপ্ৰান্তে কচিং কোন পুরুষ সম্মুখে পড়িলে তাহারা অবগুষ্ঠন টানিয়া নলজ্জভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইতেছে, এবং পথিক কিছু দূরে চলিয়া গেলেই অবগুষ্ঠন সরাইয়া মুক্তকণ্ঠে আলাপে প্রবৃত্ত হইতেছে ; আর তাহাদের চঞ্চল পদবিক্ষেপে ও তরল কৌতুক-হাস্তে সেই সঙ্কীর্ণ বনপথ মুখরিত হইয়া উঠিতেছে ।

ক্রমে রথতলা হইতে আরম্ভ করিয়া দূরবর্তী বাজার পর্য্যন্ত লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল ।—পথের দুই পাশে সন্তোনির্ম্মিত বিপণিশ্রেণী ; ময়রার দোকানে পিতলের থালে অগণ্য মক্ষিকাসমাচ্ছন্ন মোণ্ডা, গোলা,

মেঠাই, তেলেভাজা ছোট ছোট জিলিপি, এবং ধান্নাতে লাল গুড়ে মুড়কী ও মোটা আউসের ‘গুমো’ চিঁড়া স্তূপাকারে সজ্জিত রহিয়াছে। চাষার ছেলেরা দোকানের সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কেহ এক পরসাদা দিয়া চারিখানি ছোট জিলিপি, কেহ আধ পরসাদা মুড়কী কিনিয়া কৌচড়ে পুরিয়া লইয়া যাইতেছে; কোন বালক বাড়ী ফিরিয়া যাওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণে অসমর্থ হইয়া চলিতে চলিতেই তাহা ঘন ঘন ‘কাঁকাই-তেছে’। পথের যেখানে-সেখানে বসিয়া কুমোরেরা বড় বড় ঝোড়া-ঝোড়াই ‘চিত্তির’ করা ছোট ছোট ঘট, মাটির ‘ছোবা’, মাটির জাঁতা, পুতুল, ও হাঁড়ি বিক্রয় করিতেছে। নানা আকারের নানা রঙ্গের পুতুল; কুকুর, বিড়াল, গরু, হাতী।—কোন পুতুলের মাথায় জনপূর্ণ কলসী, তাহার বামকক্ষে শিশু, সে মাথা নীচু করিয়া মায়ের স্তন্যপান করিতেছে; লাড়ুগোপালের ছবির রঙ্গ ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, দক্ষিণ হস্তে একটি সাদা মাটির লাড়ু, গালে ও কপালে খড়ি দিয়া অলংকা-তিলকা অঙ্কিত, মাথায় কালো ঝুঁটি, ময়ূরপুচ্ছের অভাবে ঝুঁটিটী নেড়া দেখাইতেছে! রাধাকৃষ্ণের যুগলমুষ্টি গ্রাম্য শিল্পনৈপুণ্যের আদর্শীভূত হইয়া এক পরসাদা মূলা বিক্রীত হইতেছে; কৃষ্ণের পরিধানে ধড়াচূড়া, ত্রিভঙ্গ বেশ, হাতে মোহন বাঁশী; বাঁশীর মুখটা যদিও হাঙ্গরের মুখের মতই করিবার চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু এক পরসাদা অধিক কারিগরীর আশা করা যায় না, তাই সেটাকে হাঙ্গরের মুখ বলিলেও চলে, ব্যাঙের মুখ বলিলেও সে কথাই প্রতিবাদ করিবার যো নাই! গগনদেব বৃহৎ গুণসহ শেভবর্নের হস্তীদণ্ড বাড়ে লইয়া ঘোর লোহিতবর্ণ দেহে বসিয়া আছেন, বর্জুল উদরের উপর উন্নত উপবীত ঝুলিয়া পড়িয়াছে; হাত চারিখানির ভঙ্গি দেখিলে মনে হয়, তিনি ‘জিহ্মাষ্টিক’ শিক্ষা করিতেছেন!—এমন সকল চিত্তাকর্ষক

পুতুলিকা দেখিয়া কি আর স্থির থাকা যায়? ছেলের দল চারিদিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে; কেহ জিজ্ঞাসা করিতেছে, ‘ও দোকানি! ও লাড়ু গোপালটার কত দাম?’ কেহ বলিতেছে, ‘কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌বো? আমাদের একটা গণেশ দাও না।’ দোকানীর অবসর নাই। ইহার উপর যখন কোন ছুঁট ছেলে পুতুল না কিনিয়া কেবল দরই করিতেছে, তখন দোকানীর ধৈর্য্যধারণ করা কঠিন হইয়া উঠিতেছে; সে তাহার মুখে দুর্জয় ক্রোধ ও বিরক্তি পুঞ্জীভূত করিয়া দক্ষিণ হস্ত সবেগে উৎক্ষেপণপূর্ব্বক বলিতেছে, ‘পালা সব দস্তুর দল! এক পয়সার জিনিস কিনবার মুরোদ নেই, আমাদের বকিয়ে মারলে!’ কিন্তু স্ত্রীলোক ক্রেতীগণের সে দিকে লক্ষ্য নাই, তাহারা কেহ ছেলেদের জন্ত পুতুল কিনিতেছে, কেহ ছোবা পছন্দ করিতেছে, কেহ হাঁড়ী দর করিয়া তাহা ভাঙ্গা কি না পরীক্ষার জন্ত বাজাইয়া দেখিতেছে। একটা বড় বটতলার ছায়ায় তিন চারিখানা মনোহারী দোকান বসিয়াছে, সেখানেও ক্রেতার সংখ্যা অল্প নহে; কেহ দেশলায়ের বায়ু কিনিতেছে, কোন বালক এক পয়সার চীনে-পটকা কিনিয়া তাহার একটাতে আশুণ লাগাইয়া অদূরবর্তী অসতর্ক বন্ধুবর্গের দিকে নিক্ষেপ করিতেছে, এবং হঠাৎ পায়ের কাছে ‘বজ্রনাদে’ তাহারা আতঙ্কিত হইয়া উঠিলে, উক্ত পটকাধারী বীরপুরুষ হাসিয়া মাটিতে প্রায় লুটাইয়া পড়িতেছে। একটা ছেলে একটা টিনের বাঁশী কিনিবার জন্ত তাহার মায়ের কাছে ভারি আবদার আরম্ভ করিয়াছে; তাহার মা যুক্তি দেখাইল, ‘বাঁশী কিনিয়া পয়সা নষ্ট করিতে নাই’; কিন্তু ছেলে সে যুক্তি না মানিয়া মায়ের অঞ্চল ধরিয়া টানিতে লাগিল, তখন মায়ের যুক্তি নিম্নে চপেটাঘাতে রূপান্তরিত হইয়া পুত্রের পৃষ্ঠে বর্ষিত হইল; ছেলে মায়ের অঞ্চল ছাড়িয়া ধলায়

পড়িয়া গড়াইতে লাগিল। একটি বারো তেরো বৎসরের মেয়ে একখানি দোকানে বসিয়া বেলেয়ারী চুড়ী পরিতেছে; দেশী লালপেড়ে কোরা শাড়ীতে আপাদমস্তক আবৃত। সে তাহার ক্ষুদ্র হাতখানি বাহির করিয়া দিয়াছে, আর দোকানদার সেই কোমল করপল্লব নিপীড়ন পূর্বক তাহাতে কালো কাচের চুড়ী পরাইয়া দিতেছে; হাতে চুড়ী উঠিতেছে না, তথাপি ক্রমাগত টপিয়া টপিয়া ঠেলিতেছে! যন্ত্রণায় বালিকা এক একবার অধীর হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু সেই যন্ত্রণা সে বাক্যে প্রকাশ করিতেছে না, দৈবাৎ তাহার মস্তক কম্পিত হইতেছে, কদাচিৎ বা তাহার অঙ্গসজ্জা চক্ষু ছাট তাহার অজ্ঞাতসারে অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়িতেছে; কিন্তু তাহার কাতরতায় দোকানীর ভ্রক্ষেপ নাই! বালিকার বর্ষীয়সী সঙ্গিনী, বোধ করি তাহার খাণ্ডড়ী হইবে, আরও কঠিনহৃদয়া; সে বলিতেছে,—“কি রকম চুড়ী দিচ্ছ বাছা! হাত কেটে কেটে চুড়ী উঠবে, তবে ত হাতে মানাবে। অত ঢল্‌কো চুড়ী হাতে দেখে লোকে বলবে কি?”

রথতলার কিছু দূরে, নিম্নাই কুরীর দোকানের পাশে কাঠাখানেক ফাঁকা জমীর উপর আজ এক কাপড়ের তাবু উঠিয়াছে। এখানে হয় ত কোন রকম খেলা দেখান হইতেছে ভাবিয়া অনেক চাবার ভিড় হইয়াছে, ছোট ছোট ছেলেরও সংখ্যা নাই; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার দেখিয়া অনেকেই ক্রম মনে ফিরিয়া গেল। কারণ তাহারা দেখিল, একজন পাকা দাড়ী-গুলালা সাহেবের সঙ্গে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া তিনজন গুরুমুখ কীধনেহ বাঙ্গালী ধর্মপ্রচারক এক একখানি কাগজ হাতে করিয়া গান গায়িতেছে;—

“বেথলহেমে হইল বিগু-চক্রের উদয়,

গায় সব ধর্মাবাসী জয় জয় জয়।”

কিন্তু বেঞ্চলহেমের চক্ষের সহিত আমাদের গোবিন্দপুরের লোকের কোন সম্বন্ধ না থাকায় সে সঙ্গীতে কেহই মুগ্ধ হইল না। কেহ বলিল, “পাদরী সায়েবের গান, ও আর কি শুনবো? আমাদের নদে তাঁতির দেহতন্ময় গান ওর চাইতে মিষ্টি!”—শ্রোতার আগ্রহ না দেখিয়া সাহেব অগত্যা গান বন্ধ করিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন; এবং তাঁহার সহকারী রেভারেণ্ড সলোমন বিশ্বাস ও যোহন পরামাণিক “সত্যশুধ কে?” “যিহুই পরম পথ”, “স্বর্গের সোপান” প্রভৃতি ‘বাইবেল ট্রাষ্ট সোসাইটি’র ছাপাখানাগ্রহৃত ছোট ছোট বহিগুলি দর্শকগণের মধ্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন। সাহেবের হয় ত আশা, দৈবক্রমে যদি এই রকম পাঁচহাজার পুস্তকের মধ্যে একখানিরও সঙ্গতি হয়, এবং তাহার সাহায্যে একটিও পতিত আত্মা সদাপ্রভুকে ভজিতে শিখিয়া হিন্দুধর্ম-নরকের অন্ধকার হইতে উদ্ধারলাভ করে, তাহা হইলে অবশিষ্ট চারি হাজার নয় শত নিয়েনবুইখানি পুস্তকের ব্যয়ভার বহন সার্থক হইবে।—দুরাশা কি না, কে বলিবে?

রথতলার আর এক দিকে পেরারা, পাকা কাঁটাল, কলা, আনারস, কাঁকড়া প্রভৃতি সুপক ফলের ও পটোল, বিজে, উচ্ছে, কাঁচকলা প্রভৃতি তরিতরকারীর দোকান। মেছুনীরা সারি দিয়া বসিয়া খুড়ি-বোঝাই পচা ইলিশ মাছ ডালার সাজাইয়া তিন গুণ লাভে বিক্রয় করিতেছে। মাছগুলি ফুলিয়া পচিয়া উঠিয়াছে, দুর্গন্ধে সে দিকে যাওয়া কঠিন; কিন্তু ক্রেতার অভাব নাই! ইতর লোকের কথা দূরে থাক, দূরবর্তী পল্লাতীর হইতে আনীত এই সকল পচা ইলিশ অধিক মূল্যে কিমিতে গ্রাহক ভদ্রলোকদিগেরও আকর্ষণ নাই। পটোল এবং কাঁটালের বাঁচ-সবুজ পচা ইলিশের ‘কুরি’ পল্লী-বধূগণের রসনাতৃপ্তিকর উপাদেয়।

ব্যঞ্জন! কিন্তু ডাক্তার কৃতান্তকিন্ধর বাবু 'মেট্রিয়া মেডিকার' দোহাই দিয়া বলেন যে, ইহা পাকযন্ত্রের অক্ষুণ্ণ নহে! আমরা শুনিয়াছি, এই মন্তব্যের জন্ত ডাক্তার-দম্পতির মধ্যে এমন প্রেমকোন্দল আরম্ভ হইয়াছিল যে, ধনস্তুরী মহাশয় চব্বিশ ঘণ্টা কাল নিজের পাকযন্ত্রকে অবসরদানে বাধা হইয়াছিলেন! 'পচা ইলিশ' ঘরে না আনায় অভিমানিনী ডাক্তার-পত্নী একদিন রন্ধনশালায় প্রবেশ করেন নাই।

দেখা গেল, এই তরকারীর বাজারের মধ্যে মাথায় লাল পাকড়ী-বাধা, পাঁচ হাত লম্বা বাঁশের পাকা লাঠী-কাঁধে এক বরকন্দাজ জমীদারের জন্ত 'তোলা' তুলিতেছে। সে কাহারও কাছে কিছু চাহিতেছে না, কেবল প্রত্যেক দোকানে আসিয়া সগুণে বুঁকিয়া পড়িয়া এক খাবার যাহা ধরিতেছে, ডালা হইতে টানিয়া তুলিতেছে, ও তাহার পশ্চাৎবর্তী একটা চাকরের বুড়ির মধ্যে তাহা নিক্ষেপ করিতেছে; কেহ বলিতেছে, 'আমি এখনও বোঁনি করি নি, এক পাক ঘুরে এসে তোলা নিও।' কিন্তু সে কথা গ্রাহ করে কে? জমীদারের বরকন্দাজ মনিবের জমীদারীর মধ্যে পুলিশের কন্ঠেবল অপেক্ষাও পরাক্রান্ত! যাহা হউক, বরকন্দাজ সাহেব এইরূপ অপ্রতিহতপ্রভাবে তোলা তুলিতে তুলিতে এক কাঁটাল-বিক্রেতার দোকানে আসিয়া উপস্থিত। অভ্যাসমত তিনি একটি কাঁটালের বোঁটা চাপিয়া ধরিলেন। দোকানী বলিল, "বাহা রে মজার লোক! বড় জোর ছ' পয়সার তোলার জন্তে তুমি যে আমার পাঁচ গুণ পয়সার কাঁটাল ধ'রে টানাটানি কর? রাখ কাঁটাল!"—অনন্তর দোকানী দুই হাতে কাঁটালের অগ্রভাগ চাপিয়া ধরিল। কাঁটাটি সুপক ছিল, 'টপ্ অফ্ ওয়ারে'র জ্বলম্ব বরদাস্ত করিতে পারিল না; কাঁটালের সুবলটা বরকন্দাজ সাহেবের হাতে থাকিল, ভুঁতুড়িখানা দোকানদারের হাতে

খসিয়া আসিল, এবং কোষগুলি মাটিতে ছড়াইয়া পড়িল। গোলমাল দেখিয়া বাঁড়ুঘোদের ছোটবাবু আসিয়া বিবাদ মিটাইয়া দিলেন বটে, কিন্তু দোকানী বেচারার ভাঙ্গা কাঁটালটা আর বিক্রয় হইল না ; বরকন্দাজ সাহেব অপ্রস্তুতভাবে মুঘলটা ফেলিয়া শিকারের সন্ধানে ভিন্ন দিকে প্রস্থান করিলেন।

রথের কাছে যেখানে বড় ভিড়, তাহার কিছু দূরে দাঁড়াইয়া মালীরা শোলার ফুল, পাখী, পুতুল, পাল্কী প্রভৃতি বিক্রয় করিতেছে ; শোলার সাপ মাথা তুলিয়া ফণা মেলিয়া খেলিতেছে, মালীর হাতে তাহার লাঙ্গুল ; সুরঞ্জিত পাকাটিনির্মিত কলাগাছের মাথায় একটি শোলার পাকাকলা, শোলার হনুমান গলায় দড়ী লইয়া গাছের মধ্যদেশে অবস্থিতি করিতেছে, এবং মালী ‘চাই শোলার খেলানা’ বলিয়া ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার সময় এক একবার হনুমানজীর কর্ণের সেই স্নাতা ধরিয়া টান দিতেছে, আর সে সজীব হনুমানের মতই একলক্ষে কদলীমূলে ওষ্ঠ স্পর্শ করিতেছে। অন্ত্র কামারেরা ছোট ছোট ছুরী, কান্তে, কাটারী, বাঁট প্রভৃতি নানারকম অস্ত্র কাঁধে লইয়া বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছে ; ইম্পাতের সঙ্গে এই সকল অস্ত্রের কোন সম্বন্ধ নাই, এবং যে মূল্যে তাহা বিক্রয় করিতেছে, তাহাতে গঠনপারিপাট্যের কিংবা ইম্পাতের অস্তিত্বের আশা করা যায় না।

রথতলার একপাশে ‘মালামো’ করিবার আখড়া। অনেকখানি জায়গা বাশ দিয়া ঘেরা ; ঘাসগুলা চাঁচিয়া ফেলিয়া আখড়াটি পরিষ্কার করা হইয়াছে। গোবিন্দপুর ও তাহার নিকটবর্তী গ্রামসমূহে যে সকল চাষার শারীরিক বল অধিক, ও বাহাদের কুস্তী করিবার অভ্যাস আছে, তাহারা আজ পূর্ণ উৎসাহে লড়িতে আসিয়াছে। কাষণ, ‘দেশের মাঝে’ তাহাদের

‘কেরামতি’ দেখাইবার আজ উৎকৃষ্ট অবসর। এই সকল ‘এম্বেচিয়োর’ পালোয়ানদের প্রত্যেকের পশ্চাতে চারি পাঁচ জন পৃষ্ঠচর। গ্রামস্থ ভদ্রলোকেরা কুস্তি দেখিতে আখড়ার ‘ঘেরে’র নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। চারিদিকে অসংখ্য চাষা। দুইজন বলিষ্ঠ যুবক কুস্তির জন্ত প্রস্তুত হইয়া আখড়ার মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা মশলা চিবাইতে চিবাইতে ও ‘ধুলোপড়া’ দিয়া বাহুবয় ডলিতে ডলিতে সমগ্র দর্শকবৃন্দের উপর এমন সগৰ্ব্ব দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, বোধ হইল, আজ তাহারা বিশ্বসংসারে কাহারও কিছুমাত্র তোরাঙ্কা রাখিতেছে না।

যুবকদ্বয় তালু চুকিয়া ঘাড় ঈষৎ নোয়াইয়া উরুদেশে দুই চারিবার চপেটাবাত পূর্বক পরস্পরকে আক্রমণ করিবার চেষ্টায় আখড়ার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; অবসর বুঝিয়া এক জন অপরের বামহাত-খানি হঠাৎ চাপিয়া ধরিতেই সে দক্ষিণ হস্তে প্রতিদ্বন্দীর ঘাড় ধরিয়া তাহার এক পায়ে নিজের পা বাধাইয়া দিল। তখন উভয়ের মধ্যে হস্তে হস্তে, পদে পদে, বক্ষে বক্ষে ঐবল যুদ্ধ আরম্ভ হইল; দর্শকগণ নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া বিস্ফারিত নেত্রে শেষ ফলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনেক চেষ্টার পর একজন অপরকে শূণ্ণে তুলিয়া চিৎ করিয়া ফেলিয়া দিল; আর চারিদিক হইতে অমনি চটপট করতালি পড়িয়া গেল, এবং অনেকে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, “বাহা তুষ্টু, বেশ! বলিহারি গুস্তাদী!” দর্শকবৃন্দের মধ্যে তুষ্টুর বল ও কৌশলের সমালোচনা-কোলাহল উখিত হইল। কেহ বলিল, “আরে, আমি বরাবরই জানি, তুষ্টুর সঙ্গে ঝড়ু পারবে না; তুষ্টু জোয়ানভা কি কম!” আর একজন বলিল, “ঝড়ু খামোকা পারবে? তুষ্টুর কত ‘গুণ-জ্ঞান’ জানা আছে, তার

কিছু খবর রাখিন্?” তুষ্টুর চাচাতো ভাই আর্জান শেখ সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল; সে চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল, “আরে ও মালতের পো! তুমি কও কি? এ বাঙ্গালা মুল্লুকে ভাইয়ের ওস্তাদের মতন ওস্তাদ কড়া আছে? এমনি ওষু ওর ঠাই আছে যে, মালামোর সময় ‘হেঁসো’ দিয়ে কোপালেও ওর গায়ে আঁচড় বসবে না!”—বুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তুষ্টু বাঁড়ুয্যেদের মেজবাবুর নিকট হইতে একখানা চাদর শিরোপা পাইল; সে তৎক্ষণাৎ তাহা মাথার বাঁধিয়া নতমস্তকে শিরোপা-দাতাকে অভিবাদনপূর্বক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল।

কিন্তু হঠাৎ একটা গোল বাধিয়া উঠিল। ঝড়ু হৃদয়বুদ্ধে পরাস্ত হইবার পর তাহার পৃষ্ঠপোষকগণ ও স্বগ্রামবাসী চাষার দল বলিতে লাগিল, তুষ্টু অস্তায় করিয়া ঝড়ুকে ফেলিয়া দিয়াছে; অতএব তুষ্টুর এ জিত জয় বলিয়া মঞ্জুর হইতে পারে না। তুষ্টুর সেই চাচাতো ভাইটি তাহার শারীরিক বলের অভাব কর্ত্তব্যরেই পোষাইয়া লইয়াছিল; সে আকাশে গলা চড়াইয়া বলিল, “আরে, ঝড়ু আগে ভাইয়ের সাক্ষেদে জ্ঞাপনার সঙ্গেই কুস্তি লড়ুক, তারপর যেন বড়দার কাছে আসে! চাঁদপুরে আবার মরদ আছে কেডা?”—নিজের গ্রামের উপর কটাক্ষ! চাঁদপুরের চাষার দল তুষ্টু ও তাহার বাচাল চাচাতো ভাইটির উপর ক্রোধিয়া আসিল। অতঃপর কি ঘটে, দেখিবার জ্ঞান সকলে উদ্গ্রীবভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিল। তখন তুষ্টু মন্দরমস্থিত সমুদ্রের ত্রাণ চঞ্চল সেই জলশ্রোতকে লক্ষ্য করিয়া তাল চুকিয়া বলিল, “জোয়ানের বেটা জোয়ান কে আছে আহুক; কুস্তিতে মীর মহম্মদের সাক্ষেদে কারেও ডরায় না।” মাথার বাবরিকাটা ঝাঁকড়া চুল নাড়া দিয়া, বুক ফুলাইয়া, রক্তবর্ণ চক্ষু ছটি কপালে তুলিয়া তুষ্টু যখন বীরমণ্ডে রক্তভ্রমিতে যুগিয়া বেড়াইতে

লাগিল, তখন তাহাকে দেখিয়া একটা জীবন্ত মানুষ বলিয়াই বোধ হইল ; চতুর্দিকস্থ সমবেত মনুষ্যশ্রেণীরা তাহার তুলনার কতকগুলো নির্জীব পুতলিকার আয় প্রতীয়মান হইতে লাগিল !

ঝড়ু আবার তুষ্ঠুর সঙ্গে কুস্তি আরম্ভ করিল। প্রায় পাঁচ মিনিটকাল উভয়ে স্ব স্ব প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভূমিসাৎ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিল ; কিন্তু বিজয়লক্ষী আজ তুষ্ঠুর প্রতিই প্রদগ্ধা, তুষ্ঠু ঝড়ুকে সহসা মাথার উপর তুলিয়া তিন হাত দূরে ফেলিয়া দিল। তুষ্ঠুর দলস্থ লোকেরা নোংসা ছুটিয়া গিয়া তাহার বিজয়গর্বক্ষীত শ্রমচঞ্চল বক্ষে করাঘাতপূর্বক ধগ ধগ করিতে লাগিল ; চারিদিকে ঘোর কলরোল উথিত হইল।

কিন্তু চাঁদপুরের চাষারা আজ জোট বাধিয়া আসিয়াছে, ঝড়ুর পরাজয়কে আজ তাহারা চাঁদপুর গ্রামখানিরই পরাজয় বলিয়া মনে করিল ; সুতরাং গ্রামের মানরক্ষার জন্য সকলেই তুষ্ঠুর উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। তুষ্ঠুর দল নিকটেই ছিল। দুই পক্ষে প্রথমটা খুব কথা কাটাকাটি চলিল ; কিন্তু চাষারা রাগিলে শুধু গর্জনেই বিবাদ শেষ হয় না, বর্ষণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে ! অবিলম্বে দুই পক্ষ হইতেই লাঠীবর্ষণ আরম্ভ হইল। কয়েকজন ভদ্রলোক গোল মিটাইতে আত্মীয় প্রবেশ করিলেন, কিন্তু লাঠীর সঘন আশ্ফালন দেখিয়া সভয়ে গরিয়া আসিলেন। পাকা বাঁশের মোটা মোটা, লম্বা লম্বা, তৈলরঞ্জিত, গাঁটবিশিষ্ট, লাঠী উঠিতেছে, ঘুরিতেছে, পড়িতেছে ! দেখিয়া মনে হইল, সত্যই আজও বাঙ্গালীর প্রাণ আছে। বাহারা এমন লাঠী চালাইতে পারে, উত্তত লাঠীর মুখে বুক পাতিয়া বাহারা এমন অদ্ভুত কৌশলে সেই আঘাত ফিরাইতে পারে, তাহারা নীল-কর চা-করের বেত ও তাহাদের দেওয়ান গোমস্তার ‘শামচাঁদ’ নতমস্তকে সন্মুখ করে কেন ?

অকস্মাৎ মাথায় লাল পাগড়ী-বাঁধা জন পাঁচ সাত কন্ঠেবল হস্তস্থিত অনতিদীর্ঘ রুল উত্তত করিয়া হাঙ্গামার মধ্যে প্রবেশ করিল; দেখিতে দেখিতে বিবাদ থামিয়া গেল, এবং যাহারা লাঠী চালাইতেছিল, তাহারা দলাদলি ভুলিয়া একযোগে চম্পট দিল! কয়েকজন নির্বিরোধ চাষাকে লইয়া কন্ঠেবল সাহেবেরা টানাটানি করিতে লাগিল।—বিষয় সমস্তার মীমাংসা হইয়া গেল; দর্শকগণ নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, হয় রে রুলের ভয়!

রথ টানিবার সময় হইয়াছে বুঝিয়া ঢাকে ও ঢোলে কাঠি পড়িবামাত্র দর্শকগণ চারিদিক হইতে রথের কাছে দৌড়াইয়া আসিল। দুইগাছি খুব মোটা ‘কাছি’ রথের কাছে পড়িয়াছিল; ষাট সত্তরজন লোক তাহা ধরিয়া সজোরে টানিতে লাগিল। কেহ বা টানিতে টানিতে দড়ী ছাড়িয়া একেবারে রথের উপর অশ্বদ্বয়ের সম্মুখস্থ উত্তত পদদ্বয়ের কাছে উঠিয়া দাঁড়াইল। রথ হেলিয়া-দুলিয়া রাজপথের দিকে অগ্রসর হইল। রাজপথে উঠিলে সকলে তাহা বাজারের দিকে টানিয়া লইয়া চলিল; মুহূর্মুহঃ ‘হরিবোল’ শব্দে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ঢাকীরা রথের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া মহা উৎসাহে নাচিয়া নাচিয়া পাখাওয়ালা বড় বড় ঢাকগুলি বাজাইতে লাগিল।

রথ চলিতে চলিতে একটু থামিলেই চারিদিক হইতে পানের বিড়া, সুপারি, বাতাসা, পাকাকলা, পয়সা, কড়ি গোবিন্দদেবের উদ্দেশে রথের উপর বর্ষিত হইতে লাগিল; ছই একটু সুপারি গোবিন্দদেবের পুরোহিত (যিনি কপিশ্বজ হইয়া গোবিন্দদেবের সিংহাসনখানি ধরিয়া বসিয়াছিলেন) মহাশয়ের কেশশূন্য মস্তকের উপর ‘ঠকাস্’ করিয়া পড়িল; তিনি চক্ষু মুদিত করিয়া একটু কাতরভাবে মস্তক অবনত করিলেন। দর্শকগণের হস্তনিষ্কিন্তু যে সকল সামগ্রী অধ্যাকর্ষণ-প্রভাবে পুনর্বীর মাটিতে আদিয়া

পড়িল, চাষার ছেলে মেয়েরা জনসঙ্কুল রাজপথের ভিড় ঠেলিয়া সেগুলো কুড়াইয়া লইয়া অঞ্চলে বাঁধিতে লাগিল।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা রথের নিম্নতম ‘থাকে’ বসিয়া সর্বাপেক্ষা অধিক আমোদ উপভোগ করিতেছে। যতই জোরে ঢাক বাজিতেছে, রথ দ্রুতবেগে চলিতে চলিতে যতই ছলিতেছে, তাহারা উভয় পার্শ্বস্থ কামিনী ও দেবদারু-পত্রাচ্ছাদিত, কদম্বকুম্ভভূষিত বাঁশের খুঁটা দুই হাতে ততই দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া হর্বোচ্ছ্বাসে পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। প্রতি মুহূর্তে নীচে পড়িয়া নিষ্পেষিত হইবার আশঙ্কা, তাহার উপর এমন প্রচণ্ড উদ্দাপনার লোভ—এই সকল চপলচিত্ত বালক বালিকা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে না; তাই অনেকে মাকে না বলিয়া, এবং বাপ দাদাকে লুকাইয়া পলাইয়া আসিয়া, কোন প্রতিবেশীর সাহায্যে রথে চড়িয়া বসিয়াছে; উন্মাদনাপূর্ণ উদ্দাম উদ্দীপনায় তাহাদের কোমল বক্ষ স্পন্দিত হইতেছে, এবং যুগপৎ আনন্দে ও আতঙ্কে তাহাদের কচি মুখ ও কুলের মত কোমল গাল দু’খানি লাল হইয়া উঠিতেছে।

রাজপথ দিয়া প্রায় অর্দ্ধমাইল পথ ঘুরিয়া রথ রথতলায় ফিরিয়া আসিল। তখন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়; ময়রার দোকান কতক কতক উঠিয়া গিয়াছে, দর্শকগণ ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিতেছে, এবং জনতা ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে; কিন্তু এখনও পানের দোকানে ক্রেতার অভাব নাই। থিলিবিব্রেক্তা সাদা বোতলে লাল, নীল, সবুজ, নানারঙ্গের জল পুরিয়া, ছোট ছোট শিশি, কাচের ডিস, কাঁশার রেকাবী প্রভৃতিতে মশলা রাখিয়া দোকানখানি সুন্দর রূপে সাজাইয়াছে। উৎসব প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তথাপি তাহারা ঘন ঘন হাঁকিতেছে, “চার চার থিলি এক পয়সায়, বড় সস্তা, চাই মশলাদার গোলাপী থিলি!”

চাষার দল পয়সা ফেলিয়া মুঠা মুঠা খিলি কিনিতেছে, কেহ কেহ রা গুধু পানে সন্তুষ্ট নয়, কোমর হইতে সূত্রনির্মিত গোঁজে বাহির করিয়া পয়সা খুলিতে খুলিতে বলিতেছে, “দোকানী দাদা ! এক পয়সার বিলাতী বিড়ি দাও, খুব তলব হবে ত ?”—বিলাতী সভ্যতার প্রভাবে অনেকদিন আগেই গোবিন্দপুরে সিগারেটের আবির্ভাব হইয়াছে ; তাই রথের দিন দেখা গেল, চাষারাও খসার্নি ছাড়িয়া পয়সা-জোড়া সিগারেট কিনিয়া কঠোর শ্রমলব্ধ অর্থের সদ্যবহার করিতেছে !

বাহা হউক, চাষার দল পান চিবাইছে চিবাইতে পানের পিকে শুভ দস্তপাঁতি ও কৃষ্ণ অধরোষ্ঠ রঞ্জিত করিয়া অদূরবর্তী নাগরদোলায় চড়িয়া বসিল। এক পয়সার কুড়ি পাক ; কিন্তু অনেকে এক পয়সার পাক খাইয়া তৃপ্ত হইল না, বনবন্ করিয়া কুড়ি পাক ঘুরিয়া আসিলে নাগরদোলার বেগ যেমন মন্দীভূত হইল, অমনই তাহারা চীৎকার করিয়া বলিল, “আর এক পয়সা !” নাগরদোলা আবার সবেগে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ নাগরদোলায় উঠিয়াই গান ধরিয়াছিল,—

“ঐ যায় বুঝি বৈবনের তরী অকূল তুফানে।”

কুড়ি পাকের শেষে গানটা মধ্যপথে হঠাৎ থামিয়া গিয়াছিল ; নূতন করিয়া পাক আরম্ভ হইলে আবার তাহারা নবোৎসাহে সপ্তমে গলা চড়াইয়া সমস্বরে গায়িতে লাগিল,—

“মদনের ঢেউ নেগেছে রাখতে পারি নে।”

রথ রথতলায় আসিলে সন্ধ্যার পূর্বে ঠাকুরের বৈকালিক ভোগের ব্যবস্থা আছে। সকালের ভ্রায় সন্ধ্যাকালেও ব্রাহ্মণগণ ভোগ লইয়া রথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল ; পুরোহিত ঠাকুর পূর্ববৎ তাহা উর্দ্ধদেশ হইতে নিবেদন করিতে লাগিলেন।

প্রতি বৎসরেই রথের দিন বৃষ্টি হয়। 'আজ এতক্ষণও বৃষ্টি নামে নাই ; ভয়ানক গরম,—যাহাকে 'গুমট' বলে, তাহাই হইয়াছে ; আকাশ ঘনীভূত মেঘে সমাচ্ছন্ন। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে অল্প বাতাস ও মুষল-ধারে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল। দর্শকবৃন্দের মধ্যে যাহাদের ছাতা ছিল, তাহারা ছাতা মাথায় দিয়া চলিল ; অনেকে চাদর মুড়ি দিয়া দোড়াইতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা ছোট ছোট ছেলে মেয়ে লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল ; ছেলে কোলে লইয়া দোড়াইতেও পারে না, দাঁড়াইয়া ভিজিতেও কষ্ট ; কয়েকপদ দ্রুতবেগে চলিয়াই শ্রমভরে গতি মন্দ হইয়া আসে। গোবিন্দদেবকে যথারীতি ভোগ নিবেদন করিবারও অবসর হইল না ; সকলে ব্যস্তভাবে তাঁহাকে রথ হইতে নামাইয়া ঘরে লইয়া গেল।

দশ মিনিটের মধ্যে রথতলা জনহীন হইয়া পড়িল। চারি দিক অন্ধকার। বায়ুর সন্ সন্, মেঘের ঘন গর্জন, ও বন্ বন্ বর্ষণের মিশ্র কলতানে বর্ষার গান জমিয়া গেল। একঘণ্টা পূর্বে যে রথতলা মহোৎসব-মত্ত অসংখ্য নরনারীর হর্ষকলরবে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, এখন তাহা নির্জন, নীরব,—বিদ্যাদামক্ষুরিত মেঘমন্ত্রমুখরিত নববর্ষার অবিরল ধারায় অভিষিক্ত ; শুধু দেবপরিত্যক্ত গৌরববিচ্যুত বংশরথ মেঘমণ্ডিত আকাশ-তলে নিঃশব্দে ভিজিতেছে, আর ঢাকার দল দেউড়ার নীচে ছেঁড়া চাটাইয়ের উপর বসিয়া ঢাক বাজাইতেছে, এবং সানাইওয়ালারা গাল ও গলা ফুলাইয়া, দম বন্ধ করিয়া, সানাইয়ে যথাশক্তি ফুৎকার দিয়া করুণ স্বাগিণীতে গায়িতেছে,—

“ব্রজ তোজে যেও না, যেও না, বধু হে !”

বায়ু ও বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে মিশিয়া এই ঢকাধ্বনি ও সানাইয়ের এই স্বরতরঙ্গ যে অগত্য মধুর রহস্যপূর্ণ কুহকময় তানের সৃষ্টি করিতেছে,

তাহাতে গ্রামপ্রান্তবর্তী স্নান দীপালোকিত ক্ষুদ্র কুটীরে মাতার নিবিড়
 মেহপূর্ণকোড়বিহীন নববস্ত্রপরিহিত উৎসবপ্রত্যাবৃত্ত স্তম্ভপানরত শিশুর
 কজ্জলরঞ্জিত কোমল নয়নপন্নবে নিদ্রা ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে ; কিন্তু
 তাহার হৃষ্টু দিদির চোখে ঘুম নাই ! সে তাহার নবকীর্ত শোলার ডুলিখানি,
 'টিয়ে' পাখীটা, ও মাটির রংকরা ছোবা দুটি লইয়া বিমম বিব্রত হইয়া
 পড়িয়াছে ।—সে মিনিটে মিনিটে তাহার বিছানা হইতে উঠিতেছে,
 তাহার অভিলষিত স্থানে খেলানাগুলি সযত্নে সাজাইয়া রাখিতেছে ; আবার
 যখনই তাহার আশঙ্কা হইতেছে যে, থোকর ঘুম ভাঙ্গিলেই সে তাহার
 ক্ষুদ্রহস্ত প্রসারিত করিয়া এত সাধের খেলানাগুলি লইয়া ভাঙ্গিয়া দিবে, তখনই
 সে উঠিয়া আর একটা নূতন জায়গায় সেগুলি সরাইয়া রাখিয়া আসিতেছে ।





বুলনসাজা :

ঝুলন-যাত্রা

—:~:—

প্রতিবৎসর শ্রাবণ মাসেই ঝুলন-যাত্রা শেষ হয়, কিন্তু যেবার আমরা কম বন্ধুতে মিলিয়া বলরামপুরে ঝুলনের উৎসব দেখিতে গিয়াছিলাম, সেইবার তাম্রমাসের প্রথমে গুরুদ্বাদশীতে ঝুলন আরম্ভ হইয়াছিল।

সে অনেকদিনের কথা, কিন্তু এখনও সেই উৎসব-কাহিনী বেশ মনে পড়িতেছে। বলরামপুরে আমাদের কোন আত্মীয়ের বাস ; সেখানে হালদার-বাড়ীতে বিশেষ সমারোহে লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের ঝুলন হইয়া থাকে। কথাটা অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতে-ছিলাম ; এতদিন পরে প্রথম তাদের সেই গুরু দ্বাদশীতে আমরা কয়েক বন্ধু একত্র বলরামপুরে যাইবার অবসর পাইলাম।

বর্ষাকালে নদীপথেই বলরামপুরে যাইবার সুবিধা ; কিন্তু প্রথমটা নৌকার অনুসন্ধানে আমাদের বড় বিব্রত হইতে হইল, কারণ পল্লীগ্রামে এ সময় জেলের মধ্যে বাঁশজালে মাছ ধরিবার ‘ধুম পড়িয়া’ যায়। অনেক কষ্টে আমাদের এক বন্ধুর প্রজা বাঁশী মালোকে ‘পাকড়া’ করিলাম। লোভ ও ভয়ের বশীভূত হইয়া সে আমাদেরকে বলরামপুরে রাখিয়া আসিতে সম্মত হইল।

আমাদের উৎসাহ একরূপ অপরিমিত বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, মধ্যাহ্নে আহাতিদির পরই আমরা তাড়াতাড়ি বাঁশী মালোর নৌকায় খোঁজে বাহির হইলাম। বাঁশীর গৃহপ্রান্তস্থ ‘জামানকোটা’র ‘বাতাড়ে’র নিকট

হইতে তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিলাম ; কিন্তু ধীবরপুত্র নিরুত্তর । কয়েক মিনিট পরে বাঁশীর তিন চারি বৎসর বয়সের একটি উলঙ্গ ছেলে একটা বৃক্ষ-শাখাকে অশ্বে পরিণত করিয়া, অখারোহণের কল্পিত আনন্দে ‘চিঁহি’ ‘চিঁহি’ শব্দ করিতে করিতে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল । তাহার দক্ষিণ হস্তে চিতের ডালের এক চাবুক ও বামহস্তে জীর্ণ রজ্জুর এক লাগাম,—অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র ক্রটি ছিল না ; কিন্তু বেচারী গুত্রবেশধারী চারিটি ভদ্রসন্তানকে একরূপ অগম্য স্থানে তাহার পিতৃসন্দর্শনকামনায় দণ্ডায়মান দেখিয়া যেন একটু অপ্রতিভ হইল ; তাহার পর কোতূহলপ্রদীপ্ত চক্ষু আমাদের মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল, “বাবা বাড়ী নেই, ‘লায়ে’ গিয়েচে ।”

স্নানের ঘাটে যেখানে বাঁশীর নৌকা বাঁধা ছিল, অগত্যা আমরা সেখানে গিয়া দেখিলাম, শ্রীমান বংশীধর তাহার নৌকার বাঁশের মাচা সরাইয়া ছোট কাঠের সোঁউতিখানা দুই হাতে ধরিয়া জল ফেলিতেছে । সেখানে আরও তিন চারিখানি জেলেডিজি বাঁধা ছিল ।

আমাদের গ্রীষ্মকালের সেই সঙ্গীর্ণকায়্য শ্রোতস্বিনী এখন আর গুত্র বজতনুত্রবৎ সূক্ষ্ম জলরেখা নহে ; প্রথম বর্ষার জলোচ্ছ্বাসে নবযৌবনা তরুণীর মত তাহার উভয় কূল পূর্ণ হইবার দৃশ্যও আর নাই । আজ এই ভাদ্রের প্রারম্ভে তরঙ্গিনী পূর্ণধুবতীর আয় পরিপূর্ণ যৌবনশ্রী লাভ করিয়াছে ; বানের জলে নদীর উভয় কূল প্রাবিত হওয়ায় যেন তাহার সর্কাজে রূপ উছলিয়া উঠিতেছে ।

আমাদের স্নানের ঘাট পূর্ব্বের মত এখন বটতলায় নাই ; বটতলায় গভীর জল । শ্রাওড়াতন্ত্র্য দিয়া স্নানের ঘাটে ঘাইবার সরু ‘মুঁড়ি’র মত যে পথ ছিল, তাহা ও আত্মকাননের প্রাস্তবর্তী কচুবন মধ্য করিয়া, হারাণে

বাগদীর গোয়ালঘরখানির ভিটা ডুবাইয়া নদীজল এখন শ্রাওড়াহলার আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রাওড়াগাছের পাশেই একটি ছোট গাব গাছ; গাব গাছটিতে প্রচুর নূতন পত্র উদগত হইয়াছে,—কচি কচি পাতাগুলি অলঙ্করণে রঞ্জিত। হারাণে বাগদীর পুত্র নিতাই সেই গাব গাছটিতে উঠিয়া কৌচড় ভরিয়া কচি গাবপাতা পাড়িতেছে; কারণ কচি গাবপাতায় মোচার ঘণ্টের মত অতি সুন্দর তরকারী হয়।—এই শাক পল্লী-রমণীগণের অত্যন্ত মুখরোচক ব্যঞ্জন; বিশেষতঃ কথিত আছে, গাবপাতা তিন রাত্রির পর আর রন্ধনযোগ্য নরম থাকে না, ‘দড়িয়া’ যায়; তাই পাতাগুলি ফুটিয়া উঠিতেই সে দিকে রমণীগণের লুকু দৃষ্টি পতিত হয়।

বেলা পাঁচটার সময় আমরা বিছানাপত্র ও খাবার লইয়া নৌকায় উঠিলাম। বৃষ্টির আশঙ্কায় নৌকার ছেএর উপর একখানি সতরঞ্চি চাপাইয়া দেওয়া গেল। বর্ষাকালে প্রতিকূল শ্রোতে নৌপরিচালন সহজ নহে; কিন্তু দুই জন বলবান দাঁড়ি দাঁড় টানিতে লাগিল, তাহার উপর পাল তুলিয়া দেওয়ার তর-তর শব্দে নৌকা চলিল।

কূল ছাড়িয়া আমাদের নৌকা মধ্যনদীতে উপস্থিত হইলে দেখিলাম, নিস্তেজ তপন নদীর অপর পারে আব্রকাননের অন্তরালে অন্ত বাইতেছে। নদীর জল আমবাগানের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে; লোহিত সূর্যালোক নিবিড় তরুপল্লবের বাবধান-পথে নদীজলে আসিয়া পড়িয়াছে; সুরীর-বিকম্পিত বৃক্ষছায়া বর্ণমান জলের সহিত জীভা করিতেছে; বৃক্ষের দুই চারিটা গুপ্তপত্র নদীশ্রোতে পড়িয়া ভাসিয়া বাইতেছে। নদীতীরে যে দুইটি ইটের পাঞ্জা ছিল, তাহা সম্পূর্ণ ডুবিয়া গিয়াছে, কেবল তাহাদের উপর যে কয়েকটা কালকাসিন্দা ও কাল-

ভেঁকানার গাছ জন্মিয়াছিল, তাহাদের অগ্রভাগমাত্র জলের উপর আগিতেছে। হাঁটু-জলে একজন জেলে একখান ছোট 'থেপ্লা' জাল কেলিয়া চিংড়িমাছ ধরিতেছে ; এবং মুখ্যোদের অর্ধনিম্ন বাগানেয়া ধারে একটা চালতা গাছের নীচে উচু ভিটার উপর দুই জন লোক গাবের আটার পরিমার্জিত কালো 'সেরেস্তা'র স্বত্ববদ্ধ বঁড়সীতে বোলতার টোপ ও কঁচো গাঁথিয়া গভীর জলে নিক্ষেপ পূর্বক স্থিরভাবে বসিয়া মৎস্যশিকারের প্রতীক্ষা করিতেছে,—একাগ্রতা ও সহিষ্ণুতার জীবন্ত মূর্তি !

নদীর পশ্চিমতীরে বাবলা আড়ি। বাবলা গাছের স্বদেশ প্রযাত জলে ডুবিল গিয়াছে, ঝাঁকড়া শাখাগুলি জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে ; সহস্র সহস্র লোহিতবর্ণ পিপীলিকা এই সকল বাবলা-শাখায় আশ্রয় লইয়াছে। গাছের কাছে জলের উপর কালো কালো অসংখ্য জলীয় কীট ক্রতবেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

সূর্য্য অস্ত গেল। শরৎকালের গোধূলি। পশ্চিম আকাশে অন্তরিত তপনের কনককিরণানুরঞ্জিত খণ্ডবিখণ্ড মেঘস্তর বিচিত্রবর্ণ সম্পাতে অতি মনোহর শোভা বিকাশ করিতে লাগিল।

লোকালয় অতিক্রম করিয়া নৌকা আউস ধানের জমীর ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল। দুই ধারে ধানক্ষেত্রে ধানের গাছগুলি ডুবিল গিয়াছে, কেবল স্বর্ণভ শীষগুলি ভাসিতেছে। পাছে রাতারাতি জল বাড়িয়া পাকা ধান ডুবিল যার, এই ভয়ে কৃষকগণ দলে দলে আসিয়া কান্তে দিয়া ধান কাটিতেছে ; এবং ছোট নৌকায় বোঝাই দিয়া এ-পার হইতে ওপার লইয়া যাইতেছে। কেহ দাঁড় টানিতেছে, কেহ পোয়ালের আগুনে কলিকায় খসান সাজিয়া ধূপান করিতেছে ; কেহ বা ধানের আঁটির উপর ঠেস দিয়া বসিয়া গায়িতেছে,—

“তোমার পিরীতে সব খোয়ালান,

বাকি কেবল টুকনী হাতে !”

অনুরে খেরা নৌকার চড়িয়া একদল লোক অপর পারে চলিয়াছে। প্রান্তরপ্রান্তবর্তী ক্ষুদ্র গ্রামখানি হইতে যে মেঠো পথ নদী পর্যন্ত আসিয়াছে, প্রায়বালিকাগণ লেই পথে গা ধুইতে আসিয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে; কেহ কলসী বুকে দিয়া পা দাঁপাইয়া এক-বুক জলে সাঁতার দিতেছে। বড় বড় মহাজন নৌকা লবণ ও চূণ বোঝাই লইয়া দূরবর্তী নগরে যাত্রা করিয়াছে; লবণের নৌকার ভিতর হইতে নারিকেলের চারার সবুজ পাতা দেখা যাইতেছে।

সন্ধ্যার সময় আমরা কামদেবপুরের খালের কাছে আসিলাম। খালের মুখে অনেকগুলি জেলে-ডিজি বাঁধা রহিয়াছে; তাহাদের বকে তরঙ্গাঘাতজনিত “তর তর” শব্দ উথিত হইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে মৌকাগুলি ছলিতেছে। একজন জেলে একটা লম্বা আড়করা বাঁশের উপর চড়িয়া আর একটা সুদীর্ঘ সমান্তরাল বাঁশ ধরিয়া ক্রমাগত উঠা-নামা করিতেছে; সে বাঁশের আগার উঠিলেই একখানি সুবিশীর্ণ জাল নদীজলে ডুবিয়া যাইতেছে, আবার সে ধীরে ধীরে গোড়ার দিকে নামিয়া আসিলে জালখানা উর্কে উঠিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে পুঁটি, খয়রা, ট্যাংরা, বাটা প্রভৃতি মাছ জালে বাধিয়া লাফাইতেছে; নিকটে একখানা ডিজি, জেলের একজন সহচর সেই ডিজিতে জালের মাছগুলি সঞ্চিত করিতেছে। জেলেনীরা মাছের ঝোড়া সম্মুখে লইয়া তীরে বসিয়া গল্প করিতেছে। আমাদের নৌকা কিয়দূর অগ্রসর হইতে না হইতে তাহাদের গল্প অশ্রাব্য কলহে পরিণত হইল।

নদীর পূর্বধারে শ্রাণান। শ্রাণানঘাটে কত ভাঙ্গা খাটুলী, কত

ছেঁড়া কাঁথা, কত কাঁথা-ভাঙ্গা কলসী পড়িয়া রহিয়াছে ; শৃগালেরা বালিশ-গুলি ছিঁড়িয়া তাহা হইতে তুলা বাহির করিয়া ফেলিয়াছে । নদীজলে কতকগুলি সরল বংশদণ্ড প্রোথিত আছে ; দুই তিনটি বাঁশ সম্পূর্ণ নতন ; দেখিয়া বৃষ্টিতে পারা যায়, দুই এক দিনের মধ্যেই এখানে শব্দাহ হইয়া গিয়াছে । কতদিনের রোগতাপ, অসহ জ্বালা যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বাহারা এখানে চিরবিরাম লাভ করিয়াছে, তাহাদের কোন ইতিহাস বর্তমান নাই ; কয়জনই বা তাহাদের কথা জানিত ? কিন্তু তাই বলিয়া ত পৃথিবীতে তাহাদের স্নেহ মমতার অভাব ছিল না ! আজও দেখিলাম, নদীর পূর্বতীরে একটি চিতা জলিতেছে ; কোন পুরুষের চিতা । কতকগুলি লোক কোমরে গামছা জড়াইয়া নিঃশব্দে শব্দাহ করিতেছে, সকলেই যেন এক একটি সজীব পুস্তলিকা ! ছয় সাত বৎসরের একটি বালক নিকটে বসিয়া উদাসদৃষ্টিতে নদীর দিকে চাহিয়া আছে, আর অদূরে ধানের জমীর ধারে একটি মলিনবসনা রুম্বকেশী কুবকরমণী মাটিতে লুটাইয়া বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতেছে ; কিন্তু কেহ তাহাকে সাঙ্ঘনাদানের চেষ্টা করিতেছে না । পৃথিবীতে যে তাহার ‘বুকের কলিজা’ ছিল, তাহার সোণার অক্ষ অতি তুচ্ছ সামগ্রীর মত ঐ নদীতীরে ভস্ম হইতেছে, এখন তাহার কি সাঙ্ঘনা আছে ? —সন্ধ্যার ঐ লোহিত তপনরাগের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ‘হাতের নোয়া’ ও সিঁথির সিঁদুর, তাহার ‘সংসারের বাঁধন’—সব শুচিয়া গেল !

দেহের নশ্বরতার এই জাজ্বল্যমান প্রমাণ সম্মুখে দেখিয়া মনটা বড় দমিয়া গেল । আরার ভাবিলাম, এমনতর কত বিরহ ও বিবাদের অভ্যন্তর দিয়াই মানবজীবন প্রতিদিন অমৃত কালসাগরে ভাসিয়া বাইতেছে । মৃত্যুর চিরবিশ্রুতি-ভরসাজ্বর অলঙ্ঘ্য বিধানে আত্মসমর্পণ

করাই আমাদের নখর দেহের অপরিহার্য পরিণাম। কিন্তু আপাততঃ মন প্রকল্প করিবার একটি উপায় সম্মুখে দেখা গেল। একটা প্রকাণ্ড পাণিকলের জল আমাদের নৌকার পাশ দিয়া ভাসিয়া যাইতোছিল; আমরা পাণিকলচরনে প্রবৃত্ত হইলাম। অতঃপর আমাদের নৌকা টোপাপানার নিবিড় বনের নিকট দিয়া চলিতে লাগিল। রাশি রাশি ঝুঁকিয়া গুল্মের গুচ্ছ নদীজল অনেকদূর পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া আছে, তাহার উপর জলপিপিগুলি পুচ্ছ নাচাইয়া দ্রুত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একটা পানকোড়ী একস্থানে ডুব দিয়া আর এক স্থানে গিয়া দীর্ঘ সলাটা জলের উপর হঠাৎ বাড়াইয়া দিতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ ডুবিয়া যাইতেছে। দূরে জলময় কাশবনের পাশে বসিয়া একটা ডাহক ‘কুয়া কুয়া’ করিয়া একঘেয়ে শব্দে চীৎকার করিতেছে। তাহার সেই ব্যাকুল বিস্তীর্ণ কণ্ঠস্বরে এমন একটি অব্যক্ত কাতরতা, ক্ষুধিত ক্লান্ত একক জীবনের এমন মর্মভেদী বেদনা উচ্ছ্বসিত হইতেছিল যে, এই স্বর সারাক্ষণে বর্ষার এই বিস্তীর্ণ নদীবক্ষে ভাসিয়া যাইতে যাইতে আমার মনে হইতে লাগিল, যেন তাহা বর্ষা-প্রাবনপীড়িত, খরপ্রবাহমথিত, সিক্ত তটভূমিরই কম্পিতকণ্ঠ-নিঃসৃত করুণ বিলাপোচ্ছ্বাস।

নৌকা যখন কুতবপুরের ঘাটে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। আকাশে একটুও মেঘ নাই। চন্দ্র উঠিয়াছে। দেখিতে দেখিতে চন্দ্রালোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; এবং সেই পূর্ণপ্রায় শরৎচন্দ্রের কিরণে মুক্ত প্রকৃতি হাসিতে লাগিল। নদীর বিস্তীর্ণ বক্ষে সেই কিরণসম্পাতে বোধ হইতে লাগিল, নদীজল রজতময় হইয়াছে! যেখানে চন্দ্রের পূর্ণ প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, সেখান হইতে যতদূর দৃষ্টি যায়, তত দূর পর্য্যন্ত যেন তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ গলিয়া চঞ্চল সুরঙ্গের উপর দিয়া ভাসিয়া

বাইতেছে। দাঁড়ের জলে চাঁদের আলো বিকস্মিক করিতেছে। নদীতীরে বাঁশবন; বাঁশের অগ্রভাগ নত হইয়া নদীজলে পড়িয়াছে, বায়ু-ভরে তাহা শর-শর করিয়া কাঁপিতেছে। তীরে পরিত্যক্ত গৃহের দুই একটা মৃগ্মপ্রাচীর; প্রাচীরের উপর চাল নাই, জ্যোৎস্নালোকে তাহা নিশ্চল ধূসর প্রেতদেহের স্থায় প্রতীয়মান হইতেছে। একটা পেচক কোথা হইতে নিঃশব্দপক্ষসঞ্চালনে আসিয়া এই প্রাচীরের উপর বসিল,—আবার একটু পরেই উড়িয়া গেল। দূরে গ্রামের মধ্যে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর অবসরপ্রাপ্ত কৃষকেরা নিরুদ্ধগচিত্তে একত্র বসিয়া তবলা ও খঞ্জনী বাজাইয়া ‘মনসার ভাষানের’ গান আরম্ভ করিয়াছে। পল্লীকৃষকগণের মনে আনন্দবিধানের জন্ত ‘মনসার ভাষানের’ তুলা উৎকৃষ্ট সঙ্গীত আর কি আছে? বিশেষতঃ, এই শরদাগমে যখন প্রত্যেক তরুণতা উজ্জল স্ত্রীমণ্ডি বেষ ধারণ করে, কৃষকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটারের চারিদিকে খানা ডোবা জলে পরিপূর্ণ থাকে, এবং তাহার উপর চাঁদের আলো পড়িয়া তাহাদের নয়নসমক্ষে পল্লীপ্রকৃতির স্নিগ্ধোজ্জল বিশদ শারদ সৌন্দর্য বিকশিত হয়, সমস্ত গ্রামখানি ছবির মত সুন্দর দেখায়,—গ্রামে আউসের পোয়ালাগাদা হইতে একটা সিন্ধু সোঁধা গন্ধ উঠিতে থাকে, আর গৃহ প্রান্তস্থ কদম্বগাছে কদম্বফুলের ও বেড়ার ধারের অম্বুরোপিত রজনীগন্ধার ঝাড় হইতে প্রস্ফুটিত রজনীগন্ধার স্নিগ্ধ গন্ধ বিকীর্ণ হইয়া তরল জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিকে রূপ রস ও গন্ধের মোহে আচ্ছন্ন করে, তখন এই সকল মিলনকর পল্লীবাসীর কঠোর পরিশ্রম-কাতর ক্লান্ত জীবনের নীরস মরুস্তর সিন্ধু করিয়া নব প্রস্ফুটিত কুসুমের স্থায় অম্লান কবিশ্বের মধুর স্রী বিকশিত হইয়া উঠে। তাহার কি চার, তাহা জানে না, তাহাদের হৃদয় কোন্ অপার্থিব রম্যের সন্ধান পাইয়া তাহা লাভ

করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এই সকল অশিক্ষিত
অবোধ কৃষকসন্তান ও শ্রমজীবীগণ বুঝিতে পারে না; কিন্তু তাহাদের
এই ব্যাকুলতা রুদ্ধ হৃদয়ের অন্ধকার অন্তরালে আবদ্ধ না থাকিয়া,
বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির কোমলমধুর সন্ধন্ধ সংস্থাপিত করিয়া
দেয়, এবং তাহাদের হৃদয় ও মন স্বাক্ষরিত করিয়া বহুপূর্বযুগের
পল্লীজীবনের সুখ দুঃখ আশা ভয় বেদনা ও মোহে বিজড়িত একটি
করণ সঙ্গীতোচ্ছ্বাস তাহাদের মুক্ত কণ্ঠে নবভাবে আত্মপ্রকাশ করে,—তাই
বেহুলা ও নখিন্দরের বিচিত্র কাহিনী পল্লীগ্রামে পুরুষপরম্পরায় মুখে মুখে
চলিয়া আসিতেছে।

রাত্রি প্রায় এগারটার সময় আমাদের নৌকা বলরামপুরের ঘাটে
উপস্থিত হইল। তখন চারিদিক নিস্তব্ধ। চন্দ্র পশ্চিম আকাশে ঈষৎ
চলিয়া পড়িয়াছে। নদী স্থির। ঘাটে বড় বড় মহাজনী নৌকা বাঁধা
রহিয়াছে;—তাহার ভিতর প্রদীপগুলি নিবাইয়া আরোহিণ ঘুমাইয়া
পড়িয়াছে। কেবল একখানি নৌকার উপর বসিয়া একটি লোক বাঁশী
বাজাইতেছে; লোকটি একালের কোন সত্য উপন্যাসের বিরহী নায়ক
কি না জানি না, এবং তাহার বাঁশীতে কি গান গীত হইতেছিল, তাহাও
বলিতে পারি না; কিন্তু যে সুর কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল,
তাহা নিতান্ত অপরিচিত বোধ হইল না। সেই রাগিণীতে নিরাশ হৃদয়ের
অবসাদ ও ভ্রান্ত চেতনার সত্যের স্মৃতি অল্পশোচনা ধ্বনিত হইয়া,
চন্দ্রালোকে বিক্ষিপ্ত হইয়া, স্তম্ভ চরাচরকে যে কঠোর বৈরাগ্যবন্ধনে
আবদ্ধ করিতে চাহে, তাহাতে সাধারণের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না,
এই সত্য প্রতিপন্ন করিবার জন্যই যেন জলের ধারে দাঁড়াইয়া দুই জন
লোক তত রাত্রেও অশরের রক্ষিত 'বিস্তি'গুলি টানিয়া তীরে তুলিতেছে,

এবং যে দুই চারিটা চিড়ি পুঁটি পাইতেছে, তাহা টোকরাতে ঝাড়িয়া লইতেছে। চুরির সামগ্রী বহিয়া লইয়া বাইবার-জনা ইহারা বাড়ী হইতে ‘আধার’ পর্যাঙ্ক সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে; কি নির্ভীকতা!—কিন্তু আমি পল্লীগ্রামের কথা বলিতেছি, এখানে এরূপ চুরির আশোষ চলে!

আমরা জন্তপদে গ্রামের মধ্যে চলিলাম। কোথাও সাড়াশব্দ নাই। শুধু গ্রামের অন্য প্রান্ত হইতে মধ্যে মধ্যে কুকুরের চীৎকার আর গ্রাম্য চোকীদারের উচ্চ কণ্ঠধ্বনি নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে।

* * * *

পরদিন সন্ধ্যাকালে হালদারদের ঠাকুরবাড়ীতে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিলে সকলে ঝুলন দেখিতে চলিলাম। হালদারদের ঠাকুরবাড়ীটি বেশ পরিষ্কার, দক্ষিণদ্বারী ঠাকুর-ঘর অতি প্রাচীন দেবালয়; তাহার সম্মুখের শ্রীভট্ট দেওয়ালে ভাস্করশিল্পের কতক চিত্র এখনও বর্তমান। সম্মুখেই কার্ণিশের নীচে লোহিতকান্তি স্কুলোদয় গণেশ ঠাকুর লিখিবার ভঙ্গীতে মুখিকাসনে উপবিষ্ট; তাঁহার উভয় পাশে প্রত্যেক খিলানের মধ্যে এক একটি পরিমূর্ত্তি পাখা মেলিয়া যুক্তকর উর্দ্ধে তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঠাকুরঘরের চারিদিক চকমিলান ছোট ছোট কুঠুরী; রমণীগণ চিকের অন্তরালে বসিয়া রামায়ণ শুনিবেন বলিয়া এই সকল কক্ষদ্বারে সবুজবর্ণের জীর্ণ চিক লম্বমান রহিয়াছে। কদম্বকুল ও আম্রপত্র রঙ্জুবদ্ধ হইয়া সমস্ত প্রাঙ্গনটি বেঠেন করিয়া আছে। ঠাকুর-ঘরের এক প্রান্তে একটি স্থান ইট দিয়া গোলাকারে বাধান, প্রতি-দিবসে পূজার ফুল, জল, তুলসীপত্র ও দুর্বাদল এই স্থানে নিক্ষিপ্ত হয়; তন্মধ্যে দৈবাৎ দুই পাঁচটা ধান পড়িয়া বড় বড় ধানগাছ জন্মিয়াছে। লক্ষ্মী-নারায়ণের গৃহের অদূরে বক্সীদের পড়া ভিটার উপর প্রায়

পাঠশালা। পাঠশালার ছেলেরা সন্ধ্যোগ পাইলেই মধ্যাহ্নে পাঠশালা হইতে পলাইয়া গোলাপ ফুলের লোভে এই উৎসৃষ্ট পুষ্পাধারের কাছে সমবেত হইয়া জটলা করে।

অত্রাশ্রয় দিন লক্ষ্মীনারায়ণের দ্বারে সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই হালদার-পাড়ার যত বর্ষীয়সী রমণী ও বিধবাগণের ‘কম্বিটা’ বসে; বিশেষতঃ, একাদশীর দিন আহালাদির কোন আয়োজন করিতে হয় না বলিয়া রমণীগণ কিছু সকাল-সকাল এখানে আসিয়া সমবেত হন, এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহাদের আলোচনা চলে। তাঁহাদের সকলের হাতেই নানাবর্ণের হরিনামের ঝুলির মধ্যে মোটা মোটা মালা থাকে, এবং অনেকেই কোঁটা তিলক কাটিয়া আসেন; কিন্তু তাঁহাদের আলোচনার বিষয় স্বতন্ত্র। কাহাদের কোন্ বৌ স্বাগুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করে, কোন্ স্বাগুড়ী ‘বৌ-কাঁটকী’, কোন্ অপদার্থ যুবক স্ত্রীর প্রতি প্রকাশভাবে মেহ প্রকাশ করে, এবং কোন্ সুবুদ্ধি ছেলে মায়ের সংপন্নানর্শে নিরীহ স্ত্রীটিকে জুতাপেটা করিয়া মাতৃ-আদেশ পালনের ফলে স্বর্গের দ্বার মুক্ত করে, এই সকল গল্পই তাঁহাদের মধ্যে উৎসাহের সহিত চলিয়া থাকে; এবং প্রতিদিন এই একই বিষয়ের নবাবতারণায় তাঁহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে না! ঝুলন উপলক্ষে আজ কাল এই বৈঠক বন্ধ রহিয়াছে।

আমরা দেবালয়ের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, লক্ষ্মীনারায়ণ আজ গৃহ হইতে বাহির হইয়া দালানে আসিয়াছেন; লাল কাপড়ে মোড়া রজ্জুতে আবদ্ধ দেবসিংহাসনখানি আড়ার সঙ্গে ঝুলিতেছে। সিংহাসন-খানি রূপালী রাস্তার বিমণ্ডিত, মধ্যে নারায়ণ ক্রিষ্টাব্দে দণ্ডায়মান, পদতলের হিন্দুলের রেখা হইতে মস্তকের চূড়া পর্য্যন্ত সবটাই বাক; শিশিপুচ্ছ হেলিয়া লক্ষ্মীঠাকুরাণীর চূড়ার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছে। ঠাকুরের

অধরে বাঁশরী, কিন্তু দৃষ্টি ঠাকুরাণীর নখচক্রভূষিত স্নগোল মুখখানির উপর স্থাপ্ত; ঠাকুরাণীও কম নন, মুখখানি ঈষৎ উন্নত করিয়া প্রফুল্ল-দৃষ্টিতে ঠাকুরের স্মৃতিত্ৰিত মুখের দিকে চাহিয়া আছেন।

ঠাকুর-ঠাকুরাণীর সম্মুখে ও দুই পাশে ছোট ছোট জলচৌকির উপর অষ্টসখীর মৃগ্ময়ী মূর্তি; ঝুলন উপলক্ষে এগুলি প্রস্তুত করান হইয়াছে। ছবিগুলির মধ্যে 'বড়াই বুড়ী' নামী ব্রজগোপীর ছবিই কিছু বিচিত্র ও হাত্তোদ্দীপক। তাহার পরিধানে সাদা ধান, জু ও মুক্ত কেশ অতি শুভ্র, চন্দ্র লোল, দেহকান্তি বিবর্ণ, দেহযষ্টি বার্কাক্য-ভারে সম্মুখের দিকে নত হইয়া পড়িয়াছে; হাতে একখানি লাঠি। নানারঙ্গের শাড়ী ও গহনা পরিয়া বৃন্দা, ললিতা, বিশখা প্রভৃতি সখীগণ দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের সকলের মুখেই হাসি। নিকটে প্রকাণ্ডকায় বিশালোদর পুরোহিত ঠাকুর উপবিষ্ট; শুভ্র উপবীত দ্বারা তাঁহার কণ্ঠ পরিবেষ্টিত; স্বন্ধে গামছা। মধ্যে মধ্যে কাঁশর ঘণ্টা বাজিতেছে, শঙ্খধ্বনি হইতেছে; দেউড়ীতে বসিয়া দুইজন ঢুলি ঢোল পিটিতেছে, কাঁশি খন্-খন্ করিয়া বাজিতেছে; আর পুরোহিত ঠাকুর লক্ষ্মী-নারায়ণের সিংহাসনখানি এক একবার দোলাইতেছেন।

ঠাকুরবাড়ীর সম্মুখে দেবদারু ও কামিনীপত্র-ভূষিত কদলীতোরণে তিনটি কাচের হাঁড়ি ঝুলিতেছিল; তাহাতে বাতি জলিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের নিকট সেজে বাতি প্রজ্জ্বলিত হইল চাতালের অন্তরাল হইতে শরৎচন্দ্র জ্যোৎস্না ক্রমে ক্ষুণ্ণতর করিয়া কোতুকমর প্রাদীপ্ত নেত্রে এই মধুর উৎসব দেখিতে লাগিলেন। দর্শকগণ প্রাক্কনে সতরকির উপর বসিয়া মুগ্ধনেত্রে দেবসৃষ্টির দিকে চাহিয়া আছে। রক্ষীগণের কেহ গৃহান্তরালবর্তী নেপথ্য দ্বারা চিকের কাছ আসিয়া বসিতেছেন,

কেহ উঠিয়া যাইতেছেন, কেহ অফুটস্বরে গল্প করিতেছেন। হুই একটি রূপবতী কিশোরী বারান্দার উপর দিয়া ঠাকুর-দালানে আসিয়া ঝুলন দেখিয়া, এবং একবার ফুলের মত সুন্দর মুখখানি ফিরাইয়া সমাগত দর্শকগণের প্রতি কোতুল-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চিকের ভিতর প্রবেশ করিতেছে।

সন্ধ্যার পর ঠাকুর-ঠাকুরাণীর আরতি ও বৈকালিক শেষ হইলে ‘গাছ রামায়ণ’ (রাম-রসায়ণ) আরম্ভ হইল। দর্শকগণ গায়কদ্বিগের জন্ত সমুখের আসন ছাড়িয়া দিয়া পশ্চাতে সরিয়া বসিল; চিকের আড়ালে রমণীকণ্ঠের অফুট শব্দকল্লোল, বালার সঙ্গে চুড়ীর, মলের সঙ্গে গুঞ্জরীপঞ্চমের ধুং-ঝুং ধ্বনি উথিত হইল। সকলেই অগ্রবস্তী আসন-অধিকারের চেষ্টা করিতে লাগিল।

এই রামায়ণ-গায়কেরা সর্বসমেত ছয় সাত জন লোক। ইহারা সাধারণতঃ ভাট ব্রাহ্মণ; সকলেরই কণ্ঠ শুভ্র উপবীত-বেষ্টিত; নাসিকার উপর সুদীর্ঘ তিলক, সর্কাজ চন্দনচর্চিত; পরিধানে সুন্দররূপে কৌচান সাদা থানধুতি, গলায় মোটা কাঠের মালা, তো-করা ধোপদস্ত চাদর কোমরে বাধা; হুই তিন জন গায়কের ফাটা পায়ে বিবর্ণ নুপুর, হু-জনের হাতে মন্দিরা; কেবল যে লোকটা দলপতি, তাহার হাতে একটি চামর;—এই চামর সাধারণ চামরের মত নহে, কেশগুলি কাল, গোড়াটা রূপা দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধানো, তাহাতে এক গাছি মোটা সুতা বাঁধা আছে, অধিকারীর বাম প্রকোষ্ঠে সেই সুতা জড়ানো, তাহাতে এই অপক্লপ চামর ঝুলিতেছে।

অধিকারী আসরে নামিয়া প্রথমে লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্দেশে প্রণাম করিল, অননই ‘দোয়ারে’রও একযোগে দেব দেবী-চরণে প্রণাম করিয়া

নাচিতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে প্রবলবেগে মন্দির বাজিয়া উঠিল, অধিকারীর সঙ্গিগণ নাচিয়া নাচিয়া গানের ধূয়া ধরিল; “ওরে-রে-রে-না-নারে” শব্দ পাড়া মাতাইয়া তুলিল।—তাহাদের হাত মুখ নাড়িবার কিবা মনোহর ভঙ্গী!—সহসা এই অপূর্ব তানের মধ্যপথে অধিকারী উঠিয়া উভয় বাহু বিস্তার করিয়া সঙ্গিগণকে নিরস্ত করিয়া স্বয়ং গান ধরিল।

আজিকার গানের বিষয় ‘সীতামিলন’। লক্ষ্মণ সীতাদেবীকে ছলনা করিয়া মহর্ষি বান্দীকির আশ্রমোপকণ্ঠে আনিয়া বনবাস দিয়া গিয়াছেন। মহর্ষির কুটীরে গর্ভবতী সীতাদেবী অতি কষ্টে দিনপাত করিতেছেন; সেখানে লবের জন্ম হইয়াছে। পঞ্চমবর্ষীয় শিশু নিদ্রিত লবকে কুটীরে রাখিয়া জানকী সন্ধ্যাকালে কলসীকক্ষে আশ্রমপ্রাপ্তবাহিনী তন্নসাবক্ষে জল আনিতে গিয়াছেন; লব নিদ্রাভঙ্গে মাতার অহুসরণ করিয়াছে, ধ্যানমগ্ন বান্দীকি তাহা জানিতে পারেন নাই; ধ্যানভঙ্গে তিনি দেখিলেন, নিদ্রিত শিশু কুটীরে নাই! পতিপরিত্যক্তা দুর্ভাগিনী সতী সেই শিশুপুত্রের মুখ দেখিয়া এত দুঃখেও প্রাণধারণ করিতেছিলেন; অভাগিনীর জীবনের সুখশান্তি সকলই ফুরাইয়াছে, নদী হইতে কিরিয়া আসিয়া যদি তাহার একমাত্র অবলম্বন পুত্রকে দেখিতে না পান, তাহা হইলে কি সাধীর দেহে প্রাণ থাকিবে? বান্দীকির মনে মহা দুঃস্বপ্নের সঞ্চার হইল। অবশেষে তিনি কোন উপায় না দেখিয়া কুশ দ্বারা একটি শিশুপুত্র নির্মাণ-পূর্বক যোগবলে তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন।

এ দিকে সীতাদেবী লবকে সঙ্গে লইয়া সজল-কলসী-কক্ষে কুটীরে প্রত্যাগত হইলেন, দেখিলেন, কুটীরে আর একটি শিশু, দেবশিশুর মত সুন্দর, গঠন তাহারই ‘পরানপুতুলী’ লবের অমুরূপ!—দেখিয়া তাহার

নয়নে আনন্দাশ্রু সঞ্চার হইল, তাঁহার স্তন হইতে ক্ষীরধারা করিতে লাগিল; তিনি এই অলঙ্কারিতপূর্ব্ব পুত্রটিকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখচুষন করিলেন। হই পুত্র 'শুরুপক্ষের শশী হেন' দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল। তাহারা বনে বনে খেলা করিয়া বেড়ায়, শরজালে নদীতরঙ্গ রোধ করে, হিংস্র জন্তুদিগকে বন হইতে বনান্তরে তাড়াইয়া লইয়া যায়।—অধিকারী কখন গানে, কখন বক্তৃতায় এই কাহিনী কীর্ত্তন করিতে লাগিল। লবকুশ পাঠশালায় যায়, ঋষিপুত্রগণ কোতূহলের বশবর্তী হইয়া তাহাদের পিতার নাম জিজ্ঞাসা করে; লবকুশ বলিতে পারে না দেখিয়া কঠোর উপহাস করে, তাহাদের সঙ্গে খেলিতে চায় না! শিশু দুটি অভিমানভরে কাদিতে কাদিতে কুটীরে মায়ের কাছে ফিরিয়া আসে, বাপের নাম জানিতে চায়; সীতাদেবী কোন উত্তর না দিয়া তাহাদিগকে ক্রোড়ে লইয়া অশ্রুমোচন করেন, নয়নজলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যায়। লবকুশ মায়ের চোখে জল দেখিয়া অপমান অভিমান সকলই ভুলিয়া যায়; মায়ের অঞ্চল দিয়া তাঁহার চক্ষু মুছাইয়া হুই ভাই আবার বনের ধারে খেলিতে ছুটিয়া যায়।—রামায়ণ গায়কেরা যখন তানলয়ে এই করুণ কাহিনী কীর্ত্তন করিতে লাগিল, তখন সববেদমাত্র শ্রোতাদিগের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল; কেহ চাদরে চক্ষু মুছিল; কাহারও অশ্রুধারার গণ্ডস্থল প্লাবিত হইল; কোন বৃদ্ধ ভাবাবেগে গদগদকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “বলিহারি ভাই, বেঁচে থাক!” রমণীগণ অঞ্চল টানিয়া সিক্ত চক্ষুঃপ্রান্ত মার্জন করিলেন। এই করুণ সঙ্গীতে তাঁহাদের বেহাগ্রবণ মাতৃহৃদয় উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।

ক্রমে সেই বনে রামচন্দ্রের অর্থবেধের তুরঙ্গ আসিয়া দেখা দিল। তুরঙ্গ কিরূপে নাচিয়া নাচিয়া ঋষির আশ্রমদিকটে উপস্থিত হইল—

অধিকারী উভয় হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া তাহার কালো চামর ভুলাইয়া
ঘাড় বাঁকাইয়া নাচিয়া নাচিয়া তাহা দেখাইয়া ধূয়া ধরিয়া গায়িতে
লাগিল,—

“তুরঙ্গ চলে রে,
অশ্বমেধের তুরঙ্গ চলে রে,
রামের অশ্বমেধের তুরঙ্গ চলে রে,
—নাচিয়া নাচিয়া চলে রে।”

সঙ্গে সঙ্গে অত্যাঁত গায়কেরা নৃপুংর বাজাইয়া নৃত্যসহকারে অধিকারীর
অনুসরণ করিতে লাগিল। তুরঙ্গমের ললাটে জয়পত্র বাঁধা, তাহাতে
লেখা,—

“বীরের বেটা বীর হবে যেই,
এ তুরঙ্গ ধরিবে সেই।”

অশ্বমেধের এই তুরঙ্গ কোথাও কোন বাধা পায় নাই; আজ বান্দীকির
তপোবনপ্রান্তে লবকুশ সেই বিজয়ী তুরঙ্গ ধরিল! অশ্বের সঙ্গে সেনাদল
ছিল, লবকুশের সহিত তাহাদের যুদ্ধ বাধিল। ক্রমে শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণ,
ভরত,—সকলেই লবকুশের শরজালে ক্ষতাপ্ত হইয়া ধূলিশব্দায় শায়িত
হইলেন; হনুমান, জাম্ববান, নল, নীল, অঙ্গদ, বিভীষণ সকলেই বাঁধা
পড়িল! শেষে নবজলধরশ্রাম রামচন্দ্র,—মন্তকে রাজমুকুট, কর্ণে কুণ্ডল,
হস্তে স্নদীর্ঘ শরাসন,—রণস্থলে প্রবেশ করিলেন।—পিতাপুত্র জীবনের
মধ্যে এই প্রথম সাক্ষাৎ!

রামচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া প্রথমে প্রকাশ করিলেন যে, লবকুশকে
দেখিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত পুত্রস্নেহের উদয় হইয়াছে; অতএব
বালকেরা যদি আত্মসমর্পণ করে, তাহা হইলে তিনি তাহাদের সকল

অপরাধ সার্জন করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু লবকুশ 'বাণ চেয়ে কঞ্চি দড়',—তাহারা স্পর্কার সহিত উত্তর করিল, 'তিনি ভাইয়ের স্বর্গশা দেখিয়া যদি তাঁহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে, তবে তিনি অনায়াসেই পলাইতে পারেন, তাহারা পলায়মান শত্রুর পৃষ্ঠে অস্ত্রাঘাত করিতে শেখে নাই। রামচন্দ্র এতটা অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না; তিনি বংশে বাতি নিতে লক্ষ্য রাখণ ও 'এক লক্ষ পুত্র তার সত্তরা লক্ষ নাতি'র মধ্যে কাহাকেও জীবিত রাখেন নাই, আর আজ দুটো 'হুখের ছেলে'কে ভয় করিবেন? তিনি ধমুকে তীর বুড়িলেন। অধিকারী হাত তুলিয়া চামর ঘুরাইয়া গারিতে লাগিল,—

“তখন দিলেন রাম ধমুকে টঙ্কার,

শব্দ শুনে জিভুবনে 'নাগে' চমৎকার।”

অধিকারীর দোয়ারগণ উচ্চ মুখে একবাক্যে স্তব করিয়া গারিল,—

“শব্দ শুনে জিভুবনে 'নাগে' চমৎকার।”

কিন্তু এই শিশু হু'টির তাহা শুনিয়া কিছুমাত্র চমৎকার 'নাগিল' না! তাহারা 'চোখা চোখা' বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। রাবণবিজয়ী রামচন্দ্র দুই ভাইয়ের স্ত্রীকে বাণ খাইয়া বলিলেন,—

“লবের বাণে অঙ্গে মরি,

কুশের বাণ সহিতে মারি।”

অবশেষে রামচন্দ্রও ধরাশায়ী হইলেন; চারি দ্রাতার কেহই জীবিত রহিলেন না। বৃদ্ধাবসানে লবকুশ হস্তবানকে বাধিয়া একটা আশ্রয় জানোয়ার ভাবিয়া নাকে দেখাইবার জন্য টানিয়া লইয়া চলিল। স্তম্ভোদ্ভবপ্রান্তে বা জানকীর সহিত হস্তবানের সাক্ষাৎ হইল। সেই একদিন, আর এই একদিন! কতদিন পূর্বে বৌদ্ধের সেই প্রথম রক্তস্রবের স্বর্ণসৌন্দ-

কিরীটিনী রক্ষোবাহিনী লঙ্কার বক্ষোবিরাজিত তুর্গম অশোকবনে দ্রুত
চেতনালবীণাধিতা পতিবিরহবিধুরা অশ্রুধী সীতার নিকট হনুমানই
সর্বপ্রথমে সুবিস্তীর্ণ লবণাধুরাশি পার হইয়া রামচন্দ্রের অভিজ্ঞানামুরীম
বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল; আর আজ জীবনের সুখশান্তিবিরহিত এই
জালাময় মধ্যাহ্নে, তমসাতীরসসিহিত শান্তমুন্দর অটবীর অভ্যন্তরে,
মুনিকস্তাগণের সুমধুর-কলকণ্ঠমুখরিত ছায়াচ্ছন্ন পর্ণকুটীরপ্রান্তে সেই
হনুমানই বহু বর্ষ পরে আজন্মদুঃখিনী নির্বাসিতা অভাগিনীকে পুনঃপুণ্ড্র
আর্য্যপুত্রের সসৈন্ত নিধনবার্তা জ্ঞাপন করিল। দুঃখে কষ্টে ভক্তবীরের
হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল; অভিমানগদগদ-কণ্ঠে হনুমান বলিল, “এমন
পিতৃহাতী সন্তানও গর্ভে ধরেছিলি, মা!”—সীতাদেবী সংজ্ঞাহত
হইয়া ছিন্নমূল লতার স্তায় ভূতলে পড়িলেন! ‘হৃদয়ের ছেলে’, লবকুশ
কিছুই বুঝিল না, মায়ের পদপ্রান্তে পড়িয়া ধূলায় লুটাইতে লাগিল।
তাঁহার পর মুচ্ছাভঙ্গে জানকী চিত্তা সাজাইয়া শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণ
বক্ষে ধরিয়া তাহাতে অগ্নি দিবেন, এমন সময় বায়ীকি সেখানে উপস্থিত
হইলেন। তিনি তাঁহার তান্ত্র-কমণ্ডলুস্থিত অমৃতকুণ্ডের জল সেচনে
বীরগণের মৃত দেহে জীবনসঞ্চার করিলেন; তখন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণাপ্রসাদিনী
সীতাদেবী বহুপুণ্ড্র ‘অমৃতের খণ্ডের’ মত অন্ন ও বনজাত শাকশবজী দ্বারা
ব্যঞ্জন সাজিয়া পরিপ্রান্ত সূষিত কটকের স্মৃতিবারণ করিলেন। রাম লক্ষণ-
ছিন্ন শত্রু কলীপত্রে ভোজন করিতে বসিলেন।

প্রদিন লবকুশ বায়ীকির সহিত অবোধার রাজসভার নিবরণ রাধিতে
জলিল। সভার রামারণ গান হইল। মহর্ষির কোমল-মধুর কবিতার বিরচিত
ও শিশুকণ্ঠ-নিঃসৃত সেই করণ সঙ্গীত শ্রবণে সকলে—অবোধার
সকল অধিদাসী বিরহ হইল; রামচন্দ্র রাজসিংহাসন হইতে অধিরা

তাপসপুত্রবংশী লবকুশকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। কত কাল পরে, কত সুদীর্ঘ বিরহের অবসানে, রামচন্দ্রের সহিত সীতাদেবীর মিলন হইল! সমগ্র অযোধ্যা আনন্দে জয় গান করিতে লাগিল। অধিকারী স্বকর্তৃ, সঙ্গীতের বিষয় সাক্ষর; সকলে একবাক্যে গায়কের প্রশংসা করিতে লাগিল। ঘন ঘন হরিশ্চন্দ্রের ধূম পড়িয়া গেল।

রাজিও অধিক হইয়াছিল। রামায়ণ-গায়ক অধিকারী নিবেদন করিল, ‘পালা’ শেষ হইল, এখন শ্রোতৃবর্গের অনুমতি হইলে গীত বন্ধ করা যায়। সকলেই ইহার অনুমোদন করিল। দুই একটি কুখ বালক সেখানে বসিয়া গান শুনিতেছিল; তাহাদের গুরুজন কর্তৃক অমুস্ক হইয়া অধিকারী তাহাদের সর্ব্বদে তাহার চামর বুলাইয়া দিল, বলিল, ইহাতে তাহাদের সকল ব্যাধির শান্তি হইবে। আশস্ত বালকেরা অধিকারীকে প্রশংসা করিল।

পূর্ণিমার দিন ঝুলন শেষ হইল। সেদিন দলবদ্ধ পুণ্ড্রগ্রামস্থ ভক্তলোকদিগের হস্তে জরির খোপবিশিষ্ট লাল রেশমের ‘রাধি’ বাঁধিয়া দিল। রাধি বাঁধিয়া তাহারা কিছু কিছু পুরস্কার পায়। বাড়ীর ছোট ছোট মেয়েরা সাগ্রহে সেই সকল ‘রাধি’ সংগ্রহ পূর্ব্বক সমস্ত পুতুলের কাছে তুলিয়া রাখে; এগুলি তাহাদের ‘ছেলে মেয়ে’র মূল্যবান অলঙ্কার!

• রাধি-পূর্ণিমা পর্ব্বতবেষ্টিত অরণ্যময়সঙ্কুল সুদূর রাজধানের অতি প্রমোদনরম্য পারদোৎসব; বহুদূরবর্তী শতশ্রামল বস্ত্রের প্রাক্ষেপে সুদূর পল্লীগায়ে আজ সেই নখর উৎসবের আনন্দপূর্ণ আভাস অনুভূত হইতেছে; এবং প্রত্যন্তের এই সমুজ্জল আলোক, নীল আকাশে অস্ত্রের স্তার গুলে মেঘবস্ত্রের সুন্দর সাক্ষর, সতেজ বৃক্ষপত্রের নৃত্যরূপ, ধাতুবিহীন

বিস্তীর্ণ আউসক্ষেত্রে বিহঙ্গমকুলের সহর্ষ কাকলি প্রকৃতই উপভোগ্য। —
কতকাল পূর্বে এমনই দিনে হিন্দুরাজগণ দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন,
এবং রাজপুত্র বীরগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া হস্তকোলাহলে অরণ্য প্রান্তর
ধ্বনিত করিতে করিতে মৃগয়ায় যাত্রা করিতেন।

অদূরে ঐ কলপ্রবাহবন্ধারিতা আবর্তময়ী তরঙ্গিণীর তীরে যে ঝাঁকড়া
প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছটি ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তাহার শাখায় দড়ি ঝুলাইয়া
কৃষকের ছেলে মেয়েরা মনের আনন্দে ছলিতেছে; এবং দূরে নিবিড়
ভূট্টাক্ষেত্র পাহারা দিতে দিতে গাছের ছায়ায় বসিয়া দেশোয়ালীদের
মেয়েরা অতি করুণ মধুর স্বরে নির্জজন কানন প্লাবিত করিয়া যে ‘গজল’
গায়িতেছে, তাহা শরতের পীতরৌদ্রবিধৌত ধরাতলের ‘ফুট মর্ষকাহিনীর
স্তার প্রতীত হইতেছে। রাতেও তাহাদের এই গানের বিরাম নাই;
জ্যোৎস্নালোকে মৃৎকুটারের দাওয়ার বসিয়া দুই তিনটি রমণী গম পিষিতে
পিষিতে সম্বরে গান গায়িতেছে; অত্র দিকে ভাঙ্গা-ঝুলনের শেষ বাজনা
বাজিতেছে। যুগান্তরপূর্বে প্রেমপুলকিত বৃন্দাবনের পত্রগুপ্প-সজ্জিত
গোপাঙ্গনপরিবৃত নিভৃত কুঞ্জকাননের অভ্যন্তরে যে ঝুলনোৎসবের অহুষ্ঠান
হইয়াছিল, তাহারই আনন্দময় বার্তা কোমল পুষ্পগন্ধসাকুল্যে, সুমোহন-
বংশীরব-বিরোহিতা, তরল-কদম্ব-ভূষিতা কল্লোলময়ী যমুনার উষ্মলিত তরঙ্গে
আবর্তিত অতীত স্মৃতির স্তার, ভাঙ্গা ঝুলনের বাস্তবধ্বনির ও দেশোয়ালী
রমণীগণের তরল সঙ্গীতের তালে তালে ভাসিয়া আসিয়া পল্লীবাসিগণের
হৃদয়ে শান্তি ও মধুরতা বর্ষণ করিতেছে।



নৈকোঁসব ।

নন্দোৎসব

—:~::~—

‘ভরা ভাদ্রে’ পল্লী-দৃশ্যের সম্পূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়! খাল বিলগুলি জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। কর্দমের পথে জনমানবের সমাগম নাই বলিলেও চলে। জলপূর্ণ ডোবাগুলি হইতে ভেকের অবিরাম মকধ্বনি উঠি হইতেছে। গ্রামলা প্রকৃতি অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় সিক্ত হইয়া লতাপল্লবের প্রাচুর্য্যে নবীন শ্রীধারণ করিয়াছে। রাখালের দল তালপাতার ছাতা মাথায় দিয়া কোন গাছতলার বসিয়া আছে; গরুগুলি ইচ্ছামত মাঠের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; সহসা বিনা-আড়ম্বরে রূপ-রূপ করিয়া বৃষ্টি আসিতেছে, আর গরুগুলি কোন গাছতলার দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে, তাহাদের শরীর বহিয়া শত ধারায় জল ঝরিতেছে; কিন্তু তাহাদের রোমন্বনের বিরাম নাই! পাখীগুলি বৃক্ষের ঘনপত্রের মধ্যে বসিয়া ভিজিতেছে; ছই-চারিটা ভিজে কাক গৃহস্থের ঘরের আলিসার উপর বসিয়া চীৎকার করিতেছে। গ্রাম্য পথ দিয়া যে ছই একখানি গরুর গাড়ী চলিয়াছে, তাহাদের চাকাগুলি কর্দমলিপ্ত, বলদের ও গাড়ো-রানের সর্কাক কর্দমাবৃত।

আজ জন্মষ্টনী। গ্রাম হইতে নদীতীরে বাইবার সংকীর্ণ পথগুলি জনহীন। রবীণগণ ত্রাওড়া গাছের গোড়ায় এক হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া সতয়ে স্নান করিয়া লইতেছে; কোন বালিকা কলসীতে জল সিক্ত একটু বেশী জলে নানিবার ছুসোহস প্রকাশ করিলেই ডাহার দিদি

বা ভাজ তাহাকে শাসাইতেছে। বর্ষায়দী ও বৃদ্ধা রমণীগণ অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া নানশেষে উঠিয়া যাইতেছে। যাহারা উপবাস করিয়া আছে, তাহারা নিশ্চিন্তমনে অনেক বেলায় নান করিতেছে; আজ ত আর আহাৰাদির চিন্তা নাই, কেবল পুরোহিত ঠাকুর জন্মাষ্টমীর ব্রতকথা শুনাইতে আসিয়া পাছে ফিরিয়া যান, এই যা ভয়! কিন্তু তাঁহার কাজ তিনি কখনও অসম্পূর্ণ রাখেন না; তবে ঠাকুরের মুখ বড় শায়েস্তা নয়; গোবিন্দপুরে এমন গিল্লি নাই, যাহাকে গ্রামের পোনে ঘোল আনা গৃহস্থের পুরোহিত শ্রীকান্ত শিরোরণির দুইটি একটি ও দুর্কাক্য নিঃশব্দে পরিপাক করিতে না হয়।

পুরোহিত ঠাকুরের আজ উপবাস; তিনি সংযম করিয়া আছেন, সকল যজমান-বাড়ীতেই আজ জন্মাষ্টমীর ‘কথা’ শুনাইতে হইবে; রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলে পূজার্কনার পর তিনি জলযোগ করিতে পারিবেন। ক্লান্তি ত্রাঙ্কণের মেজাজ আজ বড় ক্লম; তিনি গায়ে নামাবলী জড়াইয়া অপরাহ্নকাল হইতেই প্রত্যেক যজমান-বাড়ীতে ব্রত-কথা শুনাইয়া বেড়াইতেছেন।

কথা শুনাইতে শুনাইতে ক্রমে বেলা শেষ হইয়া আসিল। সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অন্ন অন্ন বৃষ্টি পড়িতেছে। অদূরবর্তী বিস্তীর্ণ নদীর চঞ্চল বক্ষে কাল মেঘের ছায়া পড়িয়াছে; বাউগাছে বাতাস লাগিয়া সন্-সন্ শব্দ হইতেছে; পুরোহিত ঠাকুর তালপত্রের হস্তলিখিত দীর্ঘ পুঁথিখানি সম্বন্ধে নামাবলীর মধ্যে ঢাকিয়া লইয়া, উর্দ্ধভন তিন পুরুষের ব্যংহত, বহুতালিবিশিষ্ট, লোহার দ্বাৰাট-ওয়ারা, জীর্ণ, সজ্জিত ছাতাটিতে মাথা ঢাকিয়া জনহীন পথ দিয়া ধীরে ধীরে যজমান-বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন।

“আঃ, আজ কি দুর্যোগ ! জন্মার্তীর দিন চিরকালই এমনই দুর্যোগ হয়,—ওগো তোমরা কোথায় ?”—বলিয়া পুরোহিত গৃহকর্তাকে আহ্বান করিলেন। একখানি ‘পাচালা’ ঘরের দ্বারদেশে বসিয়া হরিনামের মালায় করঃসংযোগ পূর্বক বৃদ্ধাকর্তা পুরোহিতের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন ; বড় বৌ, মেজ বৌ, ছোট বৌ, তাঁহার কাছে বসিয়া ছিলেন। পাড়ার আরও তিন চারিট দরিদ্রা বিধবা কথা শুনিবার জন্য সেখানে উপস্থিত ; ছেলে মেয়েরা পর্য্যন্ত আজ খেলা-ধূলা ছাড়িয়া কর্তাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে,—আজ তাহারাও জন্মার্তীর ব্রতকথা শুনিবে। পুরোহিতের আহ্বানে গৃহকর্তা উত্তর করিলেন, “এসো ঠাকুরপো ! তোমার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে আমরা কত ভাবছিলাম ; জলে ভিজেছো দেখ্‌চি যে ! কাপড় ছাড়বে কি ?” “না, থাক, যজ্ঞমেনে পুত্রতের আর স্ত্রুথ কোথায় ?” বলিয়া পুরোহিত ঠাকুর বস্ত্রখণ্ডে আবদ্ধ পুঁথি খুলিতে লাগিলেন। তখন অন্ধকার হইয়াছিল। একটি ঘেরে মৃৎপ্রদীপ জালিয়া গৃহদ্বারের নিকটস্থ দীপগাছার রাখিতে গেল, আর তাহার দশ বাসের ছোট ভাইটি দীপশিখা দেখিয়া বাতৃ-ক্রোড় হইতে সেই দিকে হাত বাড়াইল ; বালিকা প্রদীপটি তাহার মুখের কাছে বুকাইয়া বলিতে লাগিল,—

“আলো রে আলো রে আঁধার ঘরে বাতি নড়ে,

যে আমার থোকনকে ধোঁড়ে, যেন তার মুখখানা পোড়ে।”

থোকা দীপশিখার দিকে একবার অর্দ্ধস্তম্বিতনয়নে চাহিয়া সাতার কোলে মুখ লুকাইল ; বা সম্মুখে পুত্রের মুখ চূষন করিলেন।

দীপগাছার উপর প্রদীপ রাখা হইলে পুরোহিত ঠাকুর পুঁথি খুলিয়া চোখে চশমা আঁটিয়া হ্রস্ব করিয়া জন্মার্তীর কথা পড়িতে হ্রস্ব করিলেন।

সে অতি পুরাতন কথা, কিন্তু বৃদ্ধারা প্রগাঢ় ভক্তিভরে সেই মধুর কাহিনী শুনিতে লাগিলেন; বালকবালিকারাও স্থিরভাবে সেই কোমল ঝঙ্কার শুনিতে লাগিল। সে কোন কথা? সে-ও এমনই এক চর্য্যোগের রাত্রি। সেই রাতে প্রবল ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল; নিবিড় মেঘে সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন, ঘোর অন্ধকার, এবং সমগ্র মথুরা সুস্থপ্ত; শুধু কংসের কারাগার-রক্ষক প্রহরীগণ সশস্ত্র জাগ্রত ছিল। অর্গলবন্ধ লৌহদ্বার-কারাগারে পাষাণভারলুপ্তিত বহুদেব অচৈতন্য, পার্শ্বে আসন্নপ্রসবী ভীতিবিহ্বলা দেবকী।—মথুরাত্রে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলেন। প্রসব-বেদনায় তখন দেবকী সংজ্ঞা-বিলুপ্ত। এমন সময় সহসা গগনপথে চন্দ্রভিষনি ঐত হইল, প্রাফুট পারিজাতের মিত্র সৌরভে নিরানন্দ কারাকক্ষ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; বহুদেবের বক্ষের তুর্কিবহ পাষাণভার অকস্মাৎ অপসৃত হইয়া গেল! তিনি উঠিয়া সেই কমললোচন নীল-কান্তি পুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া সকল কষ্ট বিস্মৃত হইলেন; কিন্তু পরদিন প্রভাতে নির্দয় কংসের হস্তে পুত্রের পরিণাম কল্পনা করিয়া তিনি আকুল হইয়া উঠিলেন, সমস্ত আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইল। অবশেষে বহুদেব সেই সন্তঃপ্রসূত কুমারকে সন্নেহে অঙ্কে ধারণ করিয়া নন্দালয়ে রাখিতে চলিলেন। লৌহ-অর্গলবন্ধ রুদ্ধ লৌহদ্বার ঝন্-ঝন্ শব্দে খুলিয়া গেল; দ্বারের প্রহরীরা কোষ মুক্ত তরবারি শিয়রে রাখিয়া ঘোর নিদ্রার আচ্ছন্ন! বহুদেব সন্তর্পণে দ্বার অতিক্রম করিয়া চলিলেন। অন্ধকারময় সুপ্ত রাজপথে জনমানবের সাড়াশব্দ নাই; ঝটকা মথিত ঘাসিনীর দীর্ঘ-শ্বাস বহিতেছে; বৃক্ষশাখা প্রবলবেগে আন্দোলিত হইতেছে; অশ্রান্ত বৃষ্টিধারার রাজশব্দ কর্দনিত হইয়াছে। বহুদেব সমস্ত বির অগ্রাহ্য করিয়া শিশুকে কোড়ে লইয়া চকিতবিহ্বললোকে বহুদার দিকে ছুটিলেন।

সন্ধ্যার স্তিমিত প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া পুরোহিত মেঘমল্লারে সরল সংস্কৃতে এই প্রাচীন কাহিনী পুঁথির পাতা উল্টাইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। মেঘ আকাশে আবার ঘনীভূত হইয়া আসিল।

একটি বহু পুরাতন অথচ চির নবীন দুঃখে রমণীগণের বন্ধু ভরিয়া উঠিল; বাহারা এই কাহিনীর এক বর্ণও বুঝিল না, তাহাদেরও চক্ষু ছল-ছল করিতে লাগিল। কথা শেষ হইলে সকলে অবনত মস্তকে পুরোহিত ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব সাধানুসারে হুই এক পরমা দক্ষিণা দিল। বাহারা পরমা দিতে অসমর্থ, তাহারা সুপারি বা কড়ি দিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতে বোঝাজারের বারোয়ারী-তলার ঢাক বাজিয়া উঠিল। বাজনার শব্দ শুনিয়া পাড়ার ছেলেরা বৃষ্টি-বাদল তুচ্ছ করিয়া বারোয়ারী-তলার দিকে ছুটিতে লাগিল। তখন গোটাকত কেরোসিনের 'টিমি' জ্বলাইয়া কুমারেরা প্রতিমা-চিত্র শেখ করিয়া যশোদাকে ড্রাকের গহনাতে সজ্জিত করিতেছিল। যশোদার হুইপাশে হুই সখী, চোখের উপর টানা টানা জু; এক হাত উর্ধ্বে তুলিয়া ও এক হাত ঝুলাইয়া দিয়া সখীর বাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। যশোদার এক পা ঝুলিতেছে, অন্য পা বাঁকাইয়া উরুর উপর তোলা; কোলে কুঞ্চের শিশু মূর্তি; নীল ঘন করিয়া মাড়িয়া কুঞ্চের সর্কাদে লেপিয়া দিয়াছে। সেই ঘন নীলের উপর তাপিন তেলের পোঁচ দেওয়াতে একটা বেশ সুগন্ধ উঠিতেছে; তাহাতে দীপালোক পড়িয়া চিক্-চিক্ করিতেছে। যশোদার নতদৃষ্টি শিশুর মুখের উপর স্থাপিত; কিন্তু সেই দীর্ঘ নয়নের বৃহৎ কৃষ্ণতারকার মধ্যে পুন্ড্রবিন্দুর পরিষ্কট হয় নাই। ওষ্ঠ ও করতল হিম্মলে ভগ্ন ভগ্ন করিতেছে, এবং নাসিকার মোচুল্যবান একটি প্রকাণ্ড নখ হৃৎকাতরপূর্ণের সেই গোশয়াজীর রুচিটনপুণ্য প্রকাশ করিতেছে। সখী হু'টি নীলাবরী

কাপড়ে সজ্জিত হইল। রাত্রি অধিক হইলে আবার সমস্তের ঢাক বাজিয়া উঠিল; সকলে বুঝিল, প্রতিমা বেদীর উপর স্থাপন করা হইতেছে।

সন্ধ্যার সময় হইতে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে ভাজাভুজির ধুম লাগিয়া গিয়াছে। গৃহিণীগণ তালের বড়া, কলাবড়া, আঁদোশা প্রভৃতি ভাজিবার জন্ত উননের কাছে বসিয়াছেন। কড়ায় ঘি কল্কল্ করিতেছে। বাহাদের দ্রুতগংগ্রহের সামর্থ্য নাই, তাহার বড়াগুলি তেলে ভাজিয়া রসে ফেলিতেছে। বাহিরে ভয়ানক দুর্গোৎসব, ঘরে ও কলরবের বিরাম নাই; কোন মেয়ে তালের রস-নিঃশেষিত আঁটি দুই হাতে ধরিয়া প্রাণপণে চুষিতেছে; আঁটিটার উপর তাহার ছোট ভাইটির বিশেষ লক্ষ্য ছিল, সুতরাং তাহা হস্তান্তরিত হওয়ার লুক্ক শিশু লুক্ক হইয়া উঠিল; সে তাহার দিদির দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, “আরুণ কুতাকাল!” কোন ছেলে রন্ধনাগারে মাগের কাছে উবু হইয়া পড়িয়া “না, একটা বড়া দে!” বলিয়া বড়ই আবদার আরম্ভ করিয়াছে; মা বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন, “তোরাই ত খাবি, একটু জুড়োতে দে! এত আদেখ লেপণা করিস্ কেন?”

কোন ঘরে ছেলে মেয়েরা ‘লুকোচুরী’ খেলিতেছে, দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, বায় প্যাটরা তোরঙ্গ তক্তাপোষে বাধিয়া ধুপ্ধাপ্ করিয়া আছাড় খাইতেছে; কিন্তু আঘাতে ক্রক্ষেপ না করিয়া আবার উঠিয়া খেলার বাতিতেছে! কোন বাড়ীতে ছেলের ‘টোকাটুকী’ খেলা আরম্ভ হইয়াছে;—একটি মেয়ে একটি ছোট ছেলের চোখ কাপড় দিয়া বাধিয়া অদূরে উপবিষ্ট পাঁচ ছয় জন ছেলে মেয়ের দিকে লক্ষিয়া বলিতেছে, “আর রে আমায় সোনাবনি!” একটি ছেলে বীজ-দ্বারা আসিয়া বস্ত্রভূতক্ক বালকের মাথার ‘টোকা’ মারিয়া আবার পা টিপিয়া টিপিয়া

নিজের ধারগায় গিয়া বসিল। সকলে জিজ্ঞাসা করিল, “কে?” আবৃত-চক্ষু বালক বলিল, “বলুবা? চাক্র নম?” শুনিয়াই তাহাদের মধ্যে হাসির রোল উঠিল! এমন সময় মা ডাকিলেন, “ও ননী, কুম্ভর, যোগীন, চাক্র, তোরা খাবিত? আয়!”—সঙ্গে সঙ্গে খেলা বন্ধ হইল; দুপদাণ্ড শব্দ করিয়া সকলে খাবার-ঘরে ছুটিয়া গেল।

মধ্যাহ্নে পূজা শেষ হইল। পুরোহিত ও অস্ত্রান্ত ব্রাহ্মণের বাড়ীর শালগ্রাম শিলা, নারায়ণ প্রভৃতি গৃহবিগ্রহগণ যথেষ্ট পরিমাণে তালের বড়া, কলাবড়া, লুচি প্রভৃতি উপহার পাইলেন। ব্রাহ্মণীরা প্রচুর পরিমাণে বড়া ভাজিয়াছিলেন, পরদিন সকালে পাড়ার ছেলে মেয়েদের ও যজ্ঞমানবাড়ীতে প্রসাদবিতরণের অভিপ্রায়ে তাহা ঢাকিয়া রাখিলেন। পূজা শেষ হইলে বারোয়ারী-তলার এক জীর্ণ বিবর্ণপ্রায় নীল শামিয়ানার নীচে ‘কবি’ আরম্ভ হইল। বাজনা বাজিয়া উঠিল। কোমরে চাদর-বাঁধা কবির দল কানে হাত দিয়া ও মুখব্যাদান করিয়া প্রাণপণ চীৎকারে “চিতেন” ধরিলে গ্রামের সকলে বুঝিতে পারিল, কবি আরম্ভ হইয়াছে! আর কি স্থির থাকা যায়? বুঝকের দল বাঁধিয়া কবি গুনিতে ছুটিল; পণ্ডিত মহাশয় পড়াইতে আসিলে, তেরিজ ও জমা-খরচ কবিতে কবিতে সন্ধ্যাবেলাতেই যে সকল ছেলে প্লেকের উপর তুলিয়া পড়ে, এবং কিল, চড়, ‘কাণ্ট’তেও বাহাদের সম্যক চৈতন্তসকার হয় না,—তাহারাও আজ কবি গুনিবার জন্ত লুহ মনে ঘুসাইতে পারে নাই,—অস্ত্রের কঠিনেরে জাগিয়া উঠিয়া জুতা, পিরাণ ও চাদর খুঁজিতেছে। দত্তদের চণ্ডীমণ্ডপটি কবির আসন-সংলগ্ন; পাড়ার মেয়েরা কবি গুনিতে আসিবে বলিয়া সেই চণ্ডীমণ্ডপ-দ্বারে চিক টাঙ্গান হইয়াছে। কবির দল সম্মুখে গান আরম্ভ করিবারাজ চিকের আড়ালে

মলের ঝুণ্ডু-ঝুণ্ডু শব্দ, পটবস্ত্রের ধস্-ধস্ শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। দেওয়ানগিরির আলোকে কাহারও গলার ডারমনকাটা চিক, কাহারও কানের আটটা পলতোলা মাকড়ী চিকের ফাঁক দিয়া এক একবার ঝিক্-ঝিক্ করিয়া উঠিতেছে। তাহার পর গান যত জমিয়া আসিল, চিকের আড়ল হইতে ততই অক্ষুট কলধ্বনি উথিত হইতে লাগিল। কেহ কবিওয়ালাদের কণ্ঠস্বরের, কেহ বা কোন হতভাগ্য গায়কের ঝাঁটার জ্বার সোজা সুদীর্ঘ গৌফের ও গুলিখোরের মত চেহারার সমালোচনা করিতেছে; কেহ অপরের অলঙ্কারের ও সেই সঙ্গে অলঙ্কারধারিণী ভাগ্যবতী গরবিশীর অহঙ্কারপ্রাচুর্যের ব্যাখ্যা করিতেছে; কেহ ক্রোড়স্থ রৌকন্তমান শিশুকে কিছুতে শান্ত করিতে না পারিয়া স্তম্ভদানে তাহার মুখ বন্ধ করিবার বৃথা চেষ্টায় ব্যস্ত! যে সকল বর্ষীয়সী এক পাশে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে কবি শুনিতেছিল, এবং দেবকীর অষ্টম গর্ভের সম্ভবানকে নষ্ট করিবার জন্ত কংসদুত কারাগারে উপস্থিত হইয়া বসুদেব কর্তৃক নন্দালয় হইতে আনীত বালিকাকে গ্রহণ করিলে দেবকী যে খেদোক্তি করিতেছেন, তাহা শুনিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল, তাহারা সুবতীগণের এই অদৃশ্য বাচালতার অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, “হা সকল, তোমাদের ‘ব্যাগ্-গাতা’ করি—একটু চুপ কর; গল্প করারই বসি মতলব ছিল, তা হ’লে এখানে না এলেই পার্বে; ঠাকুর দেবতার এমন কথা ফেলে কি ‘গল্পো’ ভাল লাগে? কি জানি বাপু, তোমাদের কেমন-ধারা পিরবিত্তি!”—শুনিয়া গল্পপরায়ণ সুবতীগণ কিয়ৎকালের জন্য নীরব হইল; চিকের আড়ালে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

ভোর হইয়া গেল; তখনও গান শেষ হয় নাই। কোথা হইতে একখানা বোলা কোম আসিয়া আকাশের অনেকখানি মারগা ঢাকিয়া

ফেলিল, তাহার পর বন্ধ-বন্ধ শব্দে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। অগত্যা কবির দলের ওস্তাদ শ্রীকৃষ্ণকে কংসপ্রেমিত মারাবিনী পুতনার ক্রোড়ে রাখিয়াই, বৃষ্টি হইতে মাথা বাঁচাইবার জন্ত ‘দোয়ার’-গণের সহিত আসর ছাড়িয়া, আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটিল।

প্রভাত হইলে ও সূর্যোদয় হইল না। সমস্ত আকাশ কাল মেঘে আচ্ছন্ন। ছেলে হইতে বুড়ো পর্য্যন্ত ‘মানসা’ করিতে লাগিল, আজ যেন দিনের বেলায় বৃষ্টি না হয়; বৃষ্টি হইলে সকল আমোদ মাটা হইয়া যাইবে! বামনঠাকুরগেরা সকাল-সকাল নান করিয়া আসিয়া পূর্ব্বরাত্ৰের প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ করিলেন; ও দিকে গোবিন্দদেবের দ্বারে শঙ্খাংটা বাজিয়া উঠিল,—আজ নন্দোৎসব।

বেলা আটটা বাজিতে না বাজিতে তাঁতিপাড়ার সংকীৰ্ত্তনের দল টিকি উড়াইয়া, কোঁটা-তিলক কাটিয়া, খোল করতাল বাজাইয়া বাঁড়বোদেব গৃহদেবতা গোবিন্দদেবের দ্বারে আসিয়া নাচিয়া নাচিয়া গায়িতে লাগিল,—

“শিব নাচে, ব্রহ্মা নাচে, আর নাচে ইন্দ্র,

গোকুলে গোয়াল নাচে পাইয়ে গোবিন্দ।”

অবিলম্বে পাড়ার ছেলেরা মালকোঁচা আঁটিয়া, কোষরে গামছা জড়াইয়া, দেবালয়প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইল; বয়স্ক যুবকগণও এ আমোদে মাতিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিল না। বুড়ো দাসু ঘোষ ‘হাতে নড়ি কাঁধে বাঁক’ লইয়া নাচিতে লাগিল; তাহার মাথার গামছা জড়ানো, বাকের এক দিকে একটা হাঁড়িতে দধি, হরিদ্রা-চূর্ণ মিশ্রিত ‘গোলায়’ আর একদিকের হাঁড়ি পরিপূর্ণ। সে প্রাঙ্গণ মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিয়া স্তব করিয়া বলিতে লাগিল,—

“ক্ষীর ক্ষীরসে ক্ষীরের লাড়ু বর্তমানের কলা,
লুটিয়ে লুটিয়ে খায় বত গোপের বালা ।
ব্রজের গোরালা বত গোপালকে পেয়ে
হাতে নড়ি কাঁধে বাক, নাচে ধেয়ে ধেয়ে ।”

ইথাৎ এক দৃষ্ট বালক হর্ষোন্মত্ত গোপনন্দদের পিঠে জোরে ধাক্কা দিল, পিচ্ছিল মৃত্তিকার উপর দামু ঘোষ সটান চিৎপাত! হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দই ও রঙ্গীন জল কর্দমের সঙ্গে মিশিয়া গেল; তখন সকলে সেই কাদার উপর পড়িয়া পরস্পরকে আক্রমণ পূর্বক উন্মত্তের তায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল! বাহারা দূরে দাঁড়াইয়া এই রঙ্গ দেখিতেছিল, আজ তাহাদেরও অব্যাহতি নাই, বাহাকে ধরিতে পারিল, তাহাকেই ধরিয়া আনিয়া ইহার দলভুক্ত করিয়া লইল! কর্দমের উপর এই অপূর্ব উৎসবের নাম ‘কাদাখেঁড়’।

‘কাদাখেঁড়’ শেষ হইলে সকলে নদীতে স্নান করিতে গেল। এক এক দল ছেলে নদীর জলে পড়িয়া লম্ফ-ঝঞ্জে, সস্তরণে ও বাতপ্রতিধাতে নদী জল আলোড়িত করিয়া তুলিল। অনেক দূরে নদীর প্রবল স্রোতে পাণিফলের এক একটি জঙ্গল ভাসিয়া যাইতেছিল; বাহারা সস্তরণপটু, তাহারা সেই জঙ্গল ধরিবার জন্য সাঁতার দিতে লাগিল। কেহ বাজী রাখিয়া এক ডুবে দশ হাত জলের নীচে হইতে মাটি তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল; কেহ বা মৎস্যহুসন্ধানে প্রবৃত্ত জেলেনদের ডিল্লীর গলুই ধরিয়া ভাসিতে লাগিল; জেলেরা বিব্রত হইয়া বতই বলে,—“ওগো বাবারা! ডিল্লী ছাড়ো না!” ততই তাহারা নৌকা লইয়া টানাটানি করে! অবশেষে বহুক্ষণ জলে থাকিয়া শীতবোধ হইলে সকলে ধীরে ধীরে তীরে উঠিয়া ঝড়ী কিরিয়া আসিল, এবং শুষ্ক কাপড় পরিধান করিয়া এক এক রাশি বাসি বড়ার সঙ্গতি করিতে বসিল।

আজ দশকে দশে ত্রিখারি বৈকুণ্ঠ ত্রিখারি বাহির হইয়াছে ; যে বাকীতেই যায়, দুই চারিটা বড় না গইয়া তাহার সেকান হইতে শূন্য হইতে বেগন না। দুই চারি জন 'বোরগী' ত্রিখারি কুলি কাঁখে কেদিল করতালহস্তে বাকী বাকী ছুঁতেছে, এবং সদর দরজার আসিয়া করতালে বা দিল্লি সুর করিয়া কল্যাণকে,—

“হরি নার বিকে কে গোবিন্দনাম বিবে,

বিবলে মল্ল-কম্বা বার দিনে দিনে।

কুক ত্রিখারি তাই মসারি আইল,

দিয়ে নার বার হরে বৃক সম হৈল।

কল্যাণে পুত্র কন্যা ভাল ভাগি পড়ে,

কল্যাণে কল্যাণে ‘পক’ বাস করে।

যেদিন কুক জন্ম নিল ‘দৈবকী’-উদরে,

মল্লার সেবগণ পুণ্যটি করে।

শ্রীমদ রাধিল নার—”

এমন সময় একটি মেয়ে আসিয়া বাবাজীর কুলিতে একমুঠি ত্রিখারি দিয়া গেল। কল্যাণকল্যাণি ও গান বুগবু বন্ধ করিয়া কল্যাণী অস্ত্র বাকী চবিল,—শ্রীমদ কি নার রাধিল, তাহা আর বলিবার অবসর হইল না, শত নার ত দুইয়ের কথা !

দুপুত্রের সময় বোবাঝারের দল এতিয়া গইয়া গ্রাম প্রবেশ করিতে বাহির হইল। এতিয়া বাহির করিবার খুব সাধারণ নয়। গ্রাম-জমিদারের বাড়ী হইতে সংগৃহীত খাস, নিশান, ছাত্তা, আড়ানা, আল-সোটা, ও কতকগুলো ঢাক ঢোল আগে আগে চলিল। বড় বড় ঢাকের বাজে চারি দিক কাঁপিয়া উঠিতেছে, ঢোলগুলি কল্যাণিক তাহাদের সুরে

স্বর মিলাইবার জন্য প্রবল চেষ্টা করিতেছে ; সঙ্গে সঙ্গে কাশির ‘কাই-কাই’ শব্দ ; শানাইও নীরব নহে, মধ্যে মধ্যে তাহার বন্ধভঙ্গ করিয়া একটা অতি তীব্র স্বর বাহির হইতেছে ।

বান্ধভাঙের পরই ‘নৌকাখণ্ড’ । একখানি গরুর গাড়ীতে একখানা পান্‌সী নৌকা স্থাপিত হইয়াছে, ইহাই নৌকাখণ্ড ; নৌকাখণ্ডের উপর একদল ‘রাইবেশে’ ; স্ত্রীলোকের স্কার বেশভূষা, পরিধানে রঙ্গীন চিত্রবিচিত্র বস্ত্র, গারে লাল ছিটের কতুয়া ; সর্কাদে গিণ্ডির গহনা ; মাথায় ঝাঁকড়া চুল নিপুণভাবে আঁচড়ান, তৈলনিষিক্ত মাথার উপর পাখীর স্ত্রবন্ধ পালক ; কাহারও গলায় ঝুঁটো মতির, কাহারও গলায় সাদা লাল ও সবুজ পুঁতির মালা, হাতে দীর্ঘ ছড়ি, তাহার দুই দিকে পালকের ধোপ । নৌকাখণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া চুলিয়া ‘নাচনে’র বাজনা বাজাইতেছে, আর ‘রাইবেশে’রা ঘুরিয়া ফিরিয়া, কখন মাথার হাত দিয়া, কখন ওষ্ঠে তর্জনীস্পর্শ করিয়া, সেই বাজনার তালে তালে নানা অদ্ভুত ভঙ্গীতে নাচিতেছে ; ছেলের দল চারিদিকে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া এই বিচিত্র নৃত্য দেখিতেছে ।

নৌকাখণ্ডের পর হ’খানা ‘ময়ূরপঙ্কজী’ । বাঁশের বাথারি দিয়া প্রকাণ্ড দুইটি ময়ূর নির্মিত হইয়াছে ; লম্বা গলায় মাটি লেপিয়া তাহা নীল রঙ্গের কাগজে মুড়িয়া দিয়াছে ; সর্কাদে সাদা কাগজ জড়ানো, সে কাগজও চিত্রিত । ময়ূরপঙ্কজী হ’খানা গোলকটে উত্তোলিত হইয়াছে ; তাহার উপর গোরালী, ধরানী, রাজমিটী, ছুতোর প্রভৃতি শ্রমজীবীগণ দাঁড়াইয়া আছে ;—কাহারও কাঁধের উপর জরির তাল ও গর্গেটের পোষাকভূষিত ছোট ছেলে ; কেহ প্রভুপরিভাষ্য, বহুদিনের ব্যবহারে জীর্ণ ও বিবর্ণ চাপকান গারে দিয়া বাবুরিকাটা চুলের উপর লাল

কমল জড়াইয়া 'সান্নি'-দলের 'মূলগেনে'-গিরি করিতেছে, আর দুই পাশে নূতন কাপড় ও চানরে সজ্জিত 'দোয়ারে'র দল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। দুই পাশের জনশ্রোত ভেদ করিয়া গরুর গাড়ী ইষ্টকবজ রাজপথে হটর-হট করিয়া অগ্রসর হইতেছে, 'মূলগেনে' অমুচ্চস্বরে গানের কথা বলিয়া দিতেছে, আর 'দোয়ারে'রা সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া মাথা নাড়িয়া নানা ভঙ্গীতে দুই হাত ঘুরাইয়া এক যোগে গগনভেদী স্বরে গান ধরিতেছে ; পথের লোকগুলা হা করিয়া যেন তাহা গিলিতেছে ! কেহ গুনিয়া পরম কোতূহল বোধ করিতেছে ; কেহ হাসিয়া বলিতেছে, "বড়বাজারেরা এবার ভারি জ্বক হবে, খুব জবোর 'উতোর' গাচ্ছে ; রামলাল পরামাণিক ওস্তাদটা কি কম ?"—এই গান বড়বাজারেদের গালাগালির প্রত্যুত্তর !

সমুদ্রপঙ্কীর পশ্চাতে লাল কাপড়ে সজ্জিত চতুর্দোল। যশোদার প্রতিমাখানি এই চতুর্দোলে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। সালুর উপর স্থানে স্থানে সোনালী রান্ধতা ; প্রত্যেক ফুকে সাদা, লাল, সবুজ রঙের ছোট ছোট বেল ; ব্যবধানে ছোট ছোট ঘণ্টা, ঘণ্টাগুলি পরস্পরের আঘাতে ক্রমাগত টুং-টাং শব্দে বাজিতেছে। বিশ জন বাহক দু'খানি বাঁশে চতুর্দোল বাঁধিয়া তাহা ঘাড়ে করিয়া চলিয়াছে।

পথের ধারে স্থানে স্থানে জ্রীলোকের দল অবগুষ্ঠনের কাঁক দিয়া কোতূহলবিস্ফারিতনেত্রে এই উৎসব নিরীক্ষণ করিতেছিল ; যশোদার চতুর্দোল তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র তাহারা দুই হাত তুলিয়া ভক্তিমত্তে ঠাকুরকে প্রণাম করিল ; বিস্ময়ের সঙ্গে আনন্দের, আগ্রহের সঙ্গে ভক্তির কোমল মিলন-মাধুরী তাহাদের লজ্জাতরল প্রদীপ্ত চক্ষে প্রতিকলিত হইয়া উঠিল।

প্রতিমার চতুর্দোলের পর একখানি "তক্তারামা,"—এখানিও চতুর্দোলের জায় লোহিতবস্ত্র-বস্ত্রিত ; একটি কমনীয়কান্তি ব্যয়ে তেরে

বৎসরের গৌরব বর্ষ সুখী ব্রাহ্মণবালককে রাখিল। বাজাইল ‘তজ্জারায়’
বজাইয়া দিয়াছে; দুই পাখে তাহারই সমন্বয়ক দুইটি কলক কথোবকশ
দাঁড়াইল। পক্ষ চিরাইতে চিরাইতে তাহারে চাষের ব্যয়ন করিতেছে।
‘সাদিকা’ বতখুৎ ছিন্নদৃষ্টিতে গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকিলার জন্য বারোয়ারীর
পাশাঘের জর পুনঃ পুনঃ অহঙ্কর হইয়াছিল, কিন্তু পথপ্রান্তকর্তী কবর
সহচরকর্ণের সহিত দৃষ্টি-বিমিশ্রকায় জাহার সে চোঁটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইতেছে;
চক্ষ চক্ষ মিথক হইলেই তাহার ওষ্ঠে কোড়ক-হাসের আবির্ভাব হইতেছে!
অসুখবর্তী দলপতির ক্রুতীকুটল ক্রুতুটি দেখিয়াও সে হাসি চাপিয়া
রাখিতে পারিতেছে না।

‘তজ্জারায়’ চলিয়া গেল। পশ্চাতে এক দল লোক বাউল সাক্ষিয়া
সেইরকম রসের আলংকার সর্বাঙ্গ আত্ম করিয়া ধ্রুপদী ও ভুগি বাজাইয়া
নাচিয়া নাচিল। গায়েরা চলিয়াছে,—

“এস এক রসিক পাগোল, বাধালে গোল,

লগ্যাক নাহক দেখ্‌সে তোরা !

পাগোলের সঙ্গে বাব, পাগোল হ’ক,

হেরবো রসের লব গোরা।”

বাউলের দলের পরেই সংকীর্ণের দল। আড়পাড়ার সংকীর্ণের
দল অতি চক্ৰবাক্য গারিতে পারে; বোঝাকারের তাই এবার তাহা-
দিককে মিস্রল করিয়া আনিয়াছে। গায়কেরা সংখ্যায় পনেরো বোঝাই;
ছেলে বড়। সকলের মাথার দীর্ঘ হুল চিকিৎসা গোছা,— দুই তিনটি কারো
তেরো বছরের ছেলের মাথার ‘বারো হাত কাঁকড়ের তের হাত বীজির
মত অতি উৎকট টিকি ! সকলেরই নাসিকার তিলক, কপালে চন্দনের
কোঁটা, পলাই তুলসীর তিনকণ্ঠি মোটা মালা, এক দাড়ীপোক কাষাঝো ;

কাহ্নাও কাহ্নাও রক্ত আবল্লুগ কাঠের মত কাল ; তেল মাখিয়া ঘাস করিয়া
আসিয়াছে, একত্রে চেঁচারা বর্ণিলকরা বোধ হইতেছে ! হুঁশালা খোল
জোরে জোরে বাজিতেছে, খরবেগে করতাল চলিতেছে, আর গল্পকেশরা
দুই হাত উর্ধ্বে তুলিয়া মাথা মাড়িয়া টিকি দুগাইরা গাণ্ডিতেছে,—

“হরিনাম ক্বিনে যে ভাই, কি ধন আছে সংসারে ?

কল মাখাই, মধুর স্বপ্নে,—

হরি নামের শুণে গহন বনে শুক তরু মুগুরে,

মাগদ খসি দিবানিশি বীণাঘরে গাঁম করে ।”

স্বাক্ষরার্থে সংকীর্ণনের দল ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, আর
পৰস্পরান্তর্হ জ্বীলোকেরা ভক্তিমত্তরে মাটিতে লুটাইয়া প্রশম
করিতেছে ।
সংকীর্ণনের দলের পশ্চাতে ছেলে-কোথাই পাঁচ ছদ্মখালি গল্প গল্প
পাকা কাঁটালের মত ঠাসাঠাসি করিয়া তাহাদিগকে কোথাই করা হইয়াছে ;
কিন্তু এই কষ্টসাধ্য আমোদে তাহারা বিলক্ষণ আরাম বোধ করিতেছে !
কেহ কাহ্নাকেও কিল মারিতেছে, কেহ কাহ্নাকেও চিমটি কাটিতেছে,
কেহ কাঁদিতেছে, কেহ হাসিতেছে ।—তাহারাও এই উৎসবে একটা
দেখিবার সামগ্রী !

বড়বাজারেরা এবার জন্মাষ্টমী করিতে পারে নাই । বড়বাজারের
মধ্যস্থলে আসিয়া বিশেষ ঘটা করিয়া ঢাক খাজিতে লাগিল ; এক জন
ঢাকী আর এক জন ঢাকীকে ঢাকযবেত কাছে ছুঁজিয়া নাচিয়া নাচিয়া
ঢাক বাজাইতে লাগিল । ‘সান্নি গানের সুর আরও উর্ধ্বে উঠিল ; এক
‘রাইবেশ’র দল বড়বাজারের হীনতার প্রতি সমুচিত উপহাস প্রদর্শন
করিবার জন্তই যেন অধিক উৎসাহের সহিত নাচিতে নাচিতে অকতর্কী
করিতে লাগিল !—রাগে ও অপমানে বড়বাজারের পাণ্ডাদের ঘোটা

মোটা গোক ফুলিয়া উঠিল; তাহার বলাবলি করিতে লাগিল, “বেটামের তারি আশ্পর্কা!—দেখা যাবে সরস্বতী পূজার সময়, কার কতখানি ক্যামতা!”

সবস্ত গ্রাম ঘুরিয়া অপরাহ্নে উৎসবের দল বোবাজারের আড্ডার কিরিয়া আসিল। সন্ধ্যার পূর্বেই নদীতলে প্রতিরার বিসর্জন হইয়া গেল। উৎসবান্তে সকলে শ্রান্ত দেহে স্ব-স্ব গৃহে ফিরিতে লাগিল। তাহার পরও ঢাক বাজিতে লাগিল বটে, কিন্তু ঢাকের শব্দে সে উৎসাহ বা উদ্দামনার আভাস নাই! সেই সমুচ্চ বাস্তবধ্বনির মধ্যে ও ক্লান্ত হৃদয়ের অবসর ভাব ফুটয়া উঠিল; এবং শানাইয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া সন্ধ্যাধূসর বনানী-শ্রাবল পল্লীগ্রামের জনবিরল পথে বিসর্জনের বে করুণ রাগিণী ধ্বনিত হইতে লাগিল, তাহা সন্ধ্যার খম্বোত্তরাতিথচিত পুঞ্জীভূত তিরিররাশির স্তায় সমস্ত পল্লী আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।





ଦୁର୍ଗୋଳ ସବ ।

দুর্গোৎসব



পূর্বকালে গোবিন্দপুর গ্রামে ত্রিশ চল্লিশ ঘর গৃহস্থ দুর্গোৎসব করিতেন। এখন আর সেদিন নাই, এখন বড় জোর সাত আট বাড়ী দুর্গোৎসব হয়। আগে অনেকে দিক্কা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ পূর্বক মহাদেবকে ধরে আনিত; এখনকার দিনে ডিকালক অর্থে উন্নত পূর্ণ হয় না, দুর্গোৎসব ত কহ দুবের কথা। সেকালের বুদ্ধদের যদি ভিত্তাসা করা যায়, আগে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনের লোকেরাও গচ্ছনে বহু পরিমাণ প্রতিপালন করিয়া বোল দুর্গোৎসব করিতে পারিত, আর একালে মাসিক এক শত টাকা আর হইলেও খাটতেই কুলায় না কেন? উত্তরে তাঁহারা গীর্ধনিধান ভাগ করিয়া বলেন, সেকালে পাঁচ টাকা বেতনের উপর দশ টাকা উপরি ছিল; বেতনটা ত কাট র সামিল, উপরি আরই আসল কোষধার। এই উপরি আসাট একালে খুবই করিয়া গিয়াছে; তাহার উপর সেকালে খাটতব্য হ্রত ছিল, টাকার বোল সেব তেল, আট সেব বি বিলিত, দুটাকার খান কিনিলে খুব বড় গৃহস্থের ও বাস-
খানেক কোন চিন্তাই থাকিত না; এক এক গৃহস্থের গোয়ালে বতগুলি গরু থাকিত, তাহাতে প্রতিদিন সকালে আশ বন ত্রিশ সেব দুবের সহায় হইত; বিশেষতঃ সেকালে বিলাসলক্ষ্যসমী একপ একল হয় নাই, বিলাসের প্রয়োজনও আর ছিল; ছুতরাং সেকালে সবাই দুর্গোৎসবের আয়োজন হইত। পঞ্চাশ টাকা ব্যয় করিলে সেকালে

যেমন পূজা হইত, একালে পাঁচ শত টাকা খরচ করিলেও তেমনটি হইবার উপায় নাই !

যাহা হউক, ঠিক এই কারণে কি না জানি না, গোবিন্দপুরে দুর্গোৎসবের সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে; কিন্তু সংখ্যায় কমিলেও ধুমধাম যে অনেক বাড়িয়াছে, তদ্বিবরে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আজ কাল জনমেজয় ভট্টাচার্য্য গোবিন্দপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। গোবিন্দপুরের লোকে বলে, “রাজা-রাজড়ার বাড়ীতেও এমন ধুমধামে মহানারার পূজা হয় না; কেমন ঢাকের বাজ, কেমন রোশনাই, প্রতিমা সাজাইবারই বা কারিকুরি কত !”—ইংরাজী লেখাপড়া না শিখিয়াও জনমেজয়ের বড় পদ-পসার; উকীল মোক্তার ও আমলা মহলে তাঁহার যৎপরোনাস্তি খাতির। জনমেজয়ের দান সম্বন্ধে ঐশ্বর্য্য প্রতিপত্তি গোবিন্দপুরের বালক-বালিকা, বুবক-বুবতী, এমন কি, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাগণেরও অপরিহার্য্য আলোচনার বিষয়। জনমেজয়ের মত সম্পদ ও খ্যাতি লাভ করা গোবিন্দপুরের ভবিষ্যতের আশা ভরসা—বালকগণের শৈশববস্তু, সঙ্কলিত বুবকগণের চির-পোষিত কাষনা।

জনমেজয়ের অবস্থা প্রথমে সচ্ছল ছিল না। পাঠশালার বাজালা লেখাপড়া শিখিয়া কিছুদিন তিনি কোন জমীদারের সেরেস্তার গোমস্তা-গিরি, মুহুরীগিরি বা ঐ রকমের কি একটা চাকরী করিয়াছিলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রবল উচ্চাভিলাষ তাঁহার সহায় ছিল। কয়েক বৎসর জমীদারীর কাজ শিখিয়া শেষে তিনি খরসারার নীলকুঠীতে ছোট দেওয়ানের পদ লাভ করেন। তাহার কিছু দিন পূর্বে কলিকাতা নীলবিক্রোহ হইয়া গিয়াছিল। জনমেজয় নানাপ্রকার বড়বড় ও চাফু-বোঁয় সহায়তার সাহেব-জমীদারগণের অনন্তইস্ফাদনে সর্ব্ব হইরা-

ছিলেন; তাহার ফলে এখন তিনি জন ষ্ট্রাট কোম্পানীর মুক্তিার্থ 'কাপ্‌সারণের' বড় দেওয়ান।

বড় দেওয়ানের গৌরবান্বিত পদ লাভের পর আজ কয়েক বৎসর হইতে দেওয়ানজী মহাধুমধামে মহামায়ার পূজা করিতেছেন। প্রথম দুই এক বৎসর তিনি উৎসবের শোভাবর্ধনের জন্য গ্রামস্থ জমীদারবাড়ী হইতে ঝাড় লঠন দেওয়ালগিরি প্রভৃতি দ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু একবার পল্লীগ্রামের দলদলিতে তিনি চৌধুরী জমীদারদিগের পক্ষ ত্যাগ করিয়া নিজেই একদলের দলপতির গ্রহণ করেন, এই জন্য জমীদারেরা সেবার তাঁহাকে ঐ সকল দ্রব্য দিয়া সাহায্য করিতে অসম্মত হন; ইহাতে দেওয়ানজী অত্যন্ত অপমান বোধ করিয়া কলিকাতার লোক পাঠাইয়া এত ঝাড়, লঠন, দেওয়ালগিরি, মূল্যবান ল্যাম্প, রোপাখচিত আদাসোটা, খাস, নিশান প্রভৃতি নানাবিধ 'ইষ্টাট' আনাইয়া কেলিলেন যে, তাহা দেখিয়া গোবিন্দপুরের আবালবৃদ্ধ সকলে অবাক হইয়া গেল! সকলেই বুঝিল, জনস্বৈর দেওয়ানের চাকরীর বত চাকরী এ ছনিয়ার অতি অল্প লোকের ভাগেই জুটয়া থাকে! গ্রাম্য রমণীগণ কলাবলি করিতে লাগিল, বিস্তর তপস্তার ফলেই তাঁহার পত্নী এমন কুবেশকুল্য পতির সহ লাভ করিয়াছেন!

কিন্তু জনস্বৈরের রাজার সংসারে একটি রত্নের অভাব ছিল; তিনি অপুত্রক। স্ত্রী কস্তা ভিন্ন সংসারে আর কেহই নাই। পুত্রলাভার্থ তাঁহার বাড়ীতে অনেক পূজা হোম বাগ ও প্রচুর ব্রাহ্মণভোজন হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে মনস্তাপ ভিন্ন আর কিছুই লাভ হয় নাই! সুতরাং পুত্রানন্দের দ্বার সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত দেখিয়া তাঁহার মনে বৎসরোদ্ভাসিত বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি সকলের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে,

ঊঁহার বাহা কিছু উপার্জন হইবে, তাহা তিনি দেহসেবাতেই ব্যয় করিবেন। তদনুসারে তিনি 'বারো মাসে ভের পার্শ্ব' আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু ইহাতে সঞ্চিত ধন কম হওয়া দূরের কথা, ঐখনি দিন দিন উৎসাহ উঠিতেছে। তবে মন্দ লোকের কথা স্বতন্ত্র; তাহার বলে, ওনসেজর দেওয়ান পুণ্যসকরের অভিপ্রায়ে দেবপূজার অব্যবহাস করেন না, ইহা ঊঁহার একটি ব্যবসায়বিশেষ! চূর্ণোৎসবে এত সুখদান, এত ধরচপত্র; কিন্তু ঊঁহার সম্বন্ধী ও ঊঁহার পল্লী হারাপী দেবীর স্রীধন সম্পত্তির নায়েব শ্রীযুক্ত কুড়োরাম চক্রবর্তী মহাশয় পীতাম্বর বেগের মোকামে অমুরী ভাষাক টানিতে টানিতে একদিন গল্প করিতেছিলেন, মহামারাকে আনিয়া দেওয়ানজীর অবলগ টাকার সংস্থান হয়। চূর্ণোৎসব উপলক্ষে তিনি ইয়ার্ট কোম্পানীর ছোট বড় সকল কর্মচারীকেই নিমন্ত্রণ করেন। তাহাদের প্রণামী বাঁধা আছে; নায়েব ছোট দেওয়ানের প্রত্যেকে পঞ্চাশ টাকা, গোরস্তা তহশিলদার খাতাজী প্রভৃতি মহা প্রেমীয় কর্মচারিগণ পচিশ টাকা, সুহরী প্রভৃতি নিম্ন প্রেমীয় কর্মচারীগণ কশ টাকা হিসাবে প্রণামী দেয়। বটীর দিন হইতেই প্রণামীর জোত বন্ধিতে থাকে। ভক্তির দই, কীর, বড় বড় নাহ, পাঠা, কলাকুলারী, কলাপাতা, খোড়, বোচা প্রভৃতির ত কথাই নাই। পূজার দুই তিন দিন পূর্ক হইতে বিভিন্ন স্থানের নায়েব দেওয়ানের প্রেরিত ডেট লোকা-বোকাই হইয়া আসিতে থাকে। অনেকই বড় দেওয়ানজীর প্রদান, কলম লসে মহামারার প্রদান লাভের প্রত্যাশায় পূজার কম দিন মহানন্দে ঊঁহার বাড়ীতে খাটয়া দিয়া যায়। যৌথিক শ্রীলক্ষে দেওয়ানজী মহাশয় অতি অস্বস্তিক; নিমন্ত্রিত নায়েব প্রভৃতি কর্মচারী ঊঁহার প্রাকসে কদ্বার্পন করিলে তিনি পরমস্বস্তিতে তাহাদিগকে আবদান পূর্ক

স্বিতসুখে বলেন, "ভার্য্য হে, নিতান্তই যে নিমন্ত্রণ রাখতে এলে! হু' দিন আগে আসতে হয়; তোমাদের তরঙ্গতেই এত বড় বাপারে হাত দিইয়াছি, দেখো কেন অগ্রভিক্ষা না হই। এ তোমাদেরই নিজের বাড়ী; খাট খাটোও, খাও পাওরাও, আমি একা মানুষ, দেখতে তো?"—তুমি নিমন্ত্রিত নাহয় গোমস্তারা পরম পক্ষিতুষ্ট হয়; এবং কোমন্দের গামছা কাঁধিয়া বিভিন্ন কার্য্যভার গ্রহণ করে।

নীলকুঠী ছাড়া জন ঠুরাট কোম্পানীর জমিদারীও বহুদূর বিস্তৃত। জমিদারীর যে সকল কর্ম্মচারী দেওয়ানজী মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া উৎসবে যোগ দিতে না পারে, তাহারা মণিঅর্ডার যোগে প্রণামী পাঠাইয়া দেয়। পূজার কয়দিন গোবিন্দপুরের ক্ষুদ্র ডাকঘরে বত মণিঅর্ডার আসে, তাহার পোনে যোগ আসনাই দেওয়ানজীর নামে! পূজা শেষ হয়, উৎসবের দীপ নিবিল্লি যায়, বাগ্মকরেরা বিদায় লয়,—তখনও মণিঅর্ডারের কিয়াম নাই। তখনও আঁতাকুড়-মিকিষ্ট রাশিকৃত উচ্ছিন্ন কলাপাতার উপর কুকুরের কোলাহল, দীঘির ঘাটে তরকারিলিপ্ত স্ত্রীপাকার 'যজ্ঞি'র বাগন মাজিতে গিয়া পরিচারিকাগণের কলহ ও বায়সকুলের কলরব, ছাদের উপর 'দামোদর ঘোষ—তুকা দশ দেয়,' 'গোবর্দ্ধন ঘোষ—রাশি বারো দেয়' ইত্যাদি দধির মার্কাবুক্ত শৃঙ্গগর্ভ হাঁড়ির গড়াগড়ি ত আছেই, দেওয়ানজীর নবজির্জিত বৈঠকখানাতেও তখনও দরবারের বিয়াম নাই! ময়রা, গোয়লা, চাউল দ্বিত ময়দা সরবরাহকারী মুদ্রা প্রভৃতি পাওনা-দায়েরা প্রোপা টাকার আশায় হা করিয়া বসিয়া আছে। সকলেরই মুখ বলিন; কারণ তাহার জানে, দেওয়ানজী মহাশয়ের নিকট হইতে প্রোপা টাকা আদায় করা, আর সাহেব জমিদারের লোভদৃষ্টিতে পতিত দমীলপঞ্জ-হীন পৈতৃক লাভেরাজ জমী দখলে রাখা, এ উভয়ই আর সমান সহজসাধ্য!

কিন্তু তথাপি ভীড় কমিবে না; আশা ত আর সহজে কেহ ছাড়ি
না। অগত্যা সকলে পাঁচ সাত দিন ধরিয়া যাতায়াত করে; শেষে
দেওয়ানজী মহাশয়ের পারিষদরূপী উমেদার ও মোসাহেবের দল বিশেষ
আড়ম্বর পূর্বক সন্দেশ ও দধির দর কসিয়া, জিনিস বড় খারাপ হইয়া-
ছিল, এই হেতুবাদে অসম্ভব রকম কম মূল্য দানের ব্যবস্থা করে;
কিন্তু কাহারও কথা কহিবার যো নাই! আজ কয়েক বৎসর ঈয়াট
কোম্পানী গোবিন্দপুর গ্রামখানি পত্তনী লইয়াছেন। বড় দেওয়ানজী
জিনিস লইয়া যে অনুগ্রহপূর্বক কিঞ্চিৎ মূল্য দিতেছেন, ইহাই পরম
সৌভাগ্যের কথা; মূল্য কম হইল বলিয়া প্রকাশভাবে অসন্তোষ প্রকাশ
করে, এত বড় চঃসাহস কাহার? অতএব চিনির দরে সন্দেশের, দুধের
দরে ক্ষীরের, ও তৈলের দরে ঘূতের মূল্য পাইয়া পাওনাদারেরা চলিয়া
যায়, এবং পণে বাইতে বাইতে দেওয়ানজী মহাশয়ের প্রতি ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব-
সম্বন্ধের আরোপ করিয়া তদনুরূপ সম্বোধন দ্বারা মানসিক ক্ষোভ ও আক্ষেপ
নিবারণ করে।

*

*

*

*

পূজার ছুটি হইয়াছে। প্রবাসী চাকুরী জীবির তৃতীয়া চতুর্থীর দিন
হইতেই বাড়ী আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন। চারি দিকে আনন্দকোলাহল!
কাহারও মেয়ে বলিতেছে “বহি পিছি, বাবা আমাল্ দস্তে আজা কাপল
এনেভে, ডাক্!” কাহারও ছেলে বলিতেছে, “ও ব’ও দা, আমাল্ পুতুল
কুতা?”—দীর্ঘপ্রবাসান্তে গৃহপ্রত্যাগত স্বামী জল খাইতে বসিয়া
বসগোলাটি ভাজিতে ভাজিতে বিরহকাতরা প্রণয়িনীকে সম্বোধে জিজ্ঞাসা
করিতেছেন, “সুখখানা যে বড় ওকলো দেখ্‌চি! ভাল ছিলে না না কি?”
—পত্নী স্বামীপ্রান্তে অবনতমুখী, পারের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া মাটি খুঁড়িতে

বুঁড়িতে বলিতেছেন, “মনে পড়েছে যে এই চের, আবার কেমন ছিলাম জিজ্ঞাসা করা কেন? নিজে বুঝি খুব ভাল ছিলে!”—ক্রমে অভিমান প্রবল হইয়া উঠিল, সারা রাত্রিতেও সেই মানিনীর অভিমানশ্রোতে ভাটা পড়িল না; গৃহপ্রত্যাগত বিরহস্থিত প্রেমিকের সমস্ত সুখ-কল্যাণ রামধনুর দ্বারা তাহার নয়নসমক্ষে দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল।

ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের মুখ চাহিয়া সংসার বসিয়া থাকে না। ঐ রামার মা গয়লানীর একমাত্র ছেলে রামা সেদিন কলেরায় মারা গিয়াছে। সে কুষ্টিয়ায় চাকরী করিত,—আদালতের পেয়াদা ছিল। গত বৎসর পূজার ছুটিতে রামা এতদিন বাড়ী আসিয়াছিল, আজ ঘর অন্ধকার! তাই রামার মা ঘরের কঠিন মেঝের উপর পড়িয়া ছেলের স্মৃতি বৃকে লইয়া একাকিনী আর্তিনাদ করিতেছে। অভাগিনীর দ্বিতীয় অবলম্বন নাই; কিন্তু কে আজ তাহার দিকে কিরিয়া চাহিবে?—এই আনন্দোৎসবে সকলেই আত্মসুখের সন্ধানে ব্যস্ত।

রাত্রেও কাহারও অবসর নাই। গভীর রাত্রেও পল্লীবাসিনীগণের চিঁড়া কুটিবার অশ্রান্ত ধুপ্‌ধাপ্‌ শব্দে সমগ্র গ্রামখানি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। রাত্রি ক্রমে শেষ হইয়া আসিল, কিন্তু সেই শব্দের বিরাম নাই। বটীর দিন হইতে লক্ষীপূজা পর্যন্ত আর ঢেঁকিতে ‘পাড়’ দিতে নাই, সেই জন্ত রমণীগণ পূর্ব হইতেই ঢেঁকির কাষ সারিয়া রাখিতেছেন। দুর্গোৎসব ভিন্ন লক্ষীপূজার দিনও সকল বাড়ীতেই চিঁড়ার আবশ্রুক, সুতরাং গৃহস্থ-বধূরা সেই চিঁড়া এখনই কুটিয়া রাখিতেছে। বাহারা চিঁড়া বিক্রয় করিবে, তাহাদেরও সময় সজ্জিগু হইয়া আসিতেছে; কাজেই বটী যতই নিকটতর হইতেছে, ঢেঁকির পরিভ্রমও ততই বাড়িতেছে; তবে অন্ননাকুলের মধ্যে অনেকেরই অলঙ্কারগরজিত সুকোমল পদকমল ঢেঁকির পৃষ্ঠ স্পর্শ

করে, বেশ হয় জাহাজে সে স্বর্ণ-মুগ উপভোগ করে; তাই বেচনার
রাস্তা নাই। পঞ্চদশ দিন দিবাগাত্রিক হয়ে সুহৃদের লজ্জা একবারও
জাহাজ বিস্তার ঘটে না।

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই জাহাজজাহাজের দোকানগুলি উন্মুক্ত
হইতে লাগিল। বাজারে যে দিন চারিখানি কনোয়ারী দোকান আছে,
পূজা-উপলক্ষে সেই সকল দোকানে নানা রকম জিনিসের আমদানী হইয়াছে।
দেশী ও বিলাতী ছবিতে দোকানের দেওয়ালগুলি ঢাকা; কিন্তু ছবিগুলি
সাজাইয়া টাঙ্গাইবার শৃঙ্খলার সীমা নাই। এক যাত্রীয়া কালীঘাটের এক
পয়সা দানের কালো রঙের পট; তাহার পাশেই হুমকান দুই হস্তে বন্দ
বিলম্বপূর্বক দেখাইতেছে, - সেখানেও রাবণীতাক যুগলমূর্তি অঙ্কিত আছে।
তাহার পরেই একখানি আর্ট-ষ্টুডিওর ছবি, শিবের কপাল হইতে লাল
রঙের ঝাঁটা বাহির হইয়া মলমল করিতেছে। তৃতীয় ছবি একখানি
অর্থান ওলিয়োগ্রাফ, যুবতী অভিমান করিয়া এক দিকে মুখ ফিরাইয়া
বসিয়া আছে, বুধকাটিও প্রতিশোধপ্রদান-বাদনার মান করিয়া লজ্জা দিকে মুখ
ফিরাইয়া বসিয়াছে। বিলাতী বানিনীর মানের মূল্যপরিমাপক এই চিত্রের
পাশেই একখানি রঙ্গময় ছবি, - বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ চতুর্থ পক্ষের গভীর পদে পুষ্পাঞ্জলি
দান করিতেছে, আন্ধ্র ব্রাহ্মণী, মা দুর্গা কর্তৃক অম্বরের টিকি ধরবার ভয়ে
এক হাতে ব্রাহ্মণের হৃদয় টিকি আকর্ষণ পূর্বক লজ্জা হাতে তাহার পৃষ্ঠে
দ্বিতীয় পক্ষের হাত চালাইতেছে।

এই রকম নানাজাতীয় ছবি দিয়া দোকানদ্বয়ের দেওয়াল ভজিত
করিত। দোকানদার দ্বয়ের ধামে ছোট ছোট পেরেকের উপর জরিসোড়া
চুপীগুলি সাজাইয়া রাখিয়াছে; নানাবর্ণের নানা আকারের চুপী!
চাবারা 'হুগিগ্-পুজা'র সময় স্ব স্ব পুত্রের লজ্জা চাষি গজ পয়সা ব্যয় করিয়া

এক একটি এই টুপি না কিমিলে ভাব্যার গজনার তাহাদের গৃহ অরণ্য-
তুল্য ভূগর্ভ হইয়া উঠে !

কাচের আলমারীর মধ্যে ফুলকাটা ধোয়া কাষিজ, লাল সবুজ
গার্মেন্টের বর্ডিস্, মান্যকর্য এসেঙ্গপূর্ণ শিশি। লাল কালীতে ইংরাজী
বাক্যলার স্থাপন লেবেল-খাঁটা “মহাসৌগন্ধী” কেশটেলের শিশি ; আর
সকলগুলির লেবেলের উপরেই এক একটি রমণীমূর্তি—তাহাদের মাঝে
দিকে চাহিলে বৃষ্টিতে পান্না যায়, তৈলের আবিষ্কর্তা বিম্বত্রাজ্ঞের সমস্ত
কেশরাশি চিত্রিত-রমণীর সম্মুখে স্থাপন করিয়া থ থ তৈলের কেশেৎ-
পাদিকা শক্তির সাক্ষ্য প্রতিপন্ন করিতেছেন !

দোকানের ঠিক মধ্যস্থলে কাচের ল্যাম্প, চিম্নী, কাচের মাস,
আয়না, ছোট বড় মানা আকারের পুতুল, কাগজে-বাধা ছ'গাছ করিয়া
ছোট বড় লাল কাল সবুজ বেগোয়ারী চুড়ী, চীনেমাটির ডিন্, পোর-
সিলেনের পেরালা ও মাস, হাড়ের ‘দামাট’-ওয়াল বড় বড় ছুরী,
তই একটা নোলকনাড়া ‘টাইমপিস্’ ঘড়ি, পিতলের বিবিধ আকারের বট,
লম্বা লম্বা বাঁশী, সাদা লাল হলুদে লজ্জুসে পরিপূর্ণ নান্দা বাতুল বথাক্রমে
সজ্জিত। তাহাদের সম্মুখে ছোট ছোট ছুরী, কাঁচি, সাবান, কিত্তে,
চিকনী, মণিবাগ, দোয়াত, কলম, পেন্সিল, আরও কতপ্রকার সামগ্রী-
পূর্ণ মাস্কেস ; এক কোণে ছড়ি, ছাতা, খড়ম, কড়া, বেড়ি, বাস্তি
প্রভৃতি অসংখ্য জিনিস ; আর এক দিকে লাল কাল হলুদে সব্জে টিনের
পোর্টম্যান্টো।

সকলবেলা হঠাৎই দোকানে দোকানে ক্রেতার ডীড দেবা
খাটতেছে। ছেলেরা কেহ মার্কেলের ভাঁটা কিমিতেছে ; কেহ বাঁশীটাকেই
বেশী মারবান পদার্থ ভাবিয়া তাহাই কিমিতেছে ; কোন-বণিক লজ্জুসে

বোতলের দিকে লুরুদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, ভাবিতেছে, যদি তাহাদের বাগানে এই ফলের একটা গাছ থাকিত! প্রবাসী প্রেমিকেরা,—তন্মধ্যে আদালতের আমলা ও স্কুলের মাষ্টার পণ্ডিত প্রভৃতির সংখ্যাই অধিক,— প্রিয়তমার জন্ত সাবান পমেন্ট কিনিতেছে। দোকানদার ক্রেতার আর্থিক অবস্থার কথা একবারও চিন্তা না করিয়া শুধু তাহার মানসিক আবেগমাত্র লক্ষ্য করিয়া জিনিস বিক্রয় করিতেছে। কেহ নলদমরুতী ও রামরাজার ছবির দর করিতেছে; কোন পিতা পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তাহার জন্ত একটা কাহিজ বা এক মোড়া মোজা কিনিবার অভিপ্রায়ে জিনিসগুলি পছন্দ করিতেছেন।

মনোহারী দোকানের পরেই জুতার দোকান। বাঁশের বাথারীর শেল্‌ফের উপর সারি সারি জুতা, পুরান ছেঁড়া খবরের কাগজ দিয়া মোড়া। ‘চারখানা’ ছিটের একখানি অনতিদীর্ঘ লুঙ্গী ও হাতকাটা খাট মেরজাই-পরিহিত, সাদা কিন্‌ফনে পাতলা কাপড়ে প্রস্তুত অর্দ্ধশব্দ নারিকেলের মালার মত ‘ফক্রে’ টুপিতে আবৃতমস্তক, কপিশ-শ্রুঙ্গ মুসলমান দোকানদার মোলাবক্স নানাবিধ বাক্যকোশলে ক্রেতার মন নরম করিতেছে। সামান্য ‘ব্যবসা’ করিতে আসিয়া সে যে ‘এমান’ নষ্ট করিবে না, তাহা বুঝাইবার জন্ত সে ‘খোদার কসম’ লইতেছে, এবং পরসী অপেক্ষা ‘এমান’ যে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, তাহার অকাটা প্রমাণস্বরূপ অনেক দুর্কৌশল আরবী ও ফারসী বয়েতের সহিত অপৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে অধরনুধা নিঃসারিত করিতেছে; অবশেষে চৌদ্দ আব্দুল লতা পারে তের আব্দুল জুতা ‘স্বহরণ’-সাধ্যায্যে ঠেলিয়া-ওঁ জিয়া পরাইয়া, পাঁচ সিকার স্থানে স-তিন টাকা দর হাঁকিতেছে, এবং “সকাল বেলা বৌনির লম্বা এমন সরস মাল আসল ঘরেই ছাড়তে হ’ল।” বলিয়া

বিশিষ্ট প্রকার আক্ষেপ সহকারে জোড়ার উপর নগদ পাঁচ টাকা দ্বারা লাত রাখিয়া আড়াই টাকা বাজাইয়া লইয়া পরম গভীরমুখে তাহা ক্রেতার হস্তে সমর্পণ করিতেছে।

বৈকালে কাপড়ের দোকানে অত্যন্ত ভীড়। এক এক দোকানে তিন চারি জন লোক বসিয়া কাপড় বিক্রয় করিতেছে, তাহাদের নিশ্বাস ফেলিবার অবসর নাই; তথাপি ‘ওহে, কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে?’ ‘আমি আগে এসেছি; আমাকে আগে বিদেয় করো না কেন?’ ইত্যাদি শব্দের ও বিরাম নাই! পাইকেরগণ ভিন্নগ্রামে বিক্রয়ের জন্ত আশি নব্বই অথবা একশত টাকার কাপড় কিনিয়া মোটা ‘তেহেতে’ ধান দিয়া তাহা কসিয়া বাঁধিতেছে। কোন কোন গরীব লোক অনেক কষ্টে দুই একটা করিয়া কিছু পরদা জমাইয়া তাহাই লইয়া কাপড় কিনিতে আসিয়াছে। তাহার ক্রমাগত একখানির পর আর একখানি কাপড় দেখিতেছে, নূতন নূতন রকমের পাড় পছন্দ করিতেছে, কিন্তু ঠিক মনের মতটি মিলিতেছে না! এবং দৈবাৎ যেখানা পছন্দ হইতেছে, তাহার ভাঁজ খুলিয়া তিনবার করিয়া মাপিয়া দেখিতেছে; দোকানী তাড়া দিয়া বলিতেছে, “তোমার একখানা কাপড় নিয়েই কি আমি সারাদিন নাড়াচাড়া করবো? নিতে হয় নাও, না হয় পথ দেখ!” কেহ পাড়ওয়াল চাদর কিনিতেছে, কেহ নোট-মার্ক বা মহারাণীর চেহারা-বিশিষ্ট কুমাল কিনিতেছে; কেহ কিছুই কিনিতেছে না, কেবল দরই করিতেছে!—পুজার বাজারে ইহারাই সকলের অপেক্ষা বৃদ্ধিমান।

এ দিকে টহাবাজারের মধ্যে ও রাস্তার দুই পাশে জোলায় নানা রকমের মোটা মোটা দেশী খুতি, শাড়ী ও রঙ্গীন গাৰছার মোটা খুলিয়া বিক্রয় করিতে বসিয়া গিয়াছে; তাহাদের দোকানের চারি দিকে চাষার

দল বানরা কেহ ধুতি, কেহ গামছা ক্রয় করিতেছে ; কেহ বা অল্প দোকান হইতে আনীত কাপড়ের দর বাচাই করিতেছে। দরজীর তাহাদের ছোট ছোট দোকানের দ্বারদেশে মোটা লংকথ ও বাজে ছিটের ফতুরা, কারিজ, খেরজাই টাকহীরা চাবার ছেলের লুঙ্গ চিত্তকে বৎপন্নোন্মত্তি উৎকীর্ণ করিয়া তুলিতেছে !

দেওয়ানজীর বাড়ী মহাধুমধামে পূজা ; তাহার তরঙ্গ ময়রার দোকান পর্য্যন্ত গড়াইয়া পড়িয়াছে ! ময়রারা ভুরিপরিমাণ সন্দেহের বাগন পাইয়াছে ; কেহ উনানে ভিন্নান চড়াইয়া তাড়ু দ্বারা নাড়িতেছে ; কেহ গোপালনাগের নিকট ছানা ক্রয় করিয়া ‘পেছে’র মধ্যে ঢালিতেছে ; কেহ ছানা ওজন করিবার জন্ত তাহা গামছার জড়াইয়া যথাসাধ্য জোরে নিংড়াইতেছে।

স্কুলের ছুটি হইয়াছে, ছেলেরা দলে দলে জুতা জামার সম্বন্ধিত হইয়া এক এক ‘রেজিমেন্ট’ শিশু কার্টিকের মত রাস্তার রাস্তার, বাজারের মধ্যে ঘুরিতেছে, হাসিতেছে, গল্প করিতেছে। চারি দিক সরগরম, আসন্ন উৎসবের একটা আনন্দময় উচ্ছ্বাস চারি দিকে উদ্ভলিত !

পঞ্চমীর দিন প্রতিমা চিত্র করা শেষ হইয়া গেল। কিন্তু ‘চালি’র চিত্র এখনও শেষ হয় নাই ; প্রতিমা চিত্র করা অপেক্ষা চালি চিত্র করিতে অধিক নৈপুণ্যের আবশ্যক। ছিদার হালী প্রতিমার সমুখ ‘আড়’ বাধিয়া চালি চিত্র করিতেছে।—উর্দ্ধে উন্নত অলঙ্কার ধূসর পর্বত-শ্রেণী, অসমান শৃঙ্গগুলি সূর্য্য করণে উদ্ভাসিত, ধবলাকৃতি শৃঙ্গের উপর ব্রজিত মেঘস্বর ; এই পর্বতশ্রেণীর একটি সুপ্রশস্ত নিভৃত উপত্যকার একখানি রম্য অট্টালিকা,—স্বদৃশ স্তম্ভশ্রেণী, পীতাত বাতায়ন ও নীলাভ দ্বারে সুশোভিত। অট্টালিকার বহির্দেশে পত্রবহল বিহঙ্গম, বৃক্ষশূলে

পার্বতীমনাথ মহাদেব উপবিষ্ট, পৃষ্ঠদেশে একটি অতি বৃহৎ ওজ্জ্বল 'গেদা' বাগিশ, পার্শ্বদেশে ধবলকার বাঁড় বাড় বাঁকাইয়া চক্ৰলাঙ্ঘিত নিতম্বের শোভা বিকাশ পূর্বক শয়ন করিয়া আছে, মাংসবহুল কৃষ্ণাভ খুঁটটি কঁদের উপর ঈষৎ বন্ধিম। অদূরে নন্দী ত্রিশূলহস্তে বিচিত্র মুখভঙ্গী সজ্জায় দণ্ডায়মান; তাহার স্বক্কে সিদ্ধির বুলি।

কৈলাসপুরীর এক দিকে দক্ষালয়, অত্র দিকে দেব-দানবের সমুদ্র-সম্মুখ। দক্ষালয়ে যজ্ঞ হইতেছে, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ অধিকুণ্ডে আহুতি প্রদান করিতেছে, ভূতেরা কাহারও আনাড়িবিবলম্বিত সুপক দাড়ী ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, স্থলটিকির গোছা ধরিয়া কাহাকেও চীৎপাত করিয়া ফেলিয়া দিতেছে! ছাগমুণ্ড শ্রীমান দক্ষ গায়ে মেরজাই আঁটিয়া কৃতাজলিপুটে স্নান করিয়া জামাতার স্তব করিতেছেন।

অপর দিকে সমুদ্রমহানোদ্রুত স্রবধাভাও হস্তে লইয়া অসুরস্বরনোমোহিনী নারীমূর্তিতে নারায়ণ; দেবগণ করজোড়ে সেই পূর্ণযৌবনা নিরুপমা রূপিনী নারীমূর্তির সম্মুখে ভক্তিমুগ্ধে দণ্ডায়মান; দানবগণ চকিতনেত্রে সেই বিশ্বমোহিনী মূর্তি নিরীক্ষণ করিতেছে, পশ্চাতে মন্দরমন্দির বর্ণমান মহাসমুদ্রের তরঙ্গশিরে ওজ্জ্বল ফেনকিরীট, প্রভাতসূর্য্যের লোহিত কিরণ তাহার উপর বিচিত্র বর্ণচ্ছটা বিকাশ করিতেছে।

এই চিত্রের পার্শ্বেই মহাকালী প্রলয়ঙ্করী মূর্তিতে অসুরধ্বংসে ঐবৃত্তঃ ললাট অগ্নিশূলিক ধক্-ধক্ নেত্রের জ্বলিতেছে, গলে মুণ্ডমালা, এক হস্তে শোণিতরঞ্জিত থড়গা, অত্র হস্তে সত্ত্বশিহ্ন অসুরমুণ্ড, তাহা হইতে বর বর করিয়া রক্তধারা বরিতেছে; শৃগাল উর্দ্ধমুখে সেই শোণিত পান করিতেছে; বৃক্কের নিম্পত্র শাখায় বসিয়া কাক ডাকিতেছে; দেবীর দেহের আভার চারি দিকের লোহিত আলো নীলাভ হইয়া উঠিয়াছে;

দেবীর নিবিড় মুক্ত কেশদাম ঝটিকা-সঞ্চালিত কৃষ্ণবর্ণ মেঘের আঁধার উড়িতেছে ; দেবী উন্মত্তার আঁধার খড়্গ চালাইতেছেন ; দানবের দল,—কেহ ছিন্নহস্ত, কেহ ছিন্নপদ,—কোন মস্তক হীন দেহ গড়াগড়ি বাইতেছে ; অনুরগণের শোণিতলেহনের জন্তই বুঝি দেবীর লোহিত লোল রসনা ‘লল্ লল্’ করিতেছে ! তাঁহার পদতলে শিব ; উন্মত্তা কালী পতিবধে দগ্ধমানা, তাঁহার নয়নে বিজ্ঞান বলকিতেছে ; দানবগণের হস্তী ও অশ্বসমূহ ভয়ে পলাইতেছে । দার্শনিকগণ দেবগণ দেবীর এই সংহার-মূর্তিতে ভীত হইয়া গলগলীকৃতবাসে তাঁহার প্রসন্নতা কামনা করিতেছেন । দেবী অপর হই হস্ত প্রসারিত করিয়া তাঁহাদিগকে বরাভয় প্রদান করিতেছেন ।

‘চালি’র অশ্রু দিকে ভগবতী জগদ্ধাত্রীমূর্তিতে জগৎরক্ষায় প্রবৃত্ত । দানবগণ যোদ্ধৃবেশে কেহ অশ্বে কেহ গজে আরোহণ করিয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত ; তাহাদের দেহ লোহিত পরিচ্ছদে মণ্ডিত ; মস্তকে শিরস্ত্রাপ, কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে শরাসন কোষে অসি ও পৃষ্ঠে শরপূর্ণ তুণীর ; তাহারা সিংহবাহিনীর বহিমানীপু মুখচ্ছবি, তাঁহার প্রশান্তভাব, প্রেত ও তেজ ও পূর্ণ গৌরবের অমূল্য মধুর্যা নিরীক্ষণ করিয়া মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া আছে, কোষের তরবারি উন্মুক্ত হয় নাই, তীর তুণীরবদ্ধ !—চিত্রকর বহুপরিশ্রমে পরিপাটী করিয়া সমস্ত চিত্রাঙ্কন শেষ করিল । তাহার এই চিত্র আঁকিতে পঞ্চমীর রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল ।

বহীর প্রভাতে ঢাকী ও ঢুলির দল গ্রামান্তর হইতে পূজা-বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাহাদের গুভাগমন বার্তা একবার গ্রামময় রাষ্ট করিয়া দিল ! ঢাকের পিঠে কাঠি পড়িতেই ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল, সেই ভাবেই দলে দলে ছুটিয়া আসিতে লাগিল

কোন মেয়ের চুলগুলি ছলিতেছে, আঁচল মাটিতে লুটাইতেছে; কোন ছেলের এক হাতে ছোট 'পাখি'র আধ 'পাখি' মুড়ি, আর এক হাতে একটা অর্ধভক্ষিত শশা, শয্যা হইতে উঠিয়া জলযোগটা বাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, সে সেই যোগাড়েই ব্যস্ত ছিল, এমন সময় হঠাৎ বাজনা বাজিয়া উঠিল, আর মুড়ির 'পাখি' ও শশা হাতে লইয়াই দৌড়! কোন কোন মেয়ে তাহাদের ছোট ছোট ভাই বোনকে কোলে লইয়া ঠাকুর দেখিতে আসিল; কিন্তু ঠাকুর-সাকানো এখনও শেষ হয় নাই! চিত্রকরগণের কেহ গণেশের সাদা গুঁড়ে ও লাল পেটে দামতেল মাখাইতেছে, কেহ বা সিংহের মাথায় সোনালী জগ্জগা আঁটিয়া কৃত্রিম কেশরের সৃষ্টিকার্যো প্রবৃত্ত হইয়াছে।

বাঁধানো বেলগাছের তলায় বোধনপূজা ও ঘটস্থাপনা শেষ হইলে অপরাহ্নে ঠাকুর বেদীতে উঠিলেন। জোরে জোরে ঢাক বাজিয়া উঠিল; পল্লীরসীগণ 'লক্ষণ' করিবার জন্ত গৃহের দ্বারে দ্বারে আলিপনা দিতে লাগিলেন, ঢোকাঠের মাথায় সিন্দুর ও শ্বেত চন্দনের ফোঁটা দেওয়া হইল; প্রত্যেক গৃহ হইতে ধূপের সুগন্ধ উঠিতে লাগিল; পৌরষ্বতীগণ মনোজ্ঞ করিয়া চুল বাধিয়া কপালে একটি ছোট সিন্দুরের টিপ্ কাটিয়া উৎকৃষ্ট স্ত্রীলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া দীপহস্তে গৃহ হইতে গৃহান্তরে 'সন্ধ্যা দেখাইতে' লাগিলেন; কেহ বা তুলসীমূল একটি ক্ষুদ্র মৃৎ-প্রদীপ রাখিয়া জাহ্নু নত করিয়া সেখানে প্রণাম করিলেন; বিধবাগণ হরিনামের মালা লইয়া চন্দ্রালোকিত সোপানে আসিয়া বসিলেন। শুক্লা বস্তীর খণ্ডচন্দ্র শরতের নির্মল নীল আকাশ হইতে স্নানহাস্ত বিকীর্ণ করিতে লাগিল; সেই আলোকে পরিচ্ছন্ন সংকীর্ণ গ্রামাপথ, বৃক্ষ-স্তম্বালবর্তী গৃহস্থের মৃৎ-মুটির, পংখ্যবৃক্ষ আর কাঁটারের গাছ,

কলাবাগান, তৃণশস্যসমাকীর্ণ বেঙ্গলের ক্ষেত, এবং পুডরিণীর কাল কল ছবির স্তায় মধুর শোভা ধারণ করিল।

আজ রাতে পূজাবাড়ীতে কাহারও চক্ষে ঘুম নাই। রান্নাবাড়ীর কোন দিকে ভিমান আরম্ভ হইয়াছে, কোন দিকে লুচি ভাজিবার ভক্ত বড় বড় কাঠের কেটো, পিতলের পরাত, কড়াই, চাক্তা, বেলুন, ঝাঁঝরা বাহির করা হইয়াছে। বারান্দায় বসিয়া পাড়ার অনাথা বর্ষীয়সী বিধবারা তরকারী কুটিতেছে; আলু, পটল, সূর্য্যকুমড়ো ছোট ছোট করিয়া কুটিয়া বড় বড় ঝুড়ি বোঝাই করিতেছে; চাকরেবা আলোর বন্দোবস্ত করিতেছে; ঢাকী-বাজন্দারেরা কলাপাতে চিড়াদই মাখিয়া আজিনার এক পাশে ফলারে বসিয়া গিয়াছে। রান্নাঘরের পাশে স্তূপীকৃত একটা ছাইগাদার অদূরে বসিয়া ও লোলজিহবার লালা সঞ্চয় করিয়া ছুটি কুকুর লুকদৃষ্টিতে ফলারের পাতের দিকে চাহিয়া আছে।

আর রাত্রি নাই, পূর্ব দিক অন্ন ফরসা হইয়াছে। আকাশে এখনও তারা আছে, কিন্তু পূর্বাকাশ বিরলনক্ষত্র; সমস্ত গ্রামখানি তরল অন্ধকারের ফ্রোড়ে নিমজিত। চারি দিক নিস্তর। মধ্যে মধ্যে এক একবার শীতল বাতাস বহিতেছে, আর সেই বায়ুপ্রবাহে শিথিলবস্ত্র শুভ্রদল প্রফুটিত সেকালিকাগুলি শাখা হইতে ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া বৃক্ষমূল আচ্ছন্ন করিতেছে।

চাক ও দোয়েল উভার নিস্তরতা ভঙ্গ করিবার পূর্বেই পূজাবাড়ীতে একসঙ্গে ঢাক বাজিয়া উঠিল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে ঢাক থামিলে রঙনচোকীর দল গৃহপ্রাঙ্গণে প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া কোমল স্নানার্থীতে আগমনী গায়িতে লাগিল। সে সঙ্গীত শ্রীতি, মহাহুতুতি ও পুলকোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। আজ এই শুভশিখিরবিশ্বশোভিত রক্তমাগরত্নিত

শরতের নির্মল প্রভাতে স্বপ্নের সকল আবেগ ঢালিয়া রক্তনচৌকী যে রাগিণী গায়িতে লাগিল, তাহাতে বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির কোমল সঙ্গ মিলন সংঘটিত হইল। আজ এক বৎসর উমা পিতৃগৃহে আসেন নাই; গিরিরাজ কত্কা আনিতে জামাতৃগৃহে গিয়াছিলেন, কিন্তু দিগম্বর উমাকে পাঠান নাই। উমাকে কোলে না পাইয়া গিরিরাণী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছেন; তাঁহার বদন মলিন, রূক্ষ কেশদান আলুলায়িত, শয্যা কণ্টকতুলা; রাণী কত্কা-জামাতার উপর অভিনয় করিয়া ধরায় পড়িয়া আছেন, সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই। রাত্রিশেষে দ্বৈধ তন্ত্রা আসিয়াছে; অরুণের কনককিরণ গবাক্ষ-পথে গৃহকক্ষে পতিত হইয়াছে; রানী স্বপ্ন দেখিতেছেন, অন্তর্মামিনী কত্কা মাতার হৃদয়ে বাধিত হইয়া গণেশকে ক্রোড়ে লইয়া মাতৃসম্মিধানে আসিতেছেন! এই আনন্দ-সংবাদ শ্রবণমাত্র বিধ্ব রাজপুরী প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, কুসুমস্বরভিত সমীরণের সুমন্দ হিম্মল দিকে দিকে এই সুসংবাদ বহিতে লাগিল; সানাই করুণস্বরে গায়িতে লাগিল,—

“গা তোল গা তোল, বাধ মা কুস্তল,

ঐ এলো পাষাণী তোর দৈশানী!”

পীতরৌদ্রসমুদ্ভাসিত শারদ প্রভাতে সানাইয়ের এই সুরধুর সঙ্গীতে চারি দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। শাখাবিরহিত বকলপূর্ণ সুদীর্ঘ বাঁশের কৌড়ার উপর বসিয়া দহিম্বাল পুচ্ছ-বিস্তার করিয়া গায়িতে লাগিল। পাঠক ঠাকুর প্রাতঃস্নানান্তে প্রতিনার পীঠতলে বসিয়া সর্বশরীর ছল্যাইয়া নতমস্তকে অনর্গল চণ্ডী পাঠ করিতেছেন;—তাঁহার পরিধানে ওজ্র তসরের ধুতি, গায়ে রেশমের নানাবলী, ললাটে রক্তচন্দনের ফোঁটা, এক স্নানয়ে স্তম্ভগীর্ভক্তি। বেলোয়ারী ঝাড়ের উপর প্রজাত-

রৌদ্র সবুজ নীল লাল ও বেগুনী রঙের আভা বিকীর্ণ করিতেছে ; আর চাবার ছেলেরা ‘বুলু’-দেওয়া কাপড় পরিয়া কোমরে কড়াপেড়ে চাদর জড়াইয়া ঠাকুর দেখিতে আসিতেছে। একটা খুঁটীতে লম্বা দড়ি দিয়া তিন চারিট নখর কাল পাঠা বাঁধা ; তাহাদের সম্মুখে কতকগুলি কাঁটালপাতা ;—তাহারা আশু বিপৎপাতের সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়াই যেন কাতরচক্ষে চারি দিকে চাহিয়া আর্তনাদ করিতেছে।

বেলা দশ এগারটার মধ্যে সপ্তমীপূজা শেষ হইয়া গেল। ষাঁহারা শাক্ত, তাঁহাদের বাড়ী মহাসমারোহে বলিদান হইল ; ষাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহাদের বাড়ীতে পাঠা-বলি হইল না ; কিন্তু ক্রিয়া ত বাদ পড়িবার ঘো নাই, সেখানে দেবীপদে সিন্দূর-রঞ্জিত উৎসর্গীকৃত একটা বড় চালকুমড়া মহা আড়ম্বরে বলি দেওয়া হইল।

বলিদানের পর আরতির বাজনা বাজিতে লাগিল। আরতি শেষ হইলে নিমজ্জিত লোক জনের আহারাদির অহুষ্ঠান। দেওয়ানজী মহাশয়ের বাড়ীতে অন্ত্যান্ত ব্যাপারের মত ফলারের আয়োজনও কিছু অতিরিক্ত। বিভিন্ন স্থানে দলে দলে লোক থাইতে বসিয়া গিয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই তিনি আমনোক্তার দিয়া পরিদর্শন কার্য শেষ করিতেছেন ; তবে ষাঁহাদের বিশেষ খাতির না করিলে নয় তাঁহাদের,—অর্থাৎ উকীল, ভোক্তার, ধানার দারোগা, আদালতের আমলা প্রভৃতির কাছে তিনি ঘন ঘন আসিয়া “আজ্ঞে এটা চাই ?” “ওটা কি রকম হয়েছে ?” ইত্যাদি প্রশ্নে ভোক্তাদিগের মত জিজ্ঞাসা করিতেছেন। দেওয়ানজী মহাশয় উভয়রূপ অবগত আছেন যে, কোন জিনিস খারাপ হইয়া থাকিলেও মুখের উপর কেহই খারাপ বলিবে না, সুতরাং কোন প্রকার মিষ্টান্ন আহারের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও তাঁহার আক্ষেপের কারণ

নাই; সংখ্যাধিক্যের উপরেই তাঁহার আত্মপ্রসাদ নির্ভর করে। লোকে যদি বলে, "দেওয়ানজী মহাশয়ের বাড়ী বিশ রকম মেঠাই হইয়াছে"—তাহাতেই তিনি তাঁহার মহিমা প্রচারিত হইল ভাবিয়া সন্তুষ্ট থাকেন।

লোক জন আহারে বসিলে গ্রাম্য গোলারা বাঁকে করিয়া বড় বড় নৈবেদ্যের বারকোসগুলি গ্রামস্থ ব্রাহ্মণবাড়ীতে বিলি করিতে চলিল। কতকগুলি অনুগত ব্রাহ্মণের গৃহেই এই সকল নৈবেদ্যবিতরণের নিয়ম আছে; তাহাদের এই বার্ষিক বাদ পড়িবার যো নাই।

নিমন্ত্রিত পুরুষগণের আহার শেষ হইতে না হইতে অন্তঃপুরে কলরব আরম্ভ হইল। নিমন্ত্রিতা রমণীরা দলে দলে অন্তঃপুর পূর্ণ করিলেন।—সকলেই আপনাদিগের উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছেন; কেহ কেহ ছোট ছেলে মেয়েদের সাজাইয়া সঙ্গে আনিয়াছেন। কাহারও সঙ্গে একটি তিন চারি বৎসরের ছেলে,—কাল মখমলের পোষাক-আঁটা, পায়ে বুঁটা মতির খোপ-লাগানো জরীর জুতা, এবং মাথায় যাত্রার দলের রাজার মত জমকালো তাজা! বাঁহাদের ভাল গহনা নাই, তাঁহারা কোন সখীর নিকট হই একখানি অলঙ্কার ধার লইয়া ফলার খাইতে আসিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন ঘরে বিভিন্ন দল বসিয়া গিয়াছে। বাঁহাদের গহনা বেশী বয়স কম, রঙ্গ ফরসা, স্বামী ভাল চাকরী করেন, হুই চারিখানি নাটক নভেল পড়া আছে, তাঁহাদের দলেরই প্রাধান্য; তাঁহাদের পায়ে ডায়মন্‌কাটা মল, পরিধানে উজ্জ্বল বেনারসী বা রঙ্গীন পারসী শাড়ী, হাতে বালা ও চুড়ী, সেমিজের উপর সুচিকিৎস কারুকার্যখচিত জাপানী শিকের বডিস্ আঁটা। কাহারও 'উপর হাতে' ডায়মন্‌কাটা অনন্ত ও তাবিজ শোভা পাইতেছে, কানে হল হুলিতেছে। কাহারও কানে কান, তাহার সহিত সুবর্ণগতার আবদ্ধ

সোনার পরী,—যুবতীর সবদিক্তিত সুরভিত সুদৃশ্য ‘খোঁপা’র অঙ্গ চলিয়া
 সোনার বাণী ওষ্ঠে স্পর্শ করিয়া সুবর্ণের জয়ঘোষণা করিতেছে।
 ইহাদের অদরে হস্তসুধা, নয়নে কটাক্ষবহি, হৃদয়ে প্রগাঢ় প্রেম। এই
 সকল সৌভাগ্যবতী যুবতী সংসারসরোবরের প্রফুল্ল নলিনী; পূজাবাড়ীতে
 ইহাদেরই আদর সর্বাপেক্ষা অধিক। ইহাদের মধ্যে হাসি, গল্প ও
 ভাসখেলা চলিতেছে; কচিং কেহ অদূরে বসিয়া একথানা ‘চণ্ডীদাস’
 খুলিয়া ‘শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দোতো’র নাধূর্য্য উপভোগ করিতেছেন; কেহ
 বা ‘বিঘবৃক্ষ’খানি শেল্ফ হইতে টানিয়া লইয়া হরিদাসী বৈষ্ণবীর গানে
 মনঃগংযোগ করিয়াছেন। দাসীরা এখানে ঘন ঘন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,
 বিনা অহুরোধে মুঠা মুঠা পান আনিয়া মুক্তহস্তে বিতরণ করিতেছে, এবং
 যদি কেহ অন্ত্রগ্রহ করিয়া মুখ তুলিয়া সম্মিতবদনে বলিতেছে—“কি লা
 ভবী! ভাল আছি স্ত ? অনেক দিন যে তুই আমাদের বাড়ী বাস্ নি?”
 অমনই ভবী হাতে স্বর্গ পাইতেছে, ঘুরিয়া ফিরিয়া ঝি-মহলে উপস্থিত
 হইতেছে, এবং কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছে,—“চাটুযোবাড়ীর ছোট বো-
 ঠাকৃরণের মত মাছুষ এ কলিতে আর দু’টি দেখা যায় না; অত যে বড়
 মানুষের ঝি, একটু ‘তামাক্’ নেই। আসল বুনিয়াদী ঘরের ভেয়ে
 কি না।”

দেওয়ানজীর কত্থা মনোরমা শিমলের একখানি অতি উৎকৃষ্ট সৰু
 কালাপেড়ে শাড়ী পরিয়া, মস্তকের নিবিড় বেশরাশি চূড়াকারে সম্মুখ-
 ভাগে বাধিয়া, হাতের মোটা মোটা বালা দু’গাছি উপর হাতের দিকে
 ঠেলিয়া, একমুখ পান চিবাইতে চিগাইতে মহিলাদের আদর অভ্যর্থনা
 করিতেছেন; মনোরমার মুখে হাসি, মনে উৎসাহ, প্রাণে আনন্দ,
 নিমজ্জিতাপণকে মিষ্টবাক্যে আব্বান পূরক তিনি একেবারে তাঁহার

হুস্মানিও পরনাপারে লইয়া বাহিতেছেন; কিন্তু বাড়ীতে কক্ষের সংখ্যা অল্প, সুতরাং ঘুমভীষণ বিভিন্ন ধলে বিতরু হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে শিরা করলিল করিতেছেন।

হুস্মানিও গৃহিণী প্রৌঢ়াগণের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত। তাঁহাদের ছোট ছোট মেয়েরা একদণ্ড স্থির নহে;—তাহারা এ ঘরে বাইতেছে, ওঘরে বাইতেছে, পূজার দালানে উঠিতেছে, আবার মুহূর্ত পরেই হয় ত চীলে-কোঠার উঠিয়া সরস গ্রামখানির উপর নিত্য অবহেলাপূর্ণ সমস্যাটি মিসেপ করিতেছে।

দুই ঘণ্টা বরিতা মেয়েরা আহার করিলেন। আহার বিষয়ে গ্রীষ্ম পুরুষগণের রুচনৈপুণ্য আছে, কিন্তু গ্রাম্যরমণীগণের অনেকই পরিমাণে পোষাইয়া লন! পরিবেশনকালে ইঁহাদের চকুলজ্জা অতিরিক্ত হইলেও, আহারান্তে ভুক্তজ্বরের নিন্দাবাদে তাঁহাদের উৎসাহের অভাব নাই। অবশ্য, সকলেই যে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহেন, এ কথা বলা বাহুল্য।

মেয়েদের খাওয়া শেষ হইতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। চতুষ্পদের সমুখে প্রকাণ্ড টাপোর; আঙ্গিনার বাঁশ পুঁতিয়া উপরে চাটাইয়ের ছাঁউনি দিয়া এই টাপোর নির্মিত হইয়াছে। টাপোরের নীচে কলার কাঁদি, বাতসি লেবু, নারিকেল, কুমড়া, আনারস প্রভৃতি নানাজাতীয় ফল ছোট ছোট দড়িতে ঝুলিয়া রহিয়াছে; সকল বাড়ীতেই টাপোরের নীচে এইভাবে ফল ঝুলাইবার ব্যবস্থা আছে। কেহ কেহ রাত্রিতে আলো আলিবার জন্য টাপোরের সঙ্গে দুই একটা বেলোয়ারি 'হাঁড়ি' বা লঠির ঝুলাইয়া রাখিয়াছে; কিন্তু দেওয়ানজীর বাড়ীতে এ সকল জ্বরের আলোকন কিছু অসাধারণ। সেখানে লম্বা লম্বা মোটা মোটা দড়িতে বহু বাঁধা বোঁল ভাঙবিশিষ্ট সুবুহং বেলোয়ারি ঝাঁক, বড় বড় 'বেল', হিড়ের লাল

নীল সবুজ ডোম-বিশিষ্ট সুদৃশ্য 'ছায়া ল্যাম্প' ঝুলিতেছে। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে আলোগুলি জ্বলিয়া উঠিল; টাপোরের নিম্নভাগ, তিন দিকের মূবহৎ বারান্দা, অদূরবর্তী রাজপথ শতাধিক দীপের আলোকে ঝক্-ঝক্ করিতে লাগিল। আকাশে শারদ সপ্তমীর শশধরের অশ্রুট শুভ্র কিরণে ও উৎফুল্ল গ্রামবাসিগণের সমাগমে গ্রামপথগুলি যেন সজীব হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যা গভীর হইতে না হইতেই আরতির বাজনা ঘোর রোলে বাজিয়া উঠিল; ধূপের ধূমে ও সৌরভে পূজামণ্ডপ পরিপূর্ণ; প্রতিমার মুখে, ডাকের সঙ্গে আলোকরশ্মি ঠিক্রাইয়া পড়িতেছে; দুই পাশে দুইখানা বৃহৎ চিত্রাঙ্কিত তালপাতার পাখা ঘন ঘন আন্দোলিত হইতেছে; মধ্যে মধ্যে ঢং ঢং করিয়া কাঁশরের শব্দ উঠিতেছে; পুরোহিত একাগ্রচিত্তে বামহস্তে ঘণ্টা নাড়িতেছেন, আর দক্ষিণ হস্তে পঞ্চপ্রদীপ ঘুরাইয়া প্রত্যেক দেবদেবীর আরতি করিতেছেন; রমণীগণ প্রতিমার পার্শ্বে পরম্পরের গা ঘেসিয়া দাঁড়াইয়া আরতি দেখিতেছেন; সকলেরই কোতূহলপ্রদীপ্ত প্রসন্ন মুষ্টি প্রতিমার নববিভূষিত পীতোজ্জ্বল শ্রীমুখে সন্নয়। যাহারা পশ্চাতে পড়িয়াছে, তাহারা কিছু দেখিতে না পাইয়া ভীড় ঠেলিয়া সন্মুখে বাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সন্মুখে আর অগ্রণর হইবার স্থান নাই; স্তব্ধরূপে সকলে পরম্পরের গাঙ্গসংলগ্ন হইয়া চিত্রার্পিতের ত্রায় দাঁড়াইয়া আছে, কথাবার্তা সমস্ত বন্ধ। অনেকেরই ললাটে ঘর্ষকিন্দু উদ্গত হইয়াছে।

পুরুষ দর্শকগণ উৎসবপ্রাঙ্গনে আলোকিত ফানুসের নীচে দাঁড়াইয়া স্তম্ভভাবে আরতি দেখিতেছে। বালক বুবা বৃদ্ধ, ভদ্রলোক চাষা—সকলেই প্রতিমার বক্ষদৃষ্টি। পূজামণ্ডপ জনপূর্ণ, প্রতিমার চালি ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না; তথাপি সকলে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া

নজমুন্নেস জায় সেই দিকে চাহিয়া আছে ; আট দশটা ঢাকের প্রবল বাত্রে সন্ধ্যার শুষ্ক আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতেছে ।

কতক্ষণ পরে আরতি শেষ হইয়া গেল । দর্শকগণ অবনতমস্তকে দেবী-চরণে প্রণাম করিয়া একে একে পূজামণ্ডপ হইতে প্রস্থান করিতে লাগিল । ঢাকীরা আরতির বাস্ত ছাড়িয়া নাচনের বাজনা ধরিল । দলে দলে নৃতন কাপড়পরা ঢাবার ছেলে,—কেহ কোমরে চাদর জড়াইয়া, কেহ বা কৌচান পেড়ে চাদরখানি গলায় ঝুলাইয়া তাহার দুই প্রান্ত বামহস্তের মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা জীবৎ বস্ত্রের মস্তক স্পর্শ করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া নাচিতেছে, আর ঢাকীরা মাথা নাড়িয়া, বড় বড় ঢাকের পাথা ঝুলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া বাজাইতেছে,—

“ও মা রণমাঝে দিগম্বরী নাচ গো !”

দেখিতে দেখিতে অনেক যুবক ও যুগ্ম আসিয়া সেই নৃত্যে যোগ দিল ।

গ্রামস্থ ভদ্রলোকেরা দলে দলে গ্রামের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন ; কোন দল চলিতে চলিতে সেই জ্যোৎস্নালোকে পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছেন ; কোন ও দল দিবারি বাঁধাঘাটে মুক্ত আকাশতলে বসিয়া আছেন, অলস নৈশ সমীরণ গায়ে আসিয়া লাগিতেছে ; পাতলা চাদরের অগ্রভাগ অন্ন অন্ন উড়িতেছে ; সম্মুখে দিবারি কাল জল, কানার কানার পূর্ণ ; তাহার উপর চক্ৰকিরণ পড়িয়াছে, দুই একখণ্ড অত্র-ওত্র বেষ মুক্তপক্ষ রাজহংসের জায় অত্যন্ত লবুগতিতে আকাশের এক দিক হইতে অন্য দিকে ভাসিয়া যাইতেছে ; দুই চারিটি নক্ষত্রের কীর্ণ আলোকছটা আকাশের স্বচ্ছ বাতায়নপথে পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে,—জ্যোৎস্নার ত্রিধ্ব-প্রাবনে নক্ষত্রগুলি নিত্যন্ত নিম্নত বোধ হইতেছে ; যেন সেই সুদূর নীলাবরের পুরবাসিনী কোনও নক্ষত্র-

বাঁকিা যুগান্তরপূর্ব হইতে নিদ্রা-বিহীন আনত নেত্রে গুরুবসন উৎসব-চকলা ধরণীর দিকে চাহিয়া আছে।

রাত্রি অধিক হইলে গ্রামের পথে জনসন্মাবেশ জনে হাস হইল। কিন্তু গ্রামা মহিলাবর্গের অনেকে মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া ত্রস্তপদক্ষেপে সমুচিতভাবে এ-বাড়ী ও-বাড়ী ঘুরিয়া প্রতিমা দেখিয়া বেড়াইতেছেন, আর দীর্ঘ অবশ্রুতন দীর্ঘ উত্তোলন করিয়া কোতুহলপূর্ণনেত্রে এক একবার পথের এ-দিক ও-দিক দেখিয়া লইতেছেন; জন্মান্তর জীবনের মধ্যে একবার দৃষ্টিশক্তি লাভ করিলে যেমন ভাবে দেখে, তেমনই আগ্রহাকুল ভূষিত দৃষ্টি।

রাত্রি দশটার সময় আহালাদি সারিয়া গ্রামা 'বাবু' দেওয়ানজী মহাশয়ের বাড়ীতে সখের থিয়েটার দেখিতে চলিলেন। 'বীণাপাণি রঙ্গালয়ে'র 'এম্বের' বাবু পানানন্দে বিভোর হইয়া কাব্যানন্দভোগে প্রবৃত্ত হইলেন। 'কনসার্ট পার্টি'র বাজনা অনেকক্ষণ ধরিয়া বাজিয়া গামিয়া গেল, 'ড্রপ সিন' তুলিবার ঘণ্টা পড়িল; কিন্তু ড্রপ সিনের দড়ি আটকাইয়া বাঙলার 'ড্রপ' কিছুতেই উঠিতে স্বীকার করিল না। ষ্টেজ-মানেজার সদলবলে আধ ঘণ্টা ধরিয়া টানাটানি করিয়া স্বর্ণাঙ্গুত হটলেন, দর্শকগণের মধ্যে ঘন ঘন করতালি পড়িতে লাগিল। অবশেষে বিস্তর চেষ্টায় যদি বা 'ড্রপ' উঠিল, কিন্তু তখনও রাবনের সজ্জা শেষ হয় নাই; তিনি 'প্রীতকমে' দাঁড়াইয়া দাড়ীর অভাবে দশ দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন! অনেক অসুস্থকালের পর বেশকারী একটা দাড়ী টানিয়া বাহির করিল, কিন্তু তাহা একেবারে সাদা, বোধ করি কোনও মুনি কবির দাড়ী; অগত্যা সেই দাড়ীই মুখে আঁটিয়া রাখণ ষ্টেজের রাজ-সভায় প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহার পশ্চাৎবর্তী ভগ্নদৃষ্টক ভৈরব গঙ্গনে বলিতে লাগিলেন,—

“নিশার বারতা সব তোর এ স্বপন,
 রে দূত ! কাতরবৃন্দ যার ভুজবলে
 অমর, সে ধনুর্ধরে বখিল রাখব ?
 জিয়ারী ‘সন্মুখ’ রণে ফুল-‘খেতু’ দিয়া
 কাটিল কি বিধাতারে ? শালগী তরুণ !”

‘হইকী’র প্রসাদে রাবণের কণ্ঠে এই প্রকার অভিনব মেঘনাদবধ কাব্যের
 অবতারণায় দর্শকগণ হোঁ-হোঁ করিয়া হাসিয়া উঠিল ; এবং বাহারা কিছু
 না বুঝিল, তাহার আরাও জোরে হাসিতে লাগিল ! ঘন ঘন হাসি ও
 করতালিতে চারিদিক প্রেক্ষিপিত হইয়া উঠিল ; কিন্তু বক্তৃতা বন্ধ হইল
 না । পূর্ণ উৎসাহে অভিনয় চলিতে লাগিল ।

ওদিকে রাত্রি বারোটার সময় গোসাইবাড়ীতে পাঁচালীর দল আগ্রাণ
 চীৎকারে দাণ্ডারায়ের ‘আগমনী’ আরম্ভ করিল । স্তরুরাজে তাহাদের গীতধ্বনি
 সমস্ত গ্রামে ব্যাপ্ত হইয়া আকাশ পূর্ণ করিয়া ফেলিল !

এইরূপে অষ্টমী ও নবমীপূজার দিন দুইটি সুখ-স্বপ্নের মত দেখিতে
 দেখিতে কাটিয়া গেল ।

নবমীর রাত্রিশেষেই দশমীর বিলায়ের ছবি উৎসবপ্রসঙ্গে বিবাদের ছায়া
 ফেলিয়া যায় । দেখা যায় টাপোরের নীচে আলোগুলি একে একে
 নিবিয়া গিয়াছে ; কেবল চণ্ডীমণ্ডপের লাল ও নীল রঙের কোলের
 ভিতর হইতে বৃহৎ আলোককুণ্ডা বিকীর্ণ হইতেছে, তাহাতে সেই বৃহৎ
 অট্টালিকার অঙ্গকার সম্যক বিদূরিত হইতেছে না, এবং প্রতিমার দুই
 পাশে উচ্চ দীপসাহস্র উপর যে দু’টি স্বতন্ত্র প্রদীপ জলিতেছে, তাহাও
 নির্বাপিত ; তাহার নান আভা প্রতিমার ডাকের সাজে, গণেশের শুঁক্কে,
 অশ্বরের রক্ত-ত্রিধীরভিলক-চিহ্নিত স্তম্ভশত নীল ললাটে, এক ভগবতীর

ভৈলগঞ্জিত পীতাত মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। গণেশের পাশে বজ্রাবৃত কলা-বৌ, দেওয়ালে তাহার ছায়া পড়িয়াছে। দিবারাত্রির অবিরাম পরিশ্রমে ক্লান্ত পুরবাসীগণ অবসর বেহেঁ যে যেখানে পাইয়াছে পড়িয়া ঘুমাইতেছে! সমস্ত গ্রাম তখনও নিদ্রাভ্রম; কেবল দুই তিনজন টহলদার করতাল বাজাইয়া উবার মূহ আলোকে বিজন গ্রাম্যপথ স্ফুটিত করিয়া সম্মুখে গাঙ্গিয়া চলিয়াছে,—

“গা ভোল পুরবাসী, রজনী পোহাইল,

কর সব বিভূষণ গান।”

সেই গান সুখস্বপ্ন পুরবাসীবর্গের কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে; যেন দেবলোকের কোনও মঙ্গলমুখ মোহন সঙ্গীতে রূপান্তরিত হইল। সুপ্তিঘোরে তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিতেছে!

ক্রমে চারিদিক পরিষ্কার হইয়া গেল। আকাশ অতি নির্মল। প্রভাতসন্ধ্যার মূহ হিম্মোলে বৃক্ষপত্র সন্ সন্ করিয়া কাঁপিতেছে, এবং তাহা হইতে মুক্তার জার ফুল শিশিরবিন্দু টুপ্ টাণ্ করিয়া করিয়া পড়িতেছে; আর শিউলী গাছের সর্বোচ্চ শাখায় বসিয়া একটি দহিরাণ অতি মধুরস্বরে শারদ প্রভাতের আবহানসঙ্গীত গাৱিতেছে।

প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া ছেলেরা ভাড়াভাড়ি বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। আজ দুর্গাঠাকুরাণীর কাছে পুষ্প ও দুর্গানাবাহিত বিষণজের অঞ্জলি দিতে হইবে; সকলেরই আজ ফুলের দরকার। অনেকজন ভোর হইয়াছে, হয় ত, আর ফুল পাওয়া বাইবে না ভাবিয়া ছেলেরা বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিল, এবং সকলে মিলিয়া ভাড়াভাড়ি বোসেদের ফুলবাগানের দিকে ছুটিল। কাহারও হাতে থালা, কাহারও হাতে একটা বড় সাজি, কেহ কলাবাখান হইতে একখান অঁখোট কলাপাতা ছিঁড়িয়া লইয়া তাহাতেই পুষ্পচন্দন

করিবে—এই মতলব করিয়া শুধুহাতেই চলিল। ঘোঁসেদের ফুলবাগান গোবিন্দপুরের মধ্যে প্রসিদ্ধ বাগান। সে বাগানে না পাওয়া যায় এমন ফুল নাই! একটি ছেলে কোমরে কাপড় জড়াইয়া একটা প্রকাণ্ড চাপা গাছে উঠিয়া পড়িল। শিশিরে শাখাপল্লব হইতে ঝুঁড়ি পর্যন্ত সমস্ত ভিজিয়া গিয়াছে, সে দিকে আক্কেপ নাই; কতবার পা পিছলাইয়া গেল, তথাপি কাতর বা ভয়োৎসাহ না হইয়া সে গাছের আগ্‌ডালে উঠিয়া বসিল, এবং ফুল পাড়িয়া কৌচড় ভরিতে লাগিল। অসংখ্য স্থলপদ্ম ফুটিয়া বাগান আলো করিয়া আছে দেখিয়া তাহার সানন্দে ডাল ভাঙ্গিয়া, ঝুঁড়ি ছিঁড়িয়া, শিশিরশিক্ত ফুলে পাত্র পূর্ণ করিয়া ফেলিল;—বেলা, গন্ধরাজ, বুঁই, ও শিউলী ফুলে সাজি ভরিয়া গেল। এমন সময় মল পায়, নোলক নাকে ছোট ছোট কয়েকটি কাঁশারীর মেরে, ‘বুঁটি’ করিয়া তাহার দ্বারা কাপড় ছোপাইবে বলিয়া, ডালা-হাতে শিউলীর ফুল কুড়াইতে আসিতেছিল; অর্দ্ধপথে আসিয়াই তাহার দ্রুতদৃষ্টিতে দেখিল, একদল ছেলে বাগানে ফুল তুলিতে আসিয়াছে! দেখিয়াই তাহার ক্রতপল্লবিক্কেপে পলায়ন করিল। মলের শব্দ ছেলেরা বুঝিল, মেরেগুলি ফুল কুড়াইতে আসিতেছিল, তাহাদিগকে দেখিয়া পলাইয়াছে; ইহাতে তাহাদের বড় আনন্দ বোধ হইল, তাহারা খুব হাসিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সূর্য উঠিল। স্রোতের রস ঠিক কাঁচা সোণার মত! গাছের পাতার, কুবকের কুটীরে, জরীদারের জীর্ণ অষ্টাঙ্গিকার, নদীর জলে ও শিশিরশিক্ত সবুজ ঘাসের উপর ভরপ সূর্য্যের কিরণ প্রতি ক্রান্ত হইল। পূজাবাড়ীতে একটা বারান্দার ছেঁড়া কবলের উপর বসিয়া স্বতন্ত্রকৌর মল বে ঘুরে সানাই বাজাইতে লাগিল, তাহা অতি

কল্প ও বেদনাগ্নুত,—তাহাতে সকলেরই মনে শুধু বেন মর্গভেদী বিদায়ের অশ্রুসজল কাহিনী জাগিয়া উঠিতেছিল। উৎসবগৃহে ছেলেরা মহানন্দে দাপাদাপি করিতেছে; কেহ হাসিতেছে, কেহ নাচিতেছে, কেহ কাহাকেও ডাকিতেছে; কেহ ভিখারীর সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে। আজ দশমীর এই বিবাদ-মলিন প্রভাতে সানাইয়ের বিরাব নাই; সে শুধু কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিরহগাথা গায়িয়া যাইতেছে। আজ গিরিরাজ উমাকে বৎসরের মত বিদায় দিবেন। তিন দিবসের উৎসব বেন নিমেষের মধ্যে শেষ হইয়া গেল, তাই পিতা মাতার চক্ষে জল ও বক্ষে দুর্ভহভার! আজ মা আনন্দময়ী পিতৃগৃহ ত্যাগ করিবেন; সানাই কাঁদিয়া কাঁদিয়া বিদীর্ণকণ্ঠে সেই কথাই সমস্ত গ্রামে ঘোষণা করিতেছে। আজ মাতা তাহার আদরিণী কন্যা উমাকে ক্ষুণ্ণমনে দীর্ঘকালের জ্ঞাত খবুরবাড়ী পাঠাইতেছেন।

বেলা দশটার মধ্যে ‘যাত্রা’ সারিয়া লইতে হইবে। পল্লীগ্রামে হিন্দুমাত্রেরই দশমীর দিন বিষপত্রে দুর্গানাম লিখিয়া তাহা দেবীপদে অঞ্জলি দিতে পাঠান; ইহাকেই ‘যাত্রা করা’ বলে। নয়টার মধ্যে সকলেই বিষপত্রে দুর্গানাম লিখিয়া দিল; যে সকল ছোট ছোট ছেলে সবোত্র লিখিতে শিখিয়াছে, তাহারাও তাহাদের দাদা বা কাকার কাছে বসিয়া পরম গম্ভীরভাবে থাকের কলম দিয়া মোটা মোটা হরফে কতকগুলি বিষপত্রে ‘শ্রীঈদুর্গা সহায়’ লিখিতেছে! তাহার পর ছেলেরা কেহ জ্ঞান করিয়া, কেহ বা জ্ঞান না করিয়াই ময়ুরকণী, ঢেলী, তসর প্রভৃতি নানা বস্তুর পট্টবস্ত্র পরিয়া ও মোজাতে সর্কশরীর ঢাকিয়া, খালি পায়ে ‘যাত্রা করিতে’ বাহির হইল। হাতে একখানি রেকাবী, তাহার উপর দুর্গার নাম-লেখা কতকগুলি বিষপত্র ও ফুল; রেকাবীর এক পাশে

একখান সিন্দূর ও একটা পিতলের কোটা, কোটার মধ্যে সিন্দূররঞ্জিত করেকটি টাকা ও আধূলি,—ছই একটা বাদসাহী আমোলের, ছই একটা বা নূতন; তাহাদের ‘করচে’ ও একটা টাকা বা আধূলি। কোটার টাকা যেন কোথাও পড়িয়া না যায়, এজন্য পিতামাতা ছেলেরের সাবধান করিয়া দিলেন। তাহারা হাসিমুখে পূজাবাড়ীর দিকে চলিল।

‘যাত্রা করিবার’ জন্ত প্রত্যেক পরিবারের এক একটা পূজাবাড়ী নির্দিষ্ট আছে; তাহারা সেই বাড়ী ভিন্ন অন্য বাড়ীতে যাত্রা করিতে যায় না। পূর্বপুরুষ হইতে তাহাদিগের মধ্যে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে; তবে যদি দৈবাৎ পূর্বনির্দিষ্ট কোনও বাড়ীতে পূজা বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে তাহারা আর একটা বাড়ী ঠিক করিয়া লয়।

ছেলেয়া বিবপত্র ও পুষ্পপূর্ণ রেকাবী লইয়া ধীরে ধীরে পূজাবাড়ীতে উপস্থিত হইল; যাহারা ব্রাহ্মণ ও উপবীতধারী, তাহারা স্বহস্তেই ফুল বিবপত্র ও সিন্দূর দেবীচরণে ঢালিয়া দিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল, তাহার পর রেকাবীতে ছই চারিটা বেলের পাতা ও কোটার খানিক সিন্দূর তুলিয়া লইয়া বাড়ী ফিরিল; ফিরিবার সময় “করচ” হইতে টাকা বা আধূলিটা খুলিয়া দেবীচরণে ছোঁয়াইয়া কোটার মধ্যে অন্ত্রান্ত টাকার সঙ্গে রাখিয়া দিল। এই টাকাকে ‘সাইতের টাকা’ বলে; গৃহস্থেরা অতি হুঃসময়েও এ টাকা খরচ করে না। শূদ্রের ছেলেয়া চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া পুরোহিতের হাতে রেকাবী দিয়া ভক্তিভরে দেবীচরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবার সময় তাহাদিগকে এক একটা উৎসর্গীকৃত ফুলের বত পবিত্র দেখায়। পুরোহিত শূদ্র ছেলেরের হাত হইতে রেকাবী ও কোটা লইয়া ঋণাবহিত কার্য শেষ করিয়া তাহাদের রেকাবী ও কোটা ফিরাইয়া দেন; কিন্তু তাহারা যে স্বহস্তে ব্রাহ্মণবালকদের বত দেবার

পদপ্রান্তে ফুল ও বিধপত্র দিতে পারনা, এ জন্ত তাহাদের মনে বড় দুঃখ ! দুঃখে ও অভিমানে তাহাদের কোমল মুখ মলিন হইয়া যায় ; কিন্তু পথে আসিতে আসিতেই তাহারা তাহা ভুলিয়া যায়, এবং চক্কর ছল ছল ভাব দূর হইয়া মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে ।

আজ সকল বাড়ীতেই বিশেষ সমারোহে আহারের আয়োজন হইয়াছে । গ্রামবাসিগণের বিশ্বাস, যদি আজ আহারাদির অনুষ্ঠান অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সারা-বছর সুখে কাটিবে । অল্প দিন যে শাকারেরও সংস্থান করিতে পারে না, আজ সে যেমন করিয়া হউক, পাঁচখানি ব্যঞ্জনের আয়োজন করিয়াছে ।

আহারাদির পর ছেলের দল নৌকা বায়না করিতে জেলেপাড়ায় চলিল । আজ বৈকালে প্রতিশ্রাবিসম্পর্কনের সময় নদীতে ‘বাইচ্’ হইবে । পূর্বদিনই অধিকাংশ নৌকার ‘বায়না’ হইয়া গিয়াছে ; আজ দুই তিন টাকার কমে কোন মাঝি নৌকার ‘বায়না’ লইতে রাজী নহে । কোন কোন মাঝির ‘বাঁধা ঘর’ আছে, প্রতি বৎসর বিজয়ার দিন তাহাদিগকেই ‘বাইচে’র জন্ত নৌকা ভাড়া দেয় ; সে জন্ত নির্দিষ্ট ভাড়া ও নূতন কাপড় বা চাদর বকশিস পায় । যদি কোন বৎসর নৌকার ভাড়ার হার অত্যন্ত বৎসর অপেক্ষা কম কি বেশী হয়, তবে সে বৎসর ও এই বাঁধা খদ্দেরের নির্দিষ্ট ভাড়ার ব্যতিক্রম হয় না ।

বেলা দুইটার সময় পূজাবাড়ীতে বরণের বাজনা বাজিয়া উঠিল ; ঢোল ঢাক ও কাঁশি তালে তালে বাজিতে লাগিল । বরণের বাজনার মধ্যে এমন একটা বিষাদ-মাথা করণ ব্রহ্মনের ভাব আছে—তাহা অনির্বচনীয় ; শুনিতে শুনিতে মন উদ্গাদ হইয়া পড়ে, বুক বেঁট খালি হইয়া যায় ! মনে হয়, এত আনন্দ, এত উৎসব, সকলই

আজ কুঁরাইল ! মা জগদম্বা আজ সত্যই সারা বাঙ্গালা আঁধার করিয়া পতিগৃহে চলিলেন ।

বরণের বাজনা বাজিবামাত্র পুরনারীবর্গের মধ্যে কোলাহল উখিত হইল । সধবারা বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমা বরণ করিতে চলিলেন ; বিধবারা গুত্রবেশে দূরে দাঁড়াইয়া সম্মেলনে এই বিদায়দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন । প্রথমে গৃহিণী, পরে পুত্রবধু, তাহার পর কত্না দেবদেবীগণকে বরণ করিলেন ; শেষে কাত্যায়নীর মুখে সন্দেশ ও পান শুঁজিয়া দিয়া, “আবার এসো মা, সন্তৎসর সকলকে ভাল রেখো, মা !”—বলিয়া অকালে কর্ণবেষ্টনপূর্ব্বক নতমস্তকে প্রণাম করিয়া ছলছল চক্ষে একটু দূরে দ্বারের অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইলেন ।

বরণ শেষ হইলে বাহকেরা চণ্ডীমণ্ডপ হইতে প্রতিমা নামাইয়া, বড় বড় বাঁশের উপর রাখিয়া দৃঢ়রূপে বাঁধিল ; তাহার পর তাহা কাঁধে লইয়া পথে বাহির হইয়া গেল । প্রতিমার মুখ বাড়ীর দিকে ; কারণ, বাড়ী হইতে দেবীর বিমুখ হইয়া বাহির হওয়া বড়ই অলক্ষণ !—তাক ঢোল জোরে জোরে বাজিতে লাগিল ; দেবীর অগ্রে অগ্রে রূপার দামাটিওয়ালার রেশমের ঝালর-শোভিত প্রকাণ্ড ছাতা, আড়ানী ও খাস নিশান চলিল । পথ জনাকীর্ণ ; পথের দুই ধারে সমবেত নরনারীবর্গ হাত তুলিয়া ঠাকুর-প্রণাম করিল । দেবীর তৈলরঞ্জিত মুখের উপর অপরাঙ্কের স্বব্যাক্ষরণ পড়িয়া চিক্ চিক্ করিয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া বৃদ্ধারা বলাবলি করিতে লাগিল, “খন্তরবাড়ী যেতে হচ্ছে বঁলে মা কাঁদছেন !”

বেলা চারিটার সময় বাহকগণ প্রতিমা লইয়া নদীকূলে উপস্থিত হইল । হ'খানা নৌকা জুড়িয়া সমস্তরাল বাঁশ কেলিয়া তাহাতে প্রতিমা তুলিবার

ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; প্রতিমা নদীকূলে অসীত হইলে মাঝিরা জোড়া নোকা তীরের কাছে ভিড়াইয়া রাখিল। সকলে হরিস্বনি করিয়া সেই সমান্তরাল বংশদণ্ডগুলির উপর ধীরে ধীরে প্রতিমা স্থাপন করিল; চুলিরা দুই দিকের দুই নোকায় চড়িয়া, কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া নাচিয়া নাচিয়া বাজনা বাজাইতে লাগিল। গ্রামের সকল প্রতিমাই জোড়া নোকায় নদীর অগ্রশস্ত বকে এদিক ওদিক করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। দেওয়ানজীর একখানি হাজার-ম'ণে বড় নোকায় তাঁহার অমুগ্ধীত অনেক লোক পুত্রকত্তাবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া “ভাসান” দেখিতে উঠিল। নোকায় হৈএর উপর লোহিতপরিচ্ছদভূষিত বরকন্দাজেরা আশাশোটা ঘাড়ে লইয়া সদর্পে বসিয়া রহিল। অনেকের হাতের ছোট বড় নিশান উড়িয়া উড়িয়া দেওয়ানজীর প্রতিপত্তি ও অর্থ-গৌরবের ঘোষণা করিতে লাগিল। এই নোকাখানি দেওয়ানজীর প্রতিমায় নোকায় অমুগমন করিতে লাগিল।

আজ নদীতে অসংখ্য নোকা। ছোট ছোট পান্দী ও ডিকীগুলি আরোহিবর্গে পরিপূর্ণ। কোন নোকায় তিনখানা, কোন নোকায় চারিখানা দাঁড়। আরোহপ্রিয় পল্লীদুবকগণ নোকায় উপর বিছানায় বসিয়া স্তুতি করিতেছে ! কেহ বাঁধা হাঁকায় তামাক টানিতেছে, আর চারি দিকে চাহিয়া দেখিতেছে; কোন নোকায় চারি জন আরোহী মুখোমুখী বসিয়া তাস পিটিতেছে; কোন নোকায় বাজারের দোকানদারেরা টেরি কাটিয়া, কারিজের উপর ওয়েষ্টকোট আঁটিয়া, তবলা ও বন্দিরা বাজাইয়া টপা গারিতেছে,—

“(আমি) প্রাণের অধিক

ভালবাসি করে,

না জানি তার কেমন মন

বাসে না আমারে !”

কেহ কেহ বা ঞ্জপদ খেলার শ্রাদ্ধ করিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া বলিতেছে, “জোরে টানো,—আরো জোরে !” নৌকাগুলি নদীজল আলোড়িত করিয়া দক্ষিণ মুখে ছুটিতেছে, এবং আধ ক্রোশ বাইতে না বাইতে আবার উত্তর দিকে ফিরিয়া আসিতেছে !

বাঁড়ুঘোদের সঙ্গে চাটুঘোদের সকল কাজেই অনেক দিন হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়া আসিতেছে। আজ হুই দলই হু’খানা নৌকার ‘বাইচে’ উঠিয়াছে। হু’খানি নৌকাতেই লালপাগড়ী-বাঁধা সুসজ্জিত আরদালী লম্বা লাঠী হাতে ছৈএর উপর বসিয়া নৌকার শোভা-রক্ষি করিতেছে। হঠাৎ চাটুঘোদের নৌকাখানা ঘুরিয়া আসিয়া বাঁড়ুঘোদের নৌকার সম্মুখে পড়িল ;—বাঁড়ুঘোদের নৌকার উপর হইতে বুদ্ধ বরকন্দাজ হাঁকিল, “এই চার-দেড়ে পান্সী,—তফাৎ !” বলা বাহুল্য, চাটুঘোদের নৌকার দাঁড় চারিখানি ; কিন্তু বাঁড়ুঘোদের নৌকার পাঁচ দাঁড়। চাটুঘোদের পান্সীর দাঁড় চারিখানা হইলেও নবীন খুব পাকা মাঝি ; সে চাটুঘোদের ছোট বাবুকে ডাকিয়া বলিল, “ছোট বাবু, বাঁড়ুঘোদের পাঁচদেড়ের বরকন্দাজের ভারি তেজ ! হকুম হয় ত একবার ওর সঙ্গে পাল্লা দিবে ‘বাইচ’ মারি।” ছোট বাবু হাসিয়া বলিলেন, “পাঁচ পাঁচখান দাঁড়, চারিখানা দাঁড়ে পারবি কি ? হারিস্ যদি, আমার অপমানের সীমা থাকবে না।” নবীন সোৎসাহে বলিল, “কেন পারবো না, হজুর ?—আমার তিন দাঁড়েই ওর পাঁচখানা দাঁড়কে খোল খাইয়ে দিতে পারি, চারখানার ত কথাই নাই ! হুই বিঁকেতে আসে বেরিয়ে বাবো ; বকশিস্ কি শুধুতুই নেব, হজুর ?”

নবীনের কথা শুনিয়া ‘হুজুর’ পরম্প্রীত হইয়া হাতমুখে বলিলেন, “আচ্ছা, তবে লাগ !”

তখন নবীন শক্ত করিয়া হাল চাপিয়া ধরিয়া ঝড়ুঘোদের মাঝি কালাচাঁদকে ডাকিয়া বলিল, “মাকোসার ঠ্যাংয়ের মতন কতকগুলো দাঁড় থাকলেই হয় না ! পারিস্ আগে বেরিয়ে যা, চোখরাঙ্গানির কি তোয়াকা রাখি ?” ঝড়ুঘোদের মেজবাবু বলিলেন, “নব্বনের ত খুব সাহস দেখ্ চি রে ! কালা, খুব হুঁসিয়ার ! খবরদার, যেন আগে বেরোতে না পারে !”

কালাচাঁদ সাবধানে হাল ধরিল। দুই পাল্লীর অশুরের মত বলবান নয়টা দাঁড়ী প্রাণপণে দাঁড় টানিতে লাগিল। তাহার সটান চিং হইয়া পড়িতেছে ও উঠিতেছে, বাহুয়লে মোটা মোটা শিরাগুলি ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, সর্কাসে ঘাব করিতেছে, দাঁড়ের জল ঝপ্ ঝপ্ করিয়া নৌকার উছলিয়া উঠিতেছে, ‘বোঠে’তে মস্ মস্ করিয়া নূতন দড়ির শব্দ হইতেছে ! নদীর দুই তীরে অসংখ্য লোক রুদ্ধ নিশ্বাসে কোতুহল বিক্ষারিত নেত্রে নৌকা দু’খানির দিকে চাহিয়া আছে—কে আগে যাইতে পারে ! নবীন মাঝির নৌকার দাঁড়ীরা পুরস্কারের লোভে ও প্রবল বিপক্ষকে পরাস্ত করিবার আশায় এমন জোরে ‘ঝিক্’ মারিতে লাগিল যে, ঝড়ুঘোদের পাল্লী বুঝি আর আগে যাইতে পারে না ! কালাচাঁদ প্রতি মুহূর্তে পরাজয়ের আশঙ্কায় দাঁড়ীদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিল।—তাহার পাল্লীর গল্লরের পাশের দাঁড় পুরানো দড়ি দিয়া ‘বোঠে’র বাঁধা ছিল—টানের জোরে সেই ‘বোঠে’র দড়িগাছটা ‘ফট্’ করিয়া ছিঁড়িয়া গেল ; দাঁড়ী ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া ঝপাং করিয়া জলে পড়িয়া গেল ! নবীন মাঝির দাঁড়ীচতুর্দয় ঠিক সেই সময়ে খুব জোরে একটা ‘ঝিক্’ মারিল ; আর তাহাকে বাধা দেয় কে ? দেখিতে দেখিতে তাহার পাল্লী কালাচাঁদের

পাঞ্জীকে পশ্চাতে ফেলিয়া সাত আট হাত আগে বাহির হইয়া গেল ! তীরে দর্শকগণ হাততালি দিয়া উঠিল। ছোটবাবু আনন্দে অধীর হইয়া গায়ের গরদের চাদরখানা নবীন মাঝির গারে ফেলিয়া দিলেন ; বকশিস্ পাইয়া নবীন চাহা মাথায় বাঁধিয়া নাচিতে লাগিল।—কালার্টাদ লজ্জায় নতমুখ হইয়া নৌকা ঘুরাইয়া দিল।

বেলা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে নদীতীরে জনতা আরও বাড়িয়া উঠিল। নদীতীরেই থানা ; থানার সম্মুখে সতরঞ্চি ও গালিচা পাতা ; অনেক ভদ্রলোক ভাসান দেখিবার জন্য আসিয়া সেখানে আশ্রয় লইয়াছেন।

শরৎকালে বানের জল অনেক নামিয়া গিয়াছে, সেজন্য নদীর দু'পারে অত্যন্ত কাঁদা হইয়াছে ; দর্শকগণ স্থানাভাবে সেই কন্দনের উপরেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ! নদীর অপর পার্শ্ব ইটের পাঁজার উপর ও শ্রেণীবদ্ধ বাবলা গাছের ডালে অনেক লোক বসিয়া ভাসান দেখিতেছে,—তাহাদের পরিধানে লাল, সাদা, নীল,—নানা রঙ্গের বাহারে কাপড় ; গারে বেরজাই ; কাঁধে বা মাথায় চাদর।

পল্লী-রমণীগণ বিচিত্র বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া বটতলার ঘাটে একাও বটগাছের ছায়ার দাঁড়াইয়া ভাসান দেখিতেছেন। সে দিকে পুরুষের সমাগম নাই, স্তত্রাং তাঁহারা নিঃশব্দচিত্তে নদীর দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন ; কেবল মধ্যে মধ্যে কোন কোন নৌকার নির্লজ্জ আরোহীরা ডুগি তবলা বাজাইয়া অল্লীল গান গায়িতে গায়িতে বখন সেই ঘাটের অভিমুখে নৌকা বাহিয়া আসিতেছে, তখনই তাঁহারা একটু চঞ্চল হইয়া অবশুষ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া, কেহ গাছের আড়ালে, কেহ বা কোন বর্ষায়সী রমণীর পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইতেছেন ;—আবার নৌকা দূরে চলিয়া গেলে স্থানে কিরিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের কোরল

মুখে অপরাহ্নের রৌদ্র প্রতিকলিত, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম; কোন কোন বালিকার চূর্ণকুন্তলরাশি উড়িয়া চোখে মুখে আসিয়া পড়িয়াছে; একটু ভাল যায়গায় সরিয়া দাঁড়াইবার জন্ত কেহ কাহারও আঁচল ধরিয়া টানিতেছে; কোথাও বা তিন চারি জন সমবয়স্ক-যুবতী একত্র দাঁড়াইয়া, কোন প্রতিমার গঠন ভাল হইয়াছে, কাহার ভাল করিয়া ঠাকুর সাজাইয়াছে, তাহারই আলোচনার প্রবৃত্ত। কেহ কেহ নোকামোহী চুলিদিগের উদ্দাম নৃত্য দেখিয়া মুখে আঁচল দিয়া হাসিতেছে, এবং কোন সহচরীর মুখের উপর কোহুকদীপ্ত চঞ্চল চক্ষু স্থাপন করিয়া চুলিদিগের সেই হাস্যোদ্দীপক আশোদ-নৃত্য দেখিতে বলিতেছে।

চারি দিকে আনন্দের পূর্ণ উচ্ছ্বাস!

দেখিতে দেখিতে সূর্য্য পশ্চিম গগনপ্রান্তে নদীর পরপারে আশ্র-কাননের অন্তরালে ঢলিয়া পড়িল। ধূসর সন্ধ্যায় চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিল। দেওয়ানজীর প্রতিমার নোঁকায় বড় বড় মশাল ধক্ ধক্ করিয়া জলিয়া উঠিল; শব্দ ঘণ্টা বাজিতে লাগিল; আরতি আরম্ভ হইল।

নদীজলে অনেক দূর পর্য্যন্ত মশালের আলো প্রতিকলিত হইতেছে। প্রতিমার নোঁকার একপ্রান্তে দেওয়ানজী গলগলীকৃতবাসে কৃতাজলিপুটে গভীরভাবে দণ্ডায়মান। পুরোহিত ঠাকুর দক্ষিণহস্তে পঞ্চপ্রদীপ ও বামহস্তে ঘণ্টা নাড়িয়া ঠাকুরের আরতি করিতেছেন; দর্শকবৃন্দ একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া আছে।—শরতের ধূসর সন্ধ্যায় পল্লীপ্রান্তবাহিনী-তরঙ্গিনী বক্ষে এক অপূর্ণ দৃশ্য!

সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিলে ক্রমে ক্রমে প্রত্নশাস্ত্রলব্ধ জোড়া নোঁকার উপর হইতে ধীরে ধীরে নদীর জলে নাসাইয়া দেওয়া হইল; দর্শকগণ উচ্চৈঃস্বরে ‘হরিবোল’ দিতে লাগিল। বাহার জলের ধারে ছিল,

তাহারা অঙ্গলি পুরিয়া জল তুলিয়া মাথার উপর ছড়াইয়া দিল। প্রতিবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক নৌকা হইতে জলে নামিয়া পড়িল। কেহ অবগাহন করিতে লাগিল; কেহ কেহ ডুব দিয়া রাস্তা কুড়াইতে লাগিল।—বিসৰ্জন দেখিয়া দর্শকগণ নদীতীর হইতে গৃহমুখে প্রত্যাবর্তন করিল।

সকল প্রতিবার বিসৰ্জন শেষ হইলে দেওয়ানজীর প্রতিবার বিসৰ্জন হইল; ঢাকীরা সঙ্গেসঙ্গে বিসৰ্জনের বাজনা বাজাইতে লাগিল; সানাই কাদিয়া গায়িল,—

“এই যে ছিল কোথায় গেল কমলদলবাসিনী!”

নৌকারোহী আৰোদপ্রিয় যুবকগণ তীরে নৌকা ভিড়াইয়া গৃহে চলিল। দেখিতে দেখিতে নদীকূল নির্জন হইয়া পড়িল। বিসৰ্জনের বাজনার গ্রাম্যপথ ধ্বনিত করিয়া তুলীরা পূজাবাড়ীতে কিরিয়া চলিল;—অনেকে আত্মবন্দে, ধীরপদবিক্ষেপে, বিধব্রমণে তাহাদের অনুগমন করিতে লাগিল।

দশরীর চাঁদ শরতের নির্মল আকাশ হইতে উজ্জল শুভ্র কিরণধারা বিকীর্ণ করিতেছে; সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী জ্যোৎস্নাপ্লাবিত; বায়ু-হিলোল মধ্যে মধ্যে টাপা ও রজনীগন্ধার গন্ধ বহিয়া আনিতেছে,—যেন তাহা শুভ্রজ্যোৎস্নাময়ী শারদযামিনীর সুস্বিঞ্চ সুস্বভি-বাস! উৎসবপ্রত্যাবৃত্ত পল্লীবাসিগণ সেই জ্যোৎস্নালোকে সানন্দচিত্তে আত্মীয় প্রতিবাসিগণের গৃহে গৃহে ঘুরিতেছে, পরস্পরের মধ্যে প্রণাম আশীর্বাদ ও আলিঙ্গন চলিতেছে, মিষ্টায় ও পান বিতরিত হইতেছে। ভবিষ্যতে সিদ্ধিলাভের আশায় ও বর্তমান ক্ষুণ্ণের প্রলোভনে গ্রাম্য যুবকগণ গামলা গামলা সিদ্ধি গুলিয়া, তাহার সহিত দ্রব ও শর্করা সংমিশ্রিত করিয়া, কেহ এক গেলাস, কেহ আধ গেলাস পান করিতেছে! নেশার বিভোর হইয়া কেহ নাচিতেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ বা গান

গারিতেছে। পুরাজনাবর্গের সর্ব্ব কলরবে অন্তঃপুর মুখরিত। চারিদিকে আনন্দ, উল্লাস, জীবন্তভাব; চিরশত্রুর ও শত্রুতা ভুলিয়া আজ গ্রামবাসিগণ তাহাকে প্রিয়তম বন্ধুর স্থায় প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিতেছে। যে নিতান্ত দরিদ্র, সে-ও গৃহাগত আত্মীয় বন্ধুকে “মিষ্টিমুখ না করিয়া” বাইতে দিতেছে না; একখানি ছোট রেকাবীতে একটি লাড়ু বা একখানা জিলিপী ও এক গ্রাস জল দিয়াও তাহার অভ্যর্থনা করিতেছে। বর্ষারসী বৃদ্ধাগণ প্রণতা যুবতীগণকে আশীর্বাদ করিতেছেন, “জন্মএরোজী হও, পাকাচুলে সিঁদূর পর, হাতের নোয়া অক্ষর হোক;”—আশীর্বাদ-ভাজন পল্লীবৃকগণকে বলিতেছেন, “সোণার দোরাতে কলর হোক, শ্রমপুত্রে লক্ষ্মণের হও; আমার মাথার যত চুল, তত বছর পরমায়ু হোক!”

বিজয়াদশমীর রাত্রে কল আনন্দ-ভবন।

কিন্তু এমন আনন্দের দিনেও কি মুখ সর্ব্বব্যাপী হইতে পারিয়াছে? বাহারা সংবৎসরের মধ্যে সংসারের অবলম্বন প্রিয়তম স্বজনকে হারাইয়াছে, আজিকার এই হর্ষোৎসবে তাহাদের শোকাবেগ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছে। এই উৎসববরী রাত্রে শরৎচন্দ্রের নিম্নোজ্জল আলোক তাহাদের হৃদয়ের সুগভীর বিষাদাকার দূর করিতে পারিতেছে না!

পূজাবাড়ীতে বাতাসধনি ধামিরা গিয়াছে। এই কয় দিন যে বেদীর উপর দুর্গাপ্রতিমা অলৌকিক গৌরবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন—আজ চতীরপে সেই বেদী শূন্য পড়িয়া আছে; নিকটে একটি ক্ষুদ্র বৃন্দাবন জলিতেছে, তাহাতে গৃহের অন্ধকার দূর হইতেছে না! কেন আনন্দবরী কতাকে দীর্ঘকালের জন্য বিদায়দানের পর শিহ্নগৃহের সুগভীর নিরানন্দভাব ও ব্যতুলকায়ের সুতীর বিরহবেদনা উৎসবনিবৃত্ত কর্ত্তাপ্রান্ত অবসাদ-কিম্বদন্তের সেই রান দীপালোকে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে

କୋଜାଗର-ଲକ୍ଷ୍ମୀପୂଜା ।

কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা



বিজয়ার প্রেমালিঙ্গন ও আনন্দোচ্ছ্বাসের প্রভাব অকুণ্ঠ থাকিতে থাকিতেই কোজাগর-লক্ষ্মীপূজার সময় উপস্থিত হয়। পল্লীগ্রামে সর্বশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যেই লক্ষ্মীপূজা অত্যন্ত সাধারণ ও অপরিহার্য উৎসব।

দুই প্রকার পদ্ধতিতে লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে। যাহারা ধনবান, তাঁহাদের কেহ কেহ মুগ্ধায়ী প্রতিমার পূজা করেন। প্রতিমার পদতলে ধানের 'আড়ি' 'কড়ি' কোটা প্রভৃতি স্থাপিত হয়। গৃহস্থবাড়ীতে ধানের আড়ি দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া লক্ষ্মীরূপে তাহারই পূজা করা হয়। অন্নদান ও অন্যান্যসদাধ্য বলিয়া এই দ্বিতীয় পদ্ধতির পূজাই সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে।

'শনি'ধান বা 'ধয়েন'ধানই এই পূজার অবশ্য ব্যবহার্য উপকরণ। একাদশীর দিন হইতেই বাড়ীর মেয়েরা ধানগুলি ঝাড়িয়া বাহিতে আনন্ত করে; বাহাতে পূজার ধানের মধ্যে একটিও কাল ধান না থাকে, সে বিষয়ে রমণীগণ বিশেষ লক্ষ্য রাখেন।

লক্ষ্মীপূজার দিন সকালবেলা পূজার উপকরণাদি বাহির করা হয়। লক্ষ্মীর আড়ি, কড়ি, শঙ্খ, কোটা প্রভৃতি সরঞ্জাম দ্বারের 'সরদাল,' 'কুলুজি,' কি এই রকম কোনও উচু বারগায় সংবৎসরকাল সংরক্ষিত হয়; বাড়ীর হঠাৎ ছেলেরা হাত বাড়াইয়া সেগুলি হস্তগত করিতে না পারে, গৃহকর্ত্তীগণ সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। লক্ষ্মীপূজার

দিন সকালে গৃহিণী নান করিয়া আসিয়া সেগুলি সেখান হইতে নামাইয়া জলে ভাল করিয়া ধুইয়া রোদ্রে শুকাইতে দেন। যেহেতু বস্ত্রপরিবর্তন পূর্বক গুচ্ছাচারসম্পন্ন হইয়া লক্ষ্মীদেবীর বেজনিশ্চিত খুঁরাবিশিষ্ট অনতি-বৃহৎ আড়িটি আলিপনা-রঞ্জিত করেন। সাধারণতঃ জলচৌকী বা 'শিড়ি'র উপর লক্ষ্মীস্থাপন করা হয়। লক্ষ্মীর আসনস্বরূপ এই শিড়ি বা জলচৌকী সাধারণ গৃহকার্যে ব্যবহৃত হয় না; অতি সাবধানে তাহা পৃথক করিয়া রাখিতে হয়। পূজার দিন সেখানি ধুইয়া ও আলিপনা দ্বারা চিত্রিত করিয়া, ঘরের যে দেওয়ালের সম্মুখে 'লক্ষ্মী পাতা' হয়, গৃহিণীর কন্তা বা পুত্রবধূ, সেই দেওয়ালের অনেক দূর পর্য্যন্ত—ভূগা-ঠাকুরালীর চালচিত্রের অনুকরণে—আলিপনা দ্বারা চিত্রিত করেন। পল্লীগ্রামের গৃহস্থের যেহেতু চিত্রকলার জ্ঞানিগুণা নহেন; তথাপি যেটুকু চিত্রাঙ্কনে তাঁহারা অভ্যস্ত, তাহাই সেই মৃৎপ্রাচীরে পরিমুদিত হই উঠে। সেই বৈভব চিত্রের উপর দীর্ঘায়তন পতাকা উড়িতে থাকে। চতুর্দিকে লতা পাতা আঁকিয়া চিত্রকারিণী চিত্রাঙ্কনে সিংহাসন-সহ লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তি অঙ্কিত করেন, ঠাকুর-ঠাকুরালীর চারি পাশে বালিশ আঁকিয়া দেন; এমন কি, চিত্রের দুই দিকে লক্ষ্মীর বাহন পেচকের দুইটি ছবিও অঙ্কিত দেখা যায়! এই পেচকদ্বয়ের আকৃতি সর্বত্র ঠিক পেচকের মত দেখায় না; কারণ, একে ত চিত্রকারিণীর এ বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নাই; তাহার উপর যে উপকরণ দিয়া ও যে কুণি দ্বারা চিত্র অঙ্কিত হয়, তাহা চিত্রাঙ্কনের কিছুমাত্র উপযোগী নহে; তাই অসম্ভব দীর্ঘপুচ্ছবিশিষ্ট গোলাকার দেহের নীচে এক জোড়া অসম্ভব বকর বাকানো পা, চক্রাকার মূণ্ডর ঝল্ ঝল্ তটীর মত ঝোল ঝোল দুটো চোখ, ও মাথার উপর সম্ভাব্য ত্রিকূলের মত দুটি

বহু অপরাধ কাণ অত্যন্ত সুদর্শন হইয়া উঠে ! কিন্তু পেচকের এই চিত্র বতাই বিকৃত হউক না কেন, তাহা বঙ্গীয় গৃহলক্ষ্মীগণের অস্বীতিকর হয় না । দেওয়ালে অঙ্কিত আলিপনার এই চিত্র অনেকদিন পর্য্যন্ত না মুছিয়া সময়ে রক্ষা করা হয় ।

সমগ্র চিত্রটি শেষ হইলে, আলিপনাপূর্ণ পাত্রে ‘বাঁপি-টেপারীর’ কল ডুবাইয়া তদ্বারা চিত্রের চতুর্দিকে ছাপ দিয়া ছবিখানি খুব জাঁকাল করিয়া তোলা হয় ! বাঁহাদের গৃহ ইষ্টকনির্মিত ও দেওয়াল চূণকাম করা, তাঁহারা আলিপনার পরিবর্তে বাটিতে খয়ের গুলিয়া তদ্বারা ছোট একটি নেকড়ার তুলির সাহায্যে দেওয়াল চিত্রিত করেন ;—কিন্তু পরীগ্রামে অট্টালিকার সংখ্যা নিতান্ত অল্প ।

দেওয়ালে ও বেঝোতে আলিপনা দেওয়া হইলে ‘লক্ষী পাতা’ হয় । ‘এলনি’-চিত্রিত জলচোঁকী বা শিঁড়িখানা দেওয়াল-ঘেঁসিয়া রাখিয়া, তাহার উপর আড়ি বসায় ; তাহাতে সেই ‘নিফালী’ ধানগুলি চূড়াকারে চালিয়া সেই ধানে লক্ষীর ‘মুখো’খানি গুলিয়া দেওয়া হয় । লক্ষীর এই ‘মুখো’খানি সোলায় নির্মিত । ‘মুখোর’ উপর লাল রঙ্গ দিয়া চোখ মুখ জাঁকা, তাহাতে সোলায় নাকটী জাঁটা । মুখখানি খানের মধ্যে বসাইবার জন্য তাহাতে বাঁশের একটা ‘চটা’ থাকে । লক্ষীপূজার দিন সকালবেলা মালীঘোঁ বা মালীসের ঘেরে এক একটা মুখো ও কলাপাত-জড়ান গোটাকত শিউলী বা করবীর ফুল প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে দিয়া যায় । ইহার পরিবর্তে তাহার পরমা লয় না, কিংবা কেহ তাহার মূল্য দিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করে না ; কারণ, ইহার মূল্য না দেওয়ার ও না লওয়ার মধ্যে যে একটা আত্মীয়তার ভাব আছে, তাহা উভয় পক্ষেরই নিকট অতি মধুর বোধ হয় । পরীগ্রামে ধোপা,

নাপিত, পুরোহিত, এমন কি, দ্বখণ্ডালী ঘোষাণী পর্যন্ত যেন গৃহস্থের অন্তরঙ্গ আত্মীয়! বাহা হউক, মালীবৌ পরমা না লইলেও তাহাতে তাহার কোনও ক্ষতি হয় না। কারণ, প্রতিগৃহেই তাহার জন্ত চাল, মুড়ি, ‘জলপান’, লাড়ু প্রভৃতির বরাদ্দ আছে। লক্ষ্মীপূজার পরদিন সকালে মালীবৌ কথেন্ট পরিমাণে মালম্মীর প্রসাদ পায়।—লক্ষ্মীর মুখে স্থাপিত হইলে আড়িটি লাল কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়। মুখের উপর কাপড়খানি এমন ভাবে বিস্তৃত হয় যে, তাহা মা লক্ষ্মীর মুখে ঠিক অবগুষ্ঠনের মতই দেখায়; সেই অবগুষ্ঠন দেখিয়া মনে হয়, লক্ষ্মীদেবী যেন নিরঙ্গ কঙ্গে বুভুক্ষু ভক্তের গৃহে আসিয়া লজ্জার আর মুখ দেখাইতে পারিতেছেন না!

লক্ষ্মী অবগুষ্ঠনে মণ্ডিত হইলে তাঁহার চারি দিকে নানা আকারের লাল কোটা, ছোট মাঝারি বড় নানা বর্ণের কড়ি, দুই তিনটি ছোট ছোট শঙ্খ, ছোট ছোট কাঠের ‘কাঁকুই’ ও আধ পরমা দামের টিনমোড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরনা প্রভৃতি সাজাইয়া দেওয়া হয়। আর কিছু দেওয়া না হোক, অন্ততঃ গোটাকত বড় কড়ি, দুই একটা শঙ্খ, আর কয়েকটি কোটা লক্ষ্মীর সম্মুখে স্থাপন করিতেই হয়; ইহার কোনও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না।—এই কোটা প্রভৃতির সম্মুখে একটি শিল্পনির্মিত সিন্দুরচন্দনচর্চিত জলপূর্ণ ঘট সংস্থাপিত করিয়া তাহার মুখে আব্রণাধা ন্যস্ত করা হয়।

লক্ষ্মী ‘পাতা’ হইলে গৃহিণী সেখানে অবনতমস্তকে প্রণাম করিয়া, মৈবেদ্য সাজাইতে বসেন; ওদিকে বাড়ীর ঘেরেরা সকল ঘরে আলিপনা দিয়া বায়ান্না, চৌকাঠ, গৃহপ্রাঙ্গণ—সবস্ত বাড়ীখানিই কমলবন, পদ্মকুল, চন্দ্রবাক্ষদম্পতি ও লতাপাতা প্রভৃতির চিত্রে আচ্ছন্ন করে,

এবং লক্ষ্মীর জোড়া জোড়া পা আঁকিয়া সকল ঘরে ও উঠানে কমলার
গুতাগমনের নিদর্শন প্রদর্শন করে।

সূর্য্য অস্ত গেল। ধূসর সন্ধ্যার ছায়া গ্রামখানি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।
যেঠো পথ দিয়া রাখালবালকেরা গরু চরাইয়া আজ সকাল সকাল বাড়ী
করিয়া আসিয়াছে। পক্ষিকুল কলকাকলিসুখরিত গগনপথে কুলায়-অভিসুখ
প্রত্যাগমন করিতেছে, বিবচিত্র ক্রমে অম্পষ্ট হইয়া আসিতেছে; এবং
গৃহের গৃহে, বাজারের দোকানে, নদীতীরসংলগ্ন নৌকার, আশ্রয়স্থান-
প্রাপ্তবন্দী বংশছায়া-সমাচ্ছন্ন কুবককুটীরে এক একটি করিয়া কত যুৎ-
প্রদীপ ধীরে ধীরে জলিয়া উঠিতেছে।

দেখিতে দেখিতে শরতের পূর্ণ শশধর জ্যোতিরঙ্গ অরুণ রক্তচক্রে
স্তায় পূর্ণাকাশে সমুদিত হইল; যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মোহিনী
শক্তিতে রৌদ্ররাস্তা কর্মপ্রান্তে স্তব্ধ প্রকৃতি হাসিয়া উঠিল! শ্বেতশূন্য নির্মল
নীল আকাশ, শুধু দুই একটি নক্ষত্রবধূর লজ্জাকাতর নির্নিবেদ দৃষ্টি
অপরিফুট তল কোরুদীরশি অতিক্রম করিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পড়িল।
বালকবালিকাগণ প্রাক্ণে, বারান্দায়, ছাদের উপর চত্ৰালোকে দাঁড়াইয়া
শ্বেতবর্ণ অরুণ শঙ্খ দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া গাল ফুলাইয়া সজোরে
কুংকার দিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিল। শঙ্খধ্বমিতে সমগ্র গ্রাম
সুখরিত হইয়া উঠিল। কোন কোন বাড়ীতে কাশর ঘণ্টার শব্দ
উঠিত হইতে লাগিল। সন্ধ্যার পর প্রত্যেক গৃহ উৎসবময়, সমস্ত গ্রাম
হাস্যকল্লবে পরিপূর্ণ।

লক্ষ্মীকুরাণীর পাশে দীপাধারে প্রদীপ জলিতেছে। ধূপের স্তম্ভে
বায়ুস্তর সুরজিত। পিতলের রেণুবীতে ভিজে আতপ চাউলের চূড়াকার
নৈবেদ্য তাহার উপর সন্দেশ, মোড়া বা বাতাসা। পূজার জন্য

সাজিতে স্থলপদ্ম, রজনীগন্ধা, বক, শেফালিকা প্রভৃতি ফুল। কাঠের বারকোসে সুগের ডাল, ছোলা, পাটনাই মটর, বরবটী ভিজ্জে, হাঁড়িতে দই, কড়ায় ছুখ, বাটিতে ক্ষীর, ধামা-বোঝাই খই, মুড়ি, মুড়কি। লক্ষ্মী-পূজা শেষ হইলেই গরীব দুখী, রাখাল কৃষাণ, খেদা-নোকার মাঝি, মালাঙ্কর, বাকুই, নাপিত, প্রভৃতি অনেক 'প্রত্যাশী লোক' লক্ষ্মীপূজার 'ভূজো' ও 'নাড়ু' লইতে আসিবে।—তাহাদের বিতরণের জন্যই মুড়ি, মুড়কি, খৈ অধিকপরিমাণে যোগাড় করা হইয়াছে।

পূজার সকল আয়োজন হইয়াছে, কেবল এখনও নাড়ু তৈয়ারী হয় নাই। নারিকেলের ছাঁই লক্ষ্মীপূজার একটি প্রধান উপকরণ। নারিকেল ভাজা হইলে তাহার জল একটা পাথরের বাটিতে লইয়া লক্ষ্মীঠাকুরাণীর কাছে রাখিয়া আসিয়া বড়বো ও মেজবো দুই জা দুইখানি কুরুণী লইয়া নারিকেল কুরিতে লাগিলেন। গিন্নী বেশ ছাঁই তৈয়ারী করিতে পারেন; তিনি উননে কড়া চাপাইয়া ছাঁই করিতে লাগিলেন। ছাঁই তৈয়ারী হইলে গিন্নী মেয়েদের কাপড় ছাড়িয়া কাচা কাপড় পরিয়া ও হাত ধুইয়া নাড়ু পাকাইতে বলিলেন; তাহারা ছুটচিতে উহার আদেশে মনঃসংযোগ করিল। ঠাণ্ডা গিন্নীর মনে পড়িল, আসনানুরী ও মধুপর্কের বাটি আনান হয় নাই!—পুরুত-ঠাকুর আসিয়া সেগুলি না পাইলে এখনই হাঙ্গামা বাধাইবেন, হয় ত রাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, এবং সকল বাড়ীর পূজা সারিয়া অসময়েই হয় ত পূজা করিতে আসিবেন। লক্ষ্মীপূজা অসময়ে? বাপ রে! গৃহস্থ না ছারেখারে বাটবে! গিন্নী ব্যস্ত হইয়া, তখনই পুরুতবাড়ী লোক পাঠাইলেন। একটি পরস পাইয়া পুরুতঠাকুরাণী বায় শুলিয়া সন্তুষ্টচিত্তে একখানি রোশ্যানির্দিত আসন, একটি ক্ষুদ্র রোশ্য-অনুরী ও

বধূপকের একটি পিন্ডলনির্মিত বাটি বাহির করিয়া দিলেন। তিনি জানেন তাঁহার ঘরের জিনিস ঘরেই কিরিয়া আসিবে, পরমাটি তাঁহার উপরিলাত ! পূজা উপলক্ষে শূদ্র বজমানের বাড়ী উপবীত বিক্রয় করিয়াও পুরোহিতপত্নীর এই প্রকার উপরিলাত হইয়া থাকে।

এ দিকে পুরুতঠাকুর গারে নামাবলী জড়াইয়া টকিতে ফুল গুঁজিয়া বজমানবাড়ী উপস্থিত হইলেন। অত্যন্ত বড় বড় পর্কদিনের মত আজও তাঁহার কিছুমাত্র অবসর নাই; তিনি ধূলিধূসরিত পদদ্বয় বর্ষদ্রব্যবদ্ধত বক্রশীর্ষ করিতপ্রায় চাট হইতে বাহির করিয়া এক খাট জলে তাড়াতাড়ি তাহা প্রক্ষালন করিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে পূজায় বসিলেন। ছেলেরা জোরে জোরে শঙ্খ বাজাইতে লাগিল; যেহেতু পুরুতঠাকুরের একটু তকাত্তে চৌকাঠ ঘেঁসিয়া বসিয়া ঔৎসুক্যের সহিত পূজা দেখিতে লাগিল; কেহ বা পুরোহিতের অত্যন্ত সরিকটবস্ত্রী ধুতিব আঙুলে ধুনো-নিষ্কেপের অধিকার পাইয়া আপনাকে পরম ভাগ্যবতী বিবেচনা করিল।

পূজা শেষ হইলে পুরোহিত অগ্নি বাড়ী চলিলেন। গিন্নীরা সকলকে ঘরের বাহিরে আনিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, এই সময় লক্ষ্মীঠাকুরাণী দ্বার আড়ির উপর আবিভূতা হইয়া প্রদরচিত্তে ভোগ গ্রহণ করেন।

দণ্ডখানেক পরে গিন্নী গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া ছেলেরদের মধ্যে প্রণাম বাটিতে বসিলেন। কলাপাতে একটু সন্দেহ, চাট ভিজে ভাল, হুঁখান। শণা, খানহই নারিকেল, একটু ছানা দ্রব পাইবারাত্র ছেলে যেহেতু জ্যোৎস্নালোকিত রোগকে বসিয়া পরমানন্দে তাহার সহ্যবহার করিতে লাগিল। সেই ফুল জ্যোৎস্নালোকে আলিঙ্গিত

রোগাকের উপর বসিয়া প্রসাদ খাইতে খাইতে বালকবালিকাগণ হাতকলরুব গৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল।

ছেলেদের জলখাবার দিয়া গৃহিলীগণ পুস্তোহিত-বাড়ীতে সিধা ও জলপান পাঠাইলেন। আত্মীয় কুটুম্বদের বাড়ীতেও জলপান প্রেরিত হইল।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইয়া আসিল; তখনও উৎসবের বিস্তার নাই। তখনও গৃহস্থদের আশোদপ্রিয় ছেলেরা সুখোদ পরিয়া বা কৃত্রিম দাড়ী নৌক লাগাইয়া ভিখারী সাজিয়া আত্মীয় প্রতিবেশীদের বাড়ী জলপান তিকা করিতেছে; দুই এক স্থলে তাহাদের ছদ্মবেশ ধরা না পড়িলেও অধিকাংশ স্থলেই তাহারা ধরা পড়িতেছে, আর গৃহিলী কর্তৃক পরস-সবাদরে আহৃত হইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতেছে; গৃহিলী কাছে বসিয়া “এটা খাও, ওটা খাও” বলিয়া তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিতেছেন। কোল কোল বাড়ীর মেয়েরা পর্যন্ত ভিখারিনী সাজিয়া নিকটস্থ কোন আত্মীয়ের বাড়ী উপস্থিত হইতেছে, বলিতেছে, “মা, চাট্টি তিকা পাই; নব্বীপূজার দিন চাট্টি ভুজো না দিয়ে অমনি ফিরিও না বাছা!” কেহ বলিতেছে, “কে রে বাসী! রাতে তিকে নিতে এসেছিল? কাল সকাল বেলা আসিস।” কিন্তু গৃহিলীর কড়া বা পুত্রপুত্রী সেই পরিচিত কর্তব্যর চিনিতে পারিয়া আহ্বানে গগগদ হইয়া সুকোলা বাহপাশে সেই ছদ্মবেশিনী ভিখারিনীর কর্তব্যবর্জন পূর্বক সম্মুখে বলিতেছে,—“সই আমার কত হলই কামেন! ও গলার আওরাজ চিন্তে পারিনে না কি?”—অমনই চারি দিক হইতে মধুর হাতকলরোল উথিত হইতেছে। শুভকৃত্যকর্য্যপূর্ণকিত আবল-কলোদযুগ্মকিত কোজাগরপূর্ণিমার রাত্রে যুবতীগণের সেই সরল দিক

কৌতুকহাস্তে চারি দিকের মাধুর্য্য আরও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে ; আকাশের কোন্ দূরদূরান্তর হইতে পূর্ণচন্দ্র সেই সন্ধ্যোচরীন সরল হাস্তোচ্ছ্বাস দেখিয়া অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিতেছে, এবং কোমুনৌচ্ছটার যেন সেই কৌতুক পরিকুট হইতেছে ! আজ যেন সিন্ধুশোভা-বিভাসিত শারদলক্ষ্মীর কলহাস্তকল্লোলিত পুষ্পগন্ধবিলসিত বিবল বাসর-রাত্রি ! আকাশে চক্রেয় হাসি, উপবনে প্রত্যেক পল্লবের অন্তরালে সুবাসপূর্ণ কুসুমের হাসি, গৃহপ্রাঙ্গণে বালিকা ও যুবতীগণের প্রসন্ন হাসি,—নিখিলের সকল হাসি মিলিয়া এক কোমল হাস্ততরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছে। গৃহপ্রান্তবর্তী আলিপনার অঙ্কিত শুভ পুষ্প, লতা, পক্ষী, ও লক্ষ্মীর যুগলচরণ পর্য্যন্ত যেন সজীব হইয়া সেই সমুদ্র হাস্তে যোগদান করিয়াছে !

আজ রাত্রে ‘লক্ষ্মী’ অর্থাৎ ভাত খাইতে নাই ; স্তত্রাং প্রত্যেক বাড়ীতে কেহ লুচি কেহ রুটি খাইতেছে, কেহ সরারোহ সহকারে খৈ-দৈয়ের ফলার করিতেছে। ফলারের পর ছেলের দল হইতে যুবক বৃদ্ধ পর্য্যন্ত অনেকেই রাত্রি জাগরণের জন্ত তাম পাশা দাবা লঠিয়া খেলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এমন আনন্দপূর্ণ উৎসবরাত্রি ঘুমাইয়া কাটাইতে কাহার ইচ্ছা হয় ? আজ কোজাগর, ঘুমাইতেও নাই। পুরোহিত মহাশয় বলেন, এ রাত্রি নারিকেলজল পান করিয়া অক্ষতীভার অতিবাহিত করিলে লক্ষ্মীঠাকুরাণীর প্রসন্নতা লাভ করা যায়।

রাত্রি দশটার পর বাজারের বারোয়ারীতলার পাঁচালী-গান আরম্ভ হইল। পাঁচালী শুনিতে অনেকেই বারোয়ারীতলার শামিয়ানার নীচে আসিয়া বসিল ; কিন্তু পাঁচালীর কাছে তত বেশী প্রোত্তাপ আমলকী নাই ; কারণ, এবার পাড়ার পাড়ার বেহুলার গানের ভারি ধুম লাগিয়া

গিরাছে। বহুকাল পূর্বে আমাদের পল্লীঅঞ্চলে ‘বেহলার পালা’ গীত হইত; কিন্তু অনেক দিন চাবার দল হইতে এই গান একেবারে অন্তর্ধান করিয়াছিল; এমন কি, চাবার ছেলেরা টান সঙ্গার, পদ্মাবতী, নখিন্দ্র, বা বেহলার নাম পর্য্যন্ত জানিত না। কিন্তু অল্প দিন হইতে রাখাল কুবাণেরা আবার বেহলার পালা গায়িতে আরম্ভ করিয়াছে। আজ রাত্রে অধিকাংশ সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীর সম্মুখে তাঁহাদের অনুগত রাখাল, কুবাণ, ঘরাবী ও বজুরেরা এক একখান নীলের চাদর অথবা পাল টাঙ্গাইয়া, কবল ও বোটা বাহুর বিছাইয়া তাহার উপর বসিয়া বেহলার পালা গায়িতে শুরু করিয়াছে।

দুই তিনটা ডাবা হাঁকা, কয়েক ছিলিম তামাক ও কয়েকটি কেরোসিনের টিমি জ্বালাইয়া দিয়াই গৃহস্থ নিষ্কৃতি পাইলেন। বাহুরের উপর বসিয়া একজন লোক ঢোলক পিটিতে আরম্ভ করিল; সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরা চলিল। তিন চারিটি অল্পবয়স্ক চাবার ছেলে পায়ে নুগুণ আঁটিয়া, গারে পিঠলের বিকর্ণ গহনা পরিয়া নর্তকীবেশে আসরের মধ্যে আসিয়া নাচিতে লাগিল। তাহারা কখনও ঐরাবজ করিয়া ও কটিবেশে হাত রাখিয়া, কখনও রুদ্ধ পরচুলার উপর স্থাপিত সোনার কুল স্পর্শ করিয়া, কখনও দুই হাতে মানা ভঙ্গিতে অকল হুলাইয়া, একবার ধীরে একবার চকলপদক্ষেপে ঘুরিয়া কিরিয়া নাচিতেছে; হয় ত বা স্নীলতাবর্জিত একটা বহু পুরাতন খেঁষটার গান শরিয়াকে। গান আরম্ভ হইয়াছে শুনিয়া পাড়ার নেয়েরা ভাকাতাড়ি বাগান্দার প্রলম্বিত চিকের আড়ালে আসিয়া বসিয়া কোকুহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের সম্মুখা নিরীক্ষণ করিতে করিতে শেবে তাহাদের সঙ্গীতস্থাপানে কনো-নিবেশ করিলেন। দেখিতে দেখিতে পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরা,

বুকেরা, এমন কি, বুকেরা পর্যন্ত মিত্রাভ্যাগ করিয়া আসরে জমাট বাঁধিয়া বসিয়া গেল।

নাচিতে নাচিতে ও গান গারিতে গারিতে নর্তকীবেশধারী বালকেরা দর্শকগণের সম্মুখে গিয়া হাত পাতিতে লাগিল; কেহ কেহ তাহাদের হস্তে এক একটি পরসা ফেরি দিল, রমণীগণও চিকের আড়াল হইতে তাহাদের কাছে পরসা ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। একবারে বহুগুলি পরসা সংগৃহীত হইল, তাহা আসরের মধ্যস্থলে দলপতির সম্মুখে সংরক্ষিত রেকাবীর উপর জমিতে লাগিল।

সঙ্গীত ও নৃত্য শেষ হইলে দুইটি সং আসিয়া আসরে প্রবেশ করিল। ধোপার সং! কাপড়ের বোকা ঘাড়ে লইয়া দুই জন ধোপা আসিল; এক জনের হাতে লাঠি, অস্ত্রের হাতে হাঁকা কলিকা, কলিকার তামাক সাঁজা;—লোকটা তাম্রকুটের রসান্বাদন করিয়া দর্শকবৃন্দের মুখের উপর একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া দিতেছে,—আর নানা রকম মুখভঙ্গি করিতেছে! সংএর এক গালে চুণ ও এক গালে কালী,—গালে চুণকালী লেপিবার উদ্দেশ্য কি, ঠিক বুঝা যায় না; বোধ করি, তাহারা যে প্রকৃত ধোপা নহে, সং মাত্র,—তাহাই বুঝাইবার জন্য এই প্রকার সজ্জা! বিস্তর রহস্যলাপের পর এক জন ধোপা তাহার সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার বদন এমন বিষম কেন?—সঙ্গী গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, তাহার স্বভাবরক্তা হঠাৎ ‘পটল তোলার’ সে ‘মাওড়া’ (মাতৃহীন) হইয়াছে, সুতরাং তাহার গলার দড়ি ধরিয়া চরাইয়া লইয়া বেড়াইবার রাখাল নাই! এই বৃণ রসিকতার পুরুষ ও রমণীগণের মধ্যে উচ্চ হাস্যধ্বনি উখিত হইল; কিন্তু তৎপ্রতি লক্ষ্যপাত না করিয়া উক্ত বিষয় রক্তকের বহু তাহাকে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের পরামর্শ দিল,

এক সে নিজে বিবাহের ঘটকালী করিতে প্রস্তুত হইল। বিবাহের ব্যয়-নির্বাহের জন্য পরমা চাই, কিন্তু ঘরে পরমা নাই ; তাই বিরহপীড়িত, বিপন্নীকরজক বন্ধুর পরামর্শে শ্রোতৃবর্গের নিকট ভিক্ষা চাহিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের করুণা-উল্লেখের জন্য হস্তরসের এক গান ধরিল।

সংগের গান শেষ হইলে, পালা আরম্ভ হইল। মহাদেবের মানস-কল্পা মনসা ওরফে পদ্মাবতী মুখে ধড়ি মাখিয়া, কপালে কালী মিন্না একটি চোখ অঁকিয়া, নাচে নোলক মিন্না ও একখানি নীলস্বরী সাড়ী পরিয়া কৈলাস পর্বতে পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। মহাদেব তখন ভাজ ধুতুরা সেবনের পর পার্কতীর সঙ্গে কিঞ্চিৎ রসমালাপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; পদ্মাবতীকে দেখিয়া রসভঙ্গ হইল। পার্কতী অপরিচিতা যুবতীর রূপধোবনদর্শনে ঈর্ষ্যানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন; স্বামীর প্রতি তাঁহার বড় বিশ্বাস ছিল না, তাই পদ্মাবতী করুণাবশে পিতৃচরণে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে পার্কতী আশ্রয়দানে সন্মত হইলেন না। মহাদেব তখন অগত্যা কল্পাকে বর্তলোকে গিয়া বাস করবার অমুখতি দান করিলেন; বলিলেন, “চাম্পাই নগরে চাঁদ সদাগর তোমার পূজা করিবে, তার পূজার পৃথিবীর লোক তোমাকে চিনিতে পারিবে।”

পদ্মাবতী কৈলাস পর্বত হইতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে চাম্পাই নগরে চাঁদ সদাগরের গৃহে উপস্থিত হইলেন, সদাগরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “সদাগর, তুমি ধনে পুজো লক্ষ্যবশ, তুমি আমার পূজা কর; তোমার ছয় ছেলে আছে,—বার ছেলে হইবে; তোমার ধন দৌলত অক্ষর হইবে।”—চাঁদ সদাগর জরুটীকুটিল চক্ষু বিস্মৃণিত করিয়া বলিল,—

“যে হাতে পুজোছি আমি দেব শূলপাশি,

সেই হাতে পূজা চাঁদ সদাগর কবী ?”

মনসা তথাপি মড়িলেন না, সদাগরকে প্রসন্ন করিবার জন্য নানাভাবে তোষামোদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তোষামোদে ও চাঁদ সদাগরের মন দরজ হইল না ; সে কালেও কেবল তোষামোদে পূজা আদায় করা একালের মতই কঠিন ছিল ! সুতরাং সদাগর গলা উচু করিয়া বলিল,—

“মনসা কানী, শয়তানী তুই এখনই চ’লে যা !

নৈলে পরে পড়বে শিরে এই হেঁতালের ঘা ।”

সঙ্গে সঙ্গে ‘হিস্তালে’র লাঠী উদ্ভূত হইল ।

মনসা দুই হাতে উর্দ্ধে তুলিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—

“কোথায় আছিস্ মর্দ রে ! তুই সাক্ষী হয়ে থাক,

শোধ দেব এ অপমানের, ভাঙ্গব চাঁদার জাঁক ।”

মনসা চলিয়া গেলেন !

সদাগরের ছয় পুত্র বিদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিল, বাণিজ্য শেষে বিস্তর ধনসম্ভার নৌকায় বোঝাই দিয়া দেশে ফিরিতেছিল ; হঠাৎ মনসার সারার ‘কুমরা’ নদীর মধ্যে ভরস্কর তুফান উঠিল । সদাগরপুত্রের ছয়খানি নৌকাই ডুবিয়া গেল ; সদাগরের ছয় পুত্রই সেই সঙ্গে ডুবিয়া মরিল !

ছয় পুত্রের মৃত্যুতে শোকাতুর ও ধনসম্পত্তিনাশে সর্বস্বান্ত সদাগর ইষ্টদেব মহাদেবের তপস্শ্রা আরম্ভ করিল । তাহার অতি উৎকট তপস্শ্রায় মহাদেবের আসন টলিল ; তিনি ভক্তের নিকট আসিয়া তাহাকে বর দিলেন,—“ভূমি এমন পুত্ররত্ন লাভ করিবে যে, সে তোমার সকল দুঃখ কষ্ট দূর করিবে ।”

মহাদেবের অব্যর্থ বরে, যথাসময় চাঁদ সদাগরের এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল । ছয় বাসে তাহার অন্নগ্রাসন হইল ; চাঁদ সদাগর পুত্রের নাম রাখিল,—নবিন্দর ।

নখিন্দরের অনুরোধে শ্রোতৃবর্গকে আর একবার চাঁদা দিতে হইল। কারণে অকারণে এমন করিয়া চাঁদা আদায়ের ফন্দী আমাদের প্রজাবৎসল সরকারও এখন পর্য্যন্ত শিথিয়া উঠিতে পারেন নাই!

ক্রমে নখিন্দর বয়ঃপ্রাপ্ত হইল। চারি দিক হইতে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল; কিন্তু সদাগরপত্নী পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত নন। ঘরে ছয়টি বিধবা বধু, তাহাদের মুখ দেখিয়া তাঁহার

“পরান্ন নায়ে দিবানিশি জলে রাবণের চিলু”,

স্মরণ্য নৃতন করিয়া আর পুত্রবধু ঘরে আনিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না।

কিন্তু নখিন্দরের বিবাহ না হইলে মনসার মহিমা প্রচার হয় না! মহাদেবের অনুরোধে বৃদ্ধ নারদঋষি ছদ্মবেশে ‘গাব্‌গুবাব্‌গুব্‌’ বাজাইতে বাজাইতে চাঁদ সদাগরের অট্টালিকার উপস্থিত হইলেন, এবং সদাগরকে আশ্বাস দিলেন, সতী কস্তার সঙ্গে নখিন্দরের বিবাহ দিলে সংসারের সকল সুখ উথলিয়া উঠিবে।—চাঁদ সদাগর জিজ্ঞাসা করিল,—

“কেনন করে জান্বো আমি সতী কস্তা কে?”

বৃদ্ধ নারদ ঋষি কুলির তিতর হইতে ছয়টি লোহার কলাই বাহির করিয়া সদাগরের হাতে দিলেন, বলিলেন,—

“এই ছয়টি লোহার কলাই সিদ্ধ করবে যে!”

চারিদিকে ঘটক ছুটল; কিন্তু উপযুক্ত কস্তার সন্ধান হইল না। হাঁটিয়া হাঁটিয়া ঘটকেরা হরগণ হইয়া গেল; চাঁদ সদাগরের ‘ধনুকভাঙ্গা পণে’ তাহাদের বিরক্তি ও ক্রোধ জন্মিল! তখন সদাগরপত্নী সদাগরকে বলিল, “কাকননগরে আমার এক বেরাইয়ের ঘর, সেখানে গিয়া কনের সন্ধান করে এস।”

চাঁদ সদাগর অঝোরোহণে কাঞ্চননগরে তাহার বৈবাহিক সবাহন সদাগরের গৃহে উপস্থিত হইল। চাঁদ সদাগরের অঝোরোহণ দেখিয়া খল্লোরঙ্গীগণের বিশ্বয়ের ইয়ত্তা রহিল না! সদাগরের অঝোরোহণদৃশ্যটি অতীব কোতূকাবহ! একজন লোক সদাগরের পশ্চাতে কুঁতো হইয়া দাঁড়াইয়া তাহার হুই পা চাপিয়া ধরিয়া কখন দ্রুতপদবিক্ষেপে, কখন বা ‘কদমে’ চলিয়াছে,—তাহার সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত; সদাগর একটা সোনার ঘোটকসুও বাহ হস্তে বকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া সবতালে অগ্রসর হইতেছে; ঢোলক বাজিতেছে, খঞ্জনীতে বা পড়িতেছে, আর অশ্বরূপী মনুষ্য তালে তালে পা ফেলিয়া চলিয়াছে, পায়ে রুণঝুণু নুপুরধ্বনি হইতেছে! দর্শকগণ রুদ্ধনিশ্বাসে বিস্ফারিতনেত্রে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতেছে।

চাঁদ সদাগর অশ্ব হইতে অবতরণ না করিয়াই বৈবাহিকের সহিত আলাপ করিতে লাগিল। বৈবাহিক বলিল, “বেয়াই, এতকাল পরে গরীবের ঘরে পায়ের ধূলা দিলে, ঘোড়া থেকে নাম, পা ধোও!” সঙ্গে সঙ্গে গিলিকে ডাক পড়িল। সবাহনপত্নী স্বামীসন্নিকটে উপস্থিত হইলে, সবাহন গান গায়িয়া বলিল,—

“বেয়াই এল ঘরে রে গ্রাণ! বসতে দাও পিঁড়ে,

জলপান করতে দাও সরু ধানের চিড়ে।”

কিন্তু বেয়াই বসার দূরের কথা, ঘোড়া হইতে নামিলও না, বলিল, “আগে এই পাঁচটি লোহার কলাই সিদ্ধ করে আন, তার পর তোমার ঘরে পা ধুইব।”

সবাহনপত্নী স্বামীর নিকট হইতে কলাই পাঁচটি লইয়া তাহা সিদ্ধ করিতে গেল, শুনিব ইহা সিদ্ধ করিতে লাগিলে,—

“বারো গাড়ী কাঠ বে, আর গো বারো বড়া জল।”

অবশ্য, বার গাড়ী কাঠ ও বার ঘড়া জল সংগ্রহ করা সদাগরের পক্ষে কঠিন হইল না। কাঠ ও জল সংগৃহীত হইলে সবাহনের স্ত্রী কলাই সিদ্ধ করিতে যাইবে, এমন সময়ে তাহার অবিবাহিতা কন্যা বেহলা স্নানরত বালিক, “না, আমি থাকিতে তুমি কেন কলাই সিদ্ধ করবে ? আমাকে দাও।”

শুক্রদেহে কলাই সিদ্ধ করিতে হইবে। বেহলা নদীতে ডুব দিতে গেল। ইতিমধ্যে মনসা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশে নদীতে নামিল। বেহলার বাহসস্তাড়ন-নিষ্কিপ্ত কয়েক বিন্দু জল মনসার গায়ে পড়িল। মনসা অভিশাপ দিল, “তুই যাহা মনন করিয়া জলে আসিয়াছিস, তাহা সিদ্ধ হইবে; কিন্তু তুই বাসরঘরে বিধবা হইবি, সর্পাঘাতে বাসরেই তোমার স্বামী মৃত্যু হইবে।”

বেহলা সে কথাই কাণ না দিয়া মন করিয়া বাড়ী আসিল।

বাড়ী আসিয়া সে বার গাড়ী কাঠ পোড়াইয়া বার ঘড়া জলে সেই লোহার কলাই সিদ্ধ করিল। সবাহন সদাগর বৈবাহিকের হস্তে সিদ্ধ কলাই গুলি প্রদান করিয়া বলিল, “বেয়াই, যাহা চাহিয়াছিলে, তাহা পাইলে ত ? এখন পা ধোও।”

চাঁদ সদাগর ঘোড়ার বসিয়া বলিল, “আমার আর একটা ভিক্ষা আছে, যদি তাহা দাও, তবে তোমার বাড়ীতে পা ধুই।”

সবাহন বলিল, “তুমি চাঁদ সদাগর, পৃথিবীতে ত তোমার কোনও অভাব নাই, তবু আমার কাছে ভিক্ষা ! না জানি সে কি ধন ! বল তুমি কি চাও, আমার সাধ্য হইলে তুমি তাহা পাইবে।”

চাঁদ সদাগর বলিল, “তোমার যে মেরেটি এই কলাই সিদ্ধ করিয়াছে, তাহাকে পুত্রবধু করিতে চাই। আমার সোণারচাঁদ নখিন্দরের সঙ্গে তাহার বিবাহ দাও।”

সবাহন জীর সহিত পরামর্শ করিতে গেল। জী মুখ বাঁকা করিয়া বলিল, “বেয়াইয়ের ঘরে আমার এক মেয়ে বিধবা হইয়া আছে, সেই শোকেই আমি ‘ভাজা ভাজা’ হচ্ছি, আবার সেই ঘরে কাজ। ও কথা তুমি আর মুখেও এনো না।”

সবাহন বলিল, “তা বটে, কিন্তু বেয়াই বে ছাড়ে না! আমার বাড়ী পা পর্য্যন্ত ধোর নি।”

সদাগরপত্নী বলিল, “বেয়াইকে কোণলে নিরাশ কর। শুনেছি, বেয়াই এখন সর্ব্বস্বান্ত, তার কাছে মেয়ের সমান ওজনের পাকা সোনার দাবী কর—যদি তা দিতে পারে, তখন সম্মতি দিও।”

টাদ সদাগর এই প্রস্তাব শুনিয়া বড়ই দমিয়া গেল। মেয়ের সমান ওজনের সোনা এখন সে কোথায় পাইবে? সুতরাং সে হতাশ হইয়া, যে মুখে আসিয়াছিল—সেই মুখেই ফিরিয়া চলিল।

পথে বেহুলা খেলা করিতেছিল। টাদ সদাগরকে শুকমুখে ফিরিতে দেখিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, “তাউই মশায় যে এখনই ফিরে যাচ্ছেন?” টাদ সদাগর বলিল, “হা, তোমাকে আমার বেটার বৌ করতে চাই, তা তোমার মা বাপ আমার কাছে পণ চায় তোমার সমান ওজনের কাঁচা সোনা! আমার কি আর মা, সে দিন আছে? গরীবের ঘরে তোমার মা বাপ তোমাকে দেবেন না।”

বেহুলা বলিল, “তাউই মশায়! আপনি ফিরে চলুন, আমার মা বাপ বা চান, তাতেই রাজী হ’ন; আমি আপনার গলার ঐ হারের চেয়ে ভারি হ’ব না।”

টাদ সদাগর আশ্চর্য চিত্তে বৈবাহিকগৃহে প্রত্যাগমন করিল। ষোড়ার উপর বসিয়াই বলিল, “আমি তোমার দাবীতেই রাজী। আমার গলার এই হার

দিলার, তোমার ঘেরেকে ওজন কর; যদি আরও বেশী সোনা লাগে তখন দিব।”

বেহলাকে ওজন করা হইল, কিন্তু তাহার ভার সোনার হারের ভার অপেক্ষা কম হইল। ইহা দেখিয়া বেহলার মা দুঃখ করিয়া বলিল,—

“হাতের পাতের খাইয়ে বেউলো !

‘মামুষ’ ক’রলাম ঘেরে,

একগাছ হারের ভার হলিনে,

তোমার মাথা খেয়ে !”

বেহলা মায়ের কথা শুনিয়া গানের সুরে বলিল,—

“আগে যদি জান্তাম মা গো ! টাকা নিবা তুমি,

হারের অধিক ভার হইয়ে থাকিতাম আমি।”

যাহা হউক নখিন্দরের সহিত বেহলার বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল।

বেহলার উপর মনসার বড় রাগ হইয়াছিল, তাই সে সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিল; এবং রূপসী বোড়শীর বেশে নখিন্দরের নিকট উপস্থিত হইয়া বেহলার রূপের অনেক নিন্দা করিল, বলিল,—

“চোক-পুটপুটে পেট-ডাগ্‌রা কালো-কুৎসিত ঘেরে

তাকেই বিয়ে করতে চাস্‌ তুই, চোখের মাথা খেয়ে !”

শেষে বলিল,—

“আমার বিয়ে কর রে নখা ! আমার বিয়ে কর,

আমি যেমন বুঝ কত্যা—তেমনই তুই বর।”

নখিন্দর অজ্ঞাতরূপসীলা বুঝতীকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল না, কিন্তু বেহলা কুসুমা শুনিয়া তাহার মন কিছু দমিয়া গেল। বেহলাকে

একবার দেখিয়া চকু কর্ণের বিবাদ মিটাইতে তাহার আগ্রহ হইল ; কিন্তু সে বড় ঘরের মেয়ে, কিরূপে তাহার দেখা পায় ? অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া নখিন্দর সবাহন সদাগরের বাসস্থান কাঞ্চননগরে এক হাট বসাইল, এবং সেই হাটে যাতায়াত করিতে লাগিল ; তথাপি বেহলাকে দর্শন করা তাহার অদৃষ্টে ঘটিল না !

অবশেষে নিরুপায় হইয়া নখিন্দর কাঞ্চনী হেড়েনীর শরণ লইল। সেই নগরে কাঞ্চনীর ঘর। সে সুন্দরী, চঞ্চলা, রসিকা। কাঞ্চনী দুই বেলা নখিন্দরের হাট পরিষ্কার করিত। হাট ঝাঁটাইতে ঝাঁটাইতে সে যে নখিন্দরের অপরিতৃপ্ত যৌবনের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া দুই একটি বজ্রোক্তি বর্ষণ না করিত, এমন নহে। বেহলাকে কোন ছলে ডাকিয়া আনিবার জন্য নখিন্দর কাঞ্চনীকে অনুরোধ করিল। কাঞ্চনী বলিল,—

“বেহলা হ’ল বড়-ঘরনা, আমি হাড়ির ঝি,

ডেকে তাকে হাটের মাঝে আনতে পারি কি ?”

কিন্তু নখিন্দর তাহাকে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা উৎকোচ প্রদান করিতেই ‘হাড়ির ঝি’র আর সঙ্কোচ রহিল না ! বেহলাকে প্রলুব্ধ করিবার অভিপ্রায়ে নখিন্দর কাঞ্চনীর হাতে একটি সোনার পুতুল প্রদান করিল।

কাঞ্চনী বেহলার কাছে গিয়া তাহাকে সেই পুতুল দেখাইল। বেহলা পুতুলটি লইবার জন্য আব্দার করিলে হেড়েনী নাচিতে নাচিতে বলিল,—

“হাটে যদি যাও, বেউলো ! হাটে যদি যাও,

পাঁচ কাহন এমন পুতুল পথে পড়ে পাও।”

বেহলা হাটে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া বায়ের অনুমতি চাহিতে গেল ;
যা নাচিতে নাচিতে দুই হাত নাড়িয়া বলিল, —

“ও হাটে যেও না বেউলো, বেউলো আমার মা !

চাঁদের বেটা দুঃখন নখা দেখলে ছাড়বে না ।”

বেহুলা এ নিবেধ মানিল না, লুকাইয়া কাঞ্চনীর সঙ্গে হাটে চড়িল ; নখিন্দর দেখিল, বেহুলা রাজকন্তার মত দিব্য রূপসী মেয়ে ; বিবাহে তাহার আর কোন আপত্তি হইল না ।

বিবাহ হইয়া গেল । মনসা বেহুলাকে যে অভিসম্পাত করিয়াছিল, তাহা সকলের মনে ছিল । বেহুলার পিতামাতা নখিন্দরকে সর্পের দংশন হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিশ্বকর্মা দ্বারা সাতালী পর্বতে একটি লৌহময় “নিখিল” বাসরঘর নির্মাণ করাইলেন ; কিন্তু বিশ্বকর্মা মনসার প্ররোচনায় সেই গৃহের এক কোণে একটি হুম্ব ছিদ্র রাখিয়া দিলেন !

নবদম্পতি বাসরঘরে শয়ন করিল । গৃহে রত্নদীপ জ্বলিতে লাগিল । সোনার পালকে প্রস্ফুটিত কুমুদমসজ্জিত শয্যার নবদম্পতি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত । কালনাগিনী মনসার আদেশে সেই হুম্ব ছিদ্রপথে সেই কন্ধে প্রবেশ করিল ; কিন্তু নখিন্দরকে দেখিয়া সে ফণা নত করিয়া রহিল, বলিল, “এমন রূপবান পুরুষ, বিনা-দোষে ইহাকে দংশন করিতে পারিব না ।” মনসা বলিল, “যদি নখা তোমাকে মারে, তবে তাহাকে দংশন করিবে ত ?”— কালনাগিনী সম্মত হইল ।

মনসা তখন মশা হইয়া নখিন্দরের হাতের উপর বসিল । নখিন্দর ঘুমের ঘোরে হাত ঝাড়িল, কালনাগিনীর গায়ের উপর তাহার হাত পড়িল ! কালনাগিনী বলিল, “ধর্ম সাক্ষী থাক, আমাকে মারিল ।” আবার নখিন্দরের হাতে মশা বসিল ; এবারও নখিন্দর হাত ঝাড়িল । কালনাগিনীর গায়ে হাত পড়িবামাত্র সে নখিন্দরকে দংশন করিয়া, দেহ হৃদবৎ হুম্ব করিয়া ছিদ্রপথে বাসর-ঘর হইতে গ্রহণ করিল ।

দংশনজ্বালায় নখিন্দর ছটফট করিতে লাগিল। তীব্র বিষ তাহার সর্বদা জর্জরিত হইল; সর্পিহত যুবক শয্যার ঢলিবা পড়িল, তাহার সোনার বর্ণ কালী হইয়া গেল। বেহুলা নখিন্দরের পাথের কাছে পড়িয়া ‘আছাড়ি পাছাড়ি’ কাদিতে লাগিল।

সেই সময়ে কাঞ্চননগরে গোড়া বিনোদ রোজার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। তাহার ঝাড়া, কুকা, জলপড়া অব্যর্থ! বিনোদ রোজার কাছে লোক ছুটিল; বেহুলার আর্তনাদ দূর হইতে খোঁড়া রোজার কর্ণে প্রবেশ করিল; মাতালী পর্কতে আসিতে আসিতে পথে সে মাথা নাড়িয়া সুর করিয়া গান ধরিল,—

“আর কেঁদ না, আর কেঁদ না, বেহুলা সুন্দরী!

আমি খোঁড়া বিনোদ রোজা আসছি তোমার বাড়ী।”

মনসা প্রমদ গণিল! বিনোদ রোজা যদি ‘ঝাড়িতে’ আরম্ভ করে, তাহা হইলে কালনাগিনীর বিষ নামিয়া বাইবে, নখিন্দর ঝাটিয়া উঠিবে, তাহার অভিমুখ্যতা ব্যর্থ হইবে। সে বিনোদ রোজাকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিল, বিনোদ রোজা নখিন্দরকে বিপরীত বস্তু দ্বারা ঝাড়িতে লাগিল; স্তব্রাং কোনও ফল হইল না, রাত্রিশেষে নখিন্দর প্রাণত্যাগ করিল।

সর্পদষ্ট মৃতদেহের দাহ হইল না, তাহা ‘নাড়ে’ তুলিয়া কুলের মালা দিয়া শাজাইয়া নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হইল। বেহুলা সেই নাড়ুর উপর স্থায়ী মদতলে বসিয়া—মৃত স্থায়ীর চরণ দু’খানি কোলে তুলিয়া লইয়া অকূলে ভাসিয়া চলিল।

কিন্তু এই শোচনীয় দৃষ্টের মধ্যেও সঙ্গীতের বিরাম নাই! ক্রমাগত ক্রততালে ঢোলক বাজিতেছে, খঞ্জনির ধবধব উঠিতেছে, অপরিহৃত লণ্ঠনের মধ্যে কেরোসিনের টিমিগুলি জলিয়া জলিয়া সমস্ত লণ্ঠন কালীতে

ঢাকিয়া কেলিয়াছে, লঠনের ভিতর সবুজপক্ষ লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র পতঙ্গের
মৃতদেহ! তখনও ছোট ছোট মেয়েরা চিকের অন্তরালে মায়ের কোলের
কাছে বসিয়া ঢুলিতেছে, তখনও মধ্যে মধ্যে সং আসিয়া অশ্রুস্রব
করুণ দৃষ্টের উপর রুচিবিগহিত হাস্যরসের অবতারণা করিতেছে; তখনও
চিকের অন্তরাল হইতে সতরঞ্জির উপর ঝুপ্‌ঝাপ্‌ শব্দে পরসার ‘প্যালা’
পড়িতেছে। প্যালায় লোভে পুনঃপুনঃ সং আসিয়া নানা প্রকার উৎকট
রসিকতা করিতেছে!

রাত্রি প্রভাত হইল, গান ভাঙ্গিল না। ‘ছড়া কাঁট’ দেওয়া বন্ধ রহিল,
গান কিন্তু বন্ধ রাখিবার ঘো নাই। নখিল্লরের নবজীবনলাভের পূর্বে গান
ভাঙ্গিলে গৃহস্থের অকল্যাণ হইবে! সূতরাং বেলা দশটা পর্য্যন্ত গান
চলিল। মেছুনীরা মাছের ঝুড়ি মাথায় লইয়া বাজারে যাইতে যাইতে
একবার পথে দাঁড়াইয়া গান শুনিয়া লইল। শিরোমণি ঠাকুর স্নান
করিবার জন্ত ঘাটে যাইতে যাইতে বকুলতলার দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল
গান শুনিলেন, তাহার পর তৈলাক্ত জ্র কুঞ্চিত করিয়া সহগামী দে’ মহা-
শয়কে বলিলেন, ‘বুঝেছ রামচন্দোর! বেহলার গান হইলে অনাবৃষ্টি
ও বনুধরা শতহীনা হয়,—এই প্রকার প্রবাদবাক্য শ্রুত আছি; তাহার
পূর্ণ লক্ষণও প্রকাশমান! একে ত বর্তমান বর্ষে বড়ই গ্রহবৈশিষ্ট্য,
অকালকুম্মাওঁরা সর্বনাশ সাধন না করিয়া নিরস্ত হইবে না।’
‘রামচন্দোর’ মুখে গান্ধীর্থ্যের বোঝা নামাইয়া বলিল, ‘ঠাকুর মহাশয়,
এ যে ঘোর কলি! এ যুগে যদিমাং বিপরীত ঘটনা না-ই হবে ত
ক্রীলোকের মুখে দাড়ী গজাবে কেন? বঙ্গবাসীর গেজেটে সেদিন
আমাদের বকেখর দেখেছে—বাঁকিনের মুলুকে মেয়ে লোকের মুখে
দাড়ী আছে!’ শিরোমণি ঠাকুরের এ খবর জানা ছিল না, তিনি

বিশ্বদমন করিয়া বলিলেন,—“হবেও বা ! ‘কলৌ নাহোব নাহোব গতিরন্তথা’ ।”

আজ সকালে ছেলে মেয়েদের আহ্বার বন্ধ । গোয়ালে গরু বাধা আছে ; রাখালেরা দক্ষিণ হস্তের পাঁচনের উপর দেহের ভার স্তম্ভ করিয়া এক পারের উপর আর এক পা তুলিয়া ত্রিভঙ্গবেশে দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া যেন গান গিলিতেছে !

গান চলিতে লাগিল । কলাগাছের ডেলা চম্পাইনগর হইতে অনেক-দূর ঘুরিয়া বাঁকা নদীতে পড়িল । নখিন্দরের মৃতদেহ ফুলিয়া ‘ঢাক’ হইল, দুর্গন্ধে নদীর উভয় তীরের লোক নাকে কাপড় দিয়া দূরে পলাইল ! কিন্তু সাধ্বী বেহলার ক্রোধ নাই, তৃষ্ণা নাই ; নয়নে নিদ্রা নাই, মনে ভয় নাই ; বেহলা মৃত পতির পারের কাছে বসিয়া দিবানিশি করবোড়ে বিগলিতলোচনে কেবলই বলিতেছে, “কোথায় বা মঙ্গলচণ্ডী ! কোথায় বাবা বিশ্বেশ্বর ! অভাগিনীর সর্বস্বধন কিরাইচা দাও । এ বিপদে আমাকে উদ্ধার কর ।”

ভেলা ক্রমে গহরপুরের ঘাটে লাগিল । সেই ঘাটে নীতি ধোপানী কাপড় কাচিতেছিল । সে বেহলার দুঃখে দরজি হইয়া মন দিয়া সকল কথা শুনিল । মনসার সহিত নীতি ধোপানীর ‘সম্প্রীতি’ ছিল, সে মনসাকে প্রসন্ন হইবার জন্য অনুরোধ করিল । প্রসন্ন হইয়া মনসা বেহলাকে দেখা দিয়া বলিল,—

“কল্প লো পূজো বেউলো রাঁড়ী !

আমার পূজো কর ;

উঠবে বেঁচে মরা পতি,—

এমনই আমার বর ।”

বেহলা নদীতীরে ভক্তিভরে মনসার পূজা করিল। নখিন্দর পুন-
জীবন লাভ করিল; চাঁদ সদাগরের আবার সোনার সংসার হইল। চাঁদ
সদাগরও মহাসমারোহে মনসার পূজা করিল। সঙ্গে সঙ্গে ‘মনসার ভাষণ’
শেষ হইল। তখন বাড়ী ফিরিবার ভক্ত শ্রোতৃগণের মধ্যে ছড়াছড়ি পড়িয়া
গেল। দলপতি রেকাবের পরমা গণিতে লাগিল; মেথা গেল, পাঁচ সিকা
বায়নার উপর সে নয় সিকা ‘প্যালা’ ও সাতখানি কাশড় পুরবার
পাইয়াছে।

গান ভঙ্গ হইলে গৃহিণীগণ তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া আসিয়া গুচ
পট্টিবস্ত্র পরিধান পূর্বক লক্ষ্মীহানীর ধাতুপূর্ণ আড়ির সম্মুখে আঁচল
গলায় দিয়া প্রণাম করিয়া লক্ষ্মী তুলিলেন। ফকীর, বোষ্টম, রাখাল,
কুবাণ, পারঘাটার মাঝি, ধোপা, নাপিত, বাকুই, মালী প্রভৃতি পোষ্যবর্গ
একে একে প্রাঙ্গণে আসিয়া জুটিল, এবং বন্দীপুজার ‘ভূজো’ ও নাড়ুর
জন্ত তাঁহার নিকট আবদার করিতে লাগিল। অন্নপূর্ণাকৃপিনী গৃহিণী
কাহাকেও হতাশ করিলেন না। তিনি আর্জ কৈশজাল সম্মুখে চূড়াকারে
বাঁধিয়া ছই হাতে তাহাদিগকে ভূজো ও নাড়ু বিতরণ করিতেছেন;
মুড়ি, ও মুড়কি তাহার সঙ্গে কয়েকখণ্ড নারিকেল, বাতাসা ও গোটাকত
নাড়ু পাইয়া “জয় হোক লক্ষ্মী মা! কমলা তোমার ঘরে অচলা
হোন!” বলিয়া আনন্দধ্বনি করিতে করিতে তাহারা গৃহান্তরে
প্রস্থান করিতেছে।

বেলা ক্রমে বাড়িয়া উঠিতেছে; কিন্তু সমস্ত রাজি আগিয়া বাড়ীর
ছেলে মেয়ে ও বৌ-ঝিনের আজ আর চোখ মেলিবার সাধ্য নাই! কেহ
রান্নাঘরের বারান্দায় আঁচল বিছাইয়া তাহার উপর নিদ্রা বাইতেছে;
যে বেখানে পারিতেছে, সেইখানে পড়িয়াই ঘুমাইতেছে। বাটতে

কাঁচা দুধ পড়িয়া আছে, বাছির দল দুধের বাটীতে সাঁতার দিতেছে ; উঠিয়া দুধ জাল দিবার শক্তি কাহারও নাই ! ছেলে ক্ষুধার কাতর হইয়া মায়ের আলুলায়িত ভিজা কেশের গোছা ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, ক্রমাগত বলিতেছে, “মা ! বড় খিদে পেয়েছে, ওঠ !” মা চক্ষু মুদিত করিয়া কেবলই বলিতেছেন, “উঠ্চি ;”—কিন্তু গাভ্রোথান কোনক্রমেই ঘটয়া উঠিতেছে না ! গৃহিণী বলিতেছেন, “সারারাত্রি এমন ক’রে জেগে কি গান না শুন্লেই নয় ? এমন পাহাড়ে ঘুম ত কোন পুরুষে দেখি নি ! ছেলেটা ‘মাওড়ার’ মত কঁদে বেড়াচ্ছে—তবু যদি ঘুম ভাঙ্গে !”—কিন্তু জননীস্থানীয়া স্নেহময়ী স্বাগতীর এই সময়ে ভৎসনায় কোনও বধূর সুখনিদ্রার বাঘাত ঘটিতেছে না ; অগত্যা গৃহিণী নিজেই দুধ জাল দিয়া ছেলে মেরেগুলিকে খাওয়াইতেছেন। তাহার পর অন্ন-বাজন রাখিয়া থালা বা পাথরে তুলিয়া আহারের জন্ত বৌঝিদের ডাকা-ডাকি করিতেছেন। নিদ্রা কোন কোন বধূর ক্ষুধাটিকেও সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে ; বধূ নিম্নলিখিতেন্ত্রে বলিতেছেন, “মা, তুমি থেয়ে নাওগে ; আমার খিদে নেই।”—গৃহিণী তর্জ্জন করিয়া বলিতেছেন, “না খেলে কি চলে ? কাঁচা ছেলের মা, উপোস ক’রলে পিঁড়ি পড়বে যে !”

লক্ষ্মীপূর্ণিমা পন্নী-বিধবাগণের সংযত, নির্লিপ্ত, ভক্তিরসপরিপ্লুত হৃদয়ের নির্মল স্নেহমমতা, সুকোমল মাতৃভাব, উদার পরোপকারবৃত্তি ও অকৃত্রিম নিষ্ঠার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করে। জননী লক্ষ্মীর পূজা উপলক্ষে তাহার স্বয়ং লক্ষ্মীর কর্তব্য-ব্রতের উদ্ঘাটন করেন।

দেবীস্বরূপিণী পবিত্রহৃদয়া সাধ্বীগণ বজ্রের গৃহে গৃহে চিরদিন বিরাজিত থাকিয়া বজ্র-গৃহের ত্রীসম্পাদন ও বঙ্গল সাধন করুন, স্নমধুর শান্তি ও সুগভীর

কল্যাণের সুশোভন চিত্রে মাতৃভূমি বঙ্গের প্রত্যেক গৃহ নিত্য বিভূষিত হউক,—এই শুভ কামনার সহিত দুর্বল হস্তের আযোগ্য তুলিকার বৈচিত্র্য-বহুলা শস্ত্রশ্রাবলা ছায়া-নীতলা নদীমেখলা উৎসবচঞ্চলা মেঘবিহ্বলা জননী বঙ্গ-পল্লীর চিরমধুর উৎসবসমূহের চির-উপেক্ষিত চিত্রগুলির প্রথমংশ এখানেই সম্পূর্ণ করিলাম; অবশিষ্ট উৎসব-চিত্রগুলি ‘পল্লীচিত্রে’র দ্বিতীয় অংশ ‘পল্লীবৈচিত্র্যে’ প্রকাশিত হইতেছে।

সম্পূর্ণ।